শরৎ স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে

সাহিত্যম ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
১লা শ্রাবণ। ১৩৬৭

প্রকাশক
সাহিত্যম্
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ব্লক-প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র মুদ্রণে
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৭

ভূমিকা

শরৎচন্দ্রের জীবন ছিলো বড় বৈচিত্র্যময়। প্রথম জীবনটা তাঁর অতিবাহিত হয়েছিলো বেপরোয়া-ছন্নছাড়া-ভবঘুরের মতো। অনাহারে, অর্ধাহারে, অনিদ্রায় দিনের পর দিন কাটিয়েছিলেন তিনি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কাঁধে গামছা ফেলে। যাঁরা ভদ্রলোক গ্রামবাসী, তাঁরা কুকুর লেলিয়ে তাড়িয়েছেন তাঁকে। আর যারা প্রীতি দিয়েছে, বাড়িতে এনে আহার দিয়েছে, তারা গ্রামের হাড়ী-বাগদী-দুলে ছাড়া আর কেউ নয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পথ থেকে পথান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন শরৎচন্দ্র। এমনি করেই জ্বলে উঠেছে তাঁর অভিজ্ঞতার শিখা। সন্ন্যাসীর দলে ঢুকে কখনো হয়েছেন নবীন সন্ন্যাসী, ঘুরেছেন তাদের সঙ্গে ভারতের নানাস্থানে। চাকরির জন্য যৌবনে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়ে হাজির হলেন বর্মায়। সেখানেও তাঁর গ্রামে-গ্রামে, নগরে-শহরে ঘোরার বিরাম ছিল না। কতো মানুষের মনের ছবি যে তিনি দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তার আর হিসাব নেই। এমন করে দেখার, বোঝার চোখ আর মন ছিলো বলেই [illegible] একজন প্রকৃত-শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। হয়েছিলেন [illegible] সত্যিকারের রস-স্রষ্টা।

জীবনের পায়ে চলা পথে বহু মানুষকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেননি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন, ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে, মায়া আর মমতার দর্পণে। এই দেখা দেখে যে সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাহিত্যে, সেগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি প্রাণস্পর্শী। তাঁর প্রতিটি লেখার প্রতিটি ছত্র যেন প্রাণের দরদের রঙে বিচিত্রিত। সেইজন্যই শরৎচন্দ্র বাঙালীর প্রাণের মানুষ। তিনি মানুষের মনের অন্দরমহলের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কোনোদিন কোনো কিছু উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি, যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন, তা একেবারে প্রাণের কাছাকাছি, মনের পাশাপাশি এসে।

সমাজের হিংস্র কশাঘাতে যারা আহত আর রক্তাক্ত হয়েছে বার বার, তাদের জন্যেই শরৎচন্দ্রের দরদ ছিলো সবচেয়ে বেশী। তাই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন, 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত

থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম ; এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কতো দেখেছি অবিচার, কতো দেখেছি কুবিচার, কতো দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।' —সত্যনিষ্ঠ দরদী-কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর এই কথা ক'টির মধ্যেই পাওয়া যাবে।

যা দেখেছেন, যা পেয়েছেন, জীবনের সেই সব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দিয়ে সাহিত্য রচনা করে শরৎচন্দ্র সম্মান-খ্যাতি-প্রতিপত্তি যতো পেয়েছিলেন, নিন্দা-দুর্নাম-নির্যাতনও তার চেয়ে কিছু কম সহ্য করেননি। আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে, সাহিত্য রচনার জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল, নিজেরই গ্রামে 'একঘরে' হয়েছিলেন, মিথ্যা মামলার আসামীও হতে হয়েছিলো তাঁকে। আমাদের এই বাংলাদেশেই মাত্র পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে শরৎচন্দ্রের যুগে নীতিবাগীশের দল তাঁর লেখাকে 'অশ্লীল' বলে অভিহিত করে পড়তে নিষেধ করেছিলেন। 'চরিত্রহীন' রচনা করে স্রষ্টাকেই সেদিন 'চরিত্রহীন শরৎ চাটুজ্যে' আখ্যা নিতে হয়েছিলো। অথচ, সে তুলনায় বিচার করলে আজকের বাংলা সাহিত্য অশ্লীলতার কোন সোপানে গিয়ে হাজির হয়েছে ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না!

শরৎচন্দ্রই একমাত্র মানুষ, যাঁর সাহিত্য ও জীবন একসাথে একাকার করে মিলিয়ে মিশিয়ে পাঠক সমাজ তাঁকে একটি কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে শরৎচন্দ্র বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিতে পেরেছিলেন বলে। তাঁর নির্ভেজাল আন্তরিকতা ও দরদের জন্য। কিন্তু একজন লেখক বা শিল্পীর অন্তরালে একজন ঘরোয়া মানুষও থাকে। শরৎচন্দ্রের মধ্যের সেই ঘরোয়া মানুষটির পরিচয় বহন করে আনলো এই 'শরৎ-স্মৃতি' সংকলনটি। শরৎচন্দ্রকে কাছে থেকে দেখেছেন, পাশাপাশি কাটিয়েছেন এমন অনেক মানুষ-জনের লেখা এখানে পাওয়া যাবে। চেনা যাবে ঘরোয়া মানুষ শরৎচন্দ্রের ছবিটি। তাঁর সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কাহিনী, কি, খেয়াল-খুশি-মান-অভিমানের ছবি এই সংকলনের লেখাগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্র যে একজন মহৎ কথাশিল্পীই ছিলেন না কেবল, মানুষ হিসাবেও ছিলেন অত্যন্ত বিরাট-হৃদয়, স্নেহশীল, দয়ালু—এ পরিচয় এই সংকলনের বহু লেখার মধ্যেই রয়েছে।

পুরো শরৎচন্দ্র মানুষটির মহান পরিচয় যাতে জানা যায় সেইজন্যই নানা পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে লেখা সংগ্রহ করে একসাথে এই 'শরৎ-স্মৃতি'র মধ্যে রেখে গেলাম। এই সংকলনের অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি লেখা ও শরৎচন্দ্রের ছবিগুলি সুসাহিত্যিক ও বিখ্যাত সাহিত্য-কর্মী শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় আমাকে দিয়েছেন। শুধু আজ বলে নয়, এর আগের বহু কাজে উৎসাহ দিয়ে, সস্নেহ পরামর্শ-উপদেশ দিয়ে তিনি আমাকে ধন্য করেছেন। তাঁকে তাই কৃতজ্ঞতা জানানো আমার সাজে না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর লেখার জন্য 'বিশ্বভারতী' এবং শরৎচন্দ্রের চিঠি ও পাণ্ডুলিপির এক-পৃষ্ঠার জন্য শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীছবি মুখোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রসঙ্গত বলি, শ্রীছবি মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি পত্রিকায় 'সাহিত্যের অন্তরালে শরৎচন্দ্র' নামে যে ধারাবাহিক রচনাটি লিখেছেন, এটির জন্যও তিনি আমার কাছে অভিনন্দিত হলেন। শরৎ-জীবনের বহু না-জানা তথ্য এই লেখায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে শরৎ-জিজ্ঞাসু বাঙালী পাঠক অত্যন্ত উপকৃত হবেন।

—বিশ্বনাথ দে

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

'স্মৃতি' পর্যায়ে আমাদের অন্যান্য বই ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি ১০·০০

বিদ্যাসাগর স্মৃতি ১০ ০০

মধুসূদন স্মৃতি ১০ ০০

বিবেকানন্দ স্মৃতি ১০ ০০

নিবেদিতা স্মৃতি ১০·০০

শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি ১০ ০০

সুভাষ স্মৃতি ১০ ০০

নজরুল স্মৃতি ১০ ০০

রবীন্দ্র বিচিত্রা ১০·০০

মানিক বিচিত্রা ১০·০০

সুকান্ত বিচিত্রা ১০ ০০

নজরুল-কথা ১২ ০০

উৎসর্গ

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—
শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচীপত্র

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি :

জীবন ও সাহিত্য :

স্মৃতিকথা ঃ

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি॥

২ মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের ও ব্যক্তিত্বের
সৌরভ আমাদের মধ্যে অমর
হয়ে থাকুক

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
২১/১/৩৮

[শরৎচন্দ্রের অনন্ত যাত্রার পরে সুভাষচন্দ্রের বাণী]

যতদিন বাঙলা ভাষা বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন বাঙালীর সুখদুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিবে না। সাহিত্য-জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিশ বৎসর পূর্বে বাঙালী তাঁহার পরিচয় জানিত না। অতি সহসা কিন্তু অতি সঙ্গতভাবেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অসাধারণ কথা-শিল্পী রূপে বাঙালীর হৃদয়াসন অধিকার করিলেন। বাঙালী যেন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল — যে গৌরব, সম্মান ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লইয়া বাঙালী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল এ যেন তাঁহার জন্মগত অধিকার স্বরূপ ছিল। মানুষ হিসাবে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যে আসিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে ও চিরদিনের মত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বাঙালী যেদিন জাতীয়-সাহিত্য গড়িয়া তুলিবে, সেদিনই তাহার জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে; তবেই বাঙালী ও দেশ-প্রেমিক শরৎচন্দ্রের আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

[শরৎচন্দ্রের অনন্ত যাত্রার পর শ্যামাপ্রসাদের শ্রদ্ধা নিবেদন]

সাহেব রোড পার্শীবাগান লেন
তেলেঙ্গাবাগান

প্রিয়বরেষু

আপনার বন্ধু আপনার শুভ প্রয়াস
বন্ধুর চিঠির কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। এতদিন তাই আমার মনেই ছিলনা। তাঁকে লিখে দেবেন যে বিলম্বের জন্য আমি অনুতপ্ত। এবং আপনারাও আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

আমার উপন্যাস থেকে নাটক করে অভিনয় করার সম্বন্ধে আবেদন নিয়ে এই চুক্তি ও নাটকটি ছাপানো চলেনা কিম্বা কোন ব্যবসাদার থিয়েটার উহার অভিনয় করে অর্থোপার্জন করতে পারবেনা। তা নইলে সখ করে অভিনয় করা কিম্বা সেই উপন্যাস থেকে নাট্য তৈরী করা, তাতে আমার আপত্তি নেই।

আমি 'মরু ভাস্কর' একখানা নাটক অনেক আগেই লিখেছি, নিজেই কিছু কিছু অদল বদল করে তিনটি নাটক দিয়ে Star theatre কে দেবো মনস্থ করেছি।
আমার উপন্যাস ওদের দেওয়া এই যে, নাটক তৈরি

ছাপতে গেলে বই খুললেই একেবারে নতুন কোরে লিখতে হয়। বাইরের লোকের মুস্কিল এই যে উঁরা তো নতুন কিছু দিতে পারেননা, শুধু বইগুলোই যে কথা বলে আছে তাই নাড়া-চাড়া করলেই যা হোক কিছু একটা খাড়া করতে বাধ্য হন। সেই জন্যে প্রায়ই দেখি ভালো হয়না।

যাক, এ তুচ্ছ প্রসঙ্গ বহুর হিসেবে, আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

কেমন আছেন? আমি তো অর্শ নিয়ে মরে আছি। না হয় ভালো, না হয় একটা হেস্তনেস্ত।

আমার ভালোবাসা জানবেন। ইতি ৭ই মে ৩

আপনার শরৎ দাদা

আপনার বন্ধু আমাকে একটা চার লাইন লিখে পাঠাতে বলেছিলেন এবং আপনি উঁর অনুরোধ জানাননি। কোনখানেই ভুলে গেছেন। কিন্তু বাইরের লোকের আমার সম্বন্ধে জানবার দরকার। না?

শ

[অক্ষয়কুমার সরকারকে লিখিত শরৎচন্দ্রের একখানি চিঠি]

(সাহানগর রোড, কালীঘাট পার্ক
কলিকাতা-২৬
১৩৬৮ জুন ২৭

প্রিয় কল্যাণীয়েষু

মণীন্দ্র তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু তোমার চিঠির দেরি এবং অক্ষরের দোহাই [illegible] হঠাৎ চিঠি লিখে গেল।

তুমি আমাকে এখানে আসতে বলে খুশি হয় এ তুমি বলেছ, কিন্তু তোমার কষ্ট হবে। একটা বাসার [illegible] সাহেব টাকা দিয়ে ঠিক দুপুরে আমার কাছে এসেছিলে।

একটু কষ্ট করে আর একদিন এসো।

জুলাই ১লা থেকে ৪ঠা পর্যন্ত আমি শিলংয়ে থাকবো। একটু কাজও আছে এবং ২।৩ দিন [illegible] নিমন্ত্রণ রাখবো।

(এই মাসের [illegible] [illegible] [illegible] বলেছিলেন [illegible] চক্রবর্তী। আমি আবার [illegible] বললে [illegible] [illegible] চাই করে দিয়েছি। [illegible] [illegible] [illegible]। যদি হয় একদিন দেখো।)

এই মঙ্গলবার দিন একদিন ছুটি করে তোমাকে উত্তরে নিয়ে তোমার বাবার সাথে দেখা এবং [illegible] [illegible] [illegible]

নাও. সময়ের অভাবে উত্তর হয়নি । তোমাদের বাড়ীর সবার [illegible] মধুর অনুগ্রহের প্রতি আমার লোভ যে নেই তা নয় অন্যান্য মহিন, তবুও বর্ষার অনুগ্রহ অত্যধিক রকমের কিছু কাহিল করেছে ।

আশাকরি তোমরা বেশ ভালই আছ । ছেলেরা সবাই কেমন আছে ?

আঃ শুভার্থী দাদা ।

শরৎ

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু

মণীন্দ্র, পাড়াগাঁয়ে থাকি, সহজে কোন খবর পাইনে । আজই হঠাৎ তোমার পিতৃদেবের লোকান্তর গমনের খবর পাই ও সে যে কত আকস্মিক হয়ে পড়িল । আমার প্রতি উঁর অনেক প্রীতি ও স্নেহ বহুকাল থেকে পেয়েছি । তোমার মনের দুঃখ আর নরম উঁর সাথে জানাই, তবু বহুগুলি দুঃখের কথা থেকে কেবল ভেবেছি যে উঁরও ইহ কালের বন্ধন শেষ হয়ে এসেছে । সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, বিচ্ছেদ একদিন আসবেই ।

যাঁরা গেলেন তাঁদের জন্য শোক করতে নেই, — শুধু মনে এ কথা ভাবতে চাওনা । আশীর্বাদ করি তুমি শান্তি লাভ কর । তোমার মাতাকে প্রণাম । ২৮শে কার্তিক ৩৯

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন, বেহালার তৎকালীন জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখিত দু'খানি চিঠি]

[শরৎচন্দ্রের 'দেহঘরের স্মৃতি'-পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা]

...আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা দিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা ক'রে নিয়েছিলুম, তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারেনি। একলা পড়ে গিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই দুয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলেম সেটাকে আমি মস্ত লাভ ব'লে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুষরূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশি সত্য করে পেয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটেনি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে স্বতোবিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই যে নিজের দেশে কালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র। যথোচিত

দেশকাল থেকে চিরনির্বাসনে যারা জন্মেছে এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের জন্যে তারও প্রয়োজন আছে।

বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্য-মণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরি হোলো না। চেনা-শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করেনি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্তপরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অব্যবধানে এক সঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়—পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমার মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্যে যে নিভৃত কোণ আশ্রয় ক'রে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোনো সুযোগ হ'লো না।

কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড় দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।

আমি কি ইংরেজী কি বাঙলা কোনো বই পড়ে সহসা চমকে উঠিনে। থেকে থেকে চমকে উঠা আমার ধাতে নেই। কিন্তু কোনও বই যদি আমাকে চমক লাগায়—তাহলে তার অপূর্ব বিশেষত্ব আছে অন্ততঃ আমার কাছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আমি বহুকাল পূর্বে "কুন্তলীন পুরস্কারে" একটি ছোটো গল্প পড়ে বিস্মিত হয়েছিলুম। সে গল্পটির নাম বোধ হয় "মন্দির"। গল্পের নীচে লেখকের নাম ছিল না। পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে, এই নূতন লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র'—যে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে প্রস্তুত। পরিচিত লেখকের নাম দেখে তাঁর লেখার প্রতি আমাদের মন অনুকূল হয় এবং তাঁর খ্যাতির প্রভাব আমাদের মতামতের রূপ দেয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন কি নামহীন লেখকের রচনা আমাদের নয়ন মন আকৃষ্ট করে সেখানে আমরা একটি যথার্থ নতুন লেখককে আবিষ্কার করি। "মন্দির" গল্পটির কথা-বস্তুও সম্পূর্ণ নতুন, তার উপর সেটি ছিল সুগঠিত। সাহিত্য-সমাজে আমি একজন Critic ব'লে সুপরিচিত যদিচ পুস্তক সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়। সে যাই হোক, সমালোচকের আর যে গুণই থাক্ না কেন, তিনি Perception-এ বঞ্চিত নন। কোনও বই পড়ে তাঁর মনে একটি অভূতপূর্ব impression হলে—তারপর Critic বাগবিস্তার করতে পারেন। যে কথায় কোনও impression করে না, তার বিষয় কিছু বক্তব্য থাকে না। অবশ্য এস্থলে আমি সমগ্র বইয়ের কথা বলছিনে, বলছি তার কোনও বিশেষ অংশের কথা।

এখন আমার উক্তরূপ impression-এর দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি।

কিরণময়ীর প্রথম দর্শন লাভ করে আমি চমৎকৃত হই। দোতলায় মুমূর্ষু স্বামী পড়ে আছেন, আর স্ত্রী নটী সাজে সজ্জিত হয়ে স্বামীর বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে নীচে নেমে এলেন। এ ব্যাপার দেখে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়,—কিরণময়ীর রূপ দেখে নয়—তার psychology-র পরিচয় পেয়ে। এ রকম ছবি সাধারণ লেখকরা আঁকতে পারেন না।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের "ভ্রমণ-বৃত্তান্তে" রাতদুপুরে ভাগলপুরের গঙ্গায় একটা ডিঙ্গিতে ভেসে পড়ার বর্ণনাটি আমার কাছে অতি চমৎকার লেগেছিল। লেখকের শক্তির পরিচয় এ বর্ণনায় পুরো ফুটে উঠেছে। যাঁর কলম এ সব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

তরুণ জীবনে সেই অনূদিত শরৎচন্দ্রের চারিদিকে যে কয়টি অস্ফুট তারা অথবা তাঁহারই অনূদিত জ্যোৎস্নালোকে যে কয়টি অফোটা সাহিত্যিক ফুল ফুটিবার সম্ভাবনাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল—আমি তাহাদের একটি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী জীবনে সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়া শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে ভাসিয়াছেন, কেহবা অকালেই নিবিয়াছেন—কেহবা জীবনাকাশ হইতে চ্যুত না হইলেও শরৎ-মহিমার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেই আপনাকে অস্তমিত করিয়াছেন। আমি এই শেষের দলের মধ্যেই একজন। কিন্তু শরৎদার বিষয়ে আমাদের অন্ততঃ এইটুকু গর্বের বিষয় আছে যে, আমরা সেই অনূদিত শরৎচন্দ্রকে সকলের আগেই পূজিয়াছি এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পূর্বে তাঁহারই আলোকে দাঁড়াইয়া অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। যখন সমস্ত বঙ্গসাহিত্যাকাশে আমাদের সাহিত্য 'রবির' আলোকে উদ্ভাসিত, তখন বাঙ্গলার বাহিরের একটা অনতিখ্যাত সহরের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষুদ্রতম সাহিত্যসভার মধ্যে যে আমরা একটি পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে দেখিয়াছিলাম, এ গৌরব আমরা করিতে পারি।

মনে পড়ে, একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্যসভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির যোগাড় লইয়া উঠিয়াছিল। আমি গায়ের জোরে সবারই চাইতে দুর্বল হইলেও গলার জোরে কাহারও চাইতে কম ছিলাম না। হয়তো কিছু বেশীই ছিলাম, তাই আমার সেই 'এতটুকু যন্ত্র' হইতে একটু বেশী শব্দই বাহির হইয়াছিল এবং আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—'বঙ্কিমের চাইতেও শরৎদার লেখা ভালো।' অবশ্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একজন অখ্যাত তরুণ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া আর একটি তরুণতর যুবকের এই ধৃষ্টতায় সেদিন তাঁহার

মহিমালোকে বসিয়া নিশ্চয়ই সস্নেহ উপেক্ষায় হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর যখন আমার পরিণত জীবনেই দেখিলাম যে, সেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার মূল্য নিরূপণ উপলক্ষে একটা সাহিত্যিক লাঠালাঠির সূচনা হইয়াছে এবং এমন কি বর্তমান সাহিত্যসম্রাটও সেই তর্কধূলার মধ্যে তাঁহার ঋষিকল্প মুখখানি লইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন তখন আমিও হাসিয়া লইয়াছি।

কিন্তু মৃত্যুর পর শোকপ্রকাশের মধ্যে যে একটা কৃত্রিমতা আছে তাহাই আমায় বাধা দিতেছে। কারণ কথায় বলে—

"থাকতে দিলে না ভাত কাপড়,
মরণে করবে দান-সাগর!"

এই 'দান-সাগর' অনেকেই করিয়াছেন এবং তাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অনেক উচ্চ স্থানও পাইয়াছে। তবুও সে সমস্তই মরার পর দান-সাগরের মতই একান্ত নিষ্ফল—তা সে Tennyson-এর In Memorium-ই হউক, আর Shelly-র Adonais-ই হউক। কারণ সেই সমস্ত জীবন-কথার মধ্যে প্রাণটাই থাকে না—থাকে কথার জাল বোনা, থাকে অধরকে ধরিবার বৃথা চেষ্টা।

আমার পূর্ব-জীবনের শরৎদার কথা বলতে যাওয়া মানে—আমার জীবনের যাহা সর্বাপেক্ষা প্রাণময় অংশ তাহাকেই স্মরণ করা। কিন্তু তাহা কি কেহ সম্পূর্ণভাবে পারে? প্রাণ জিনিসটার সংজ্ঞা নাই, কারণ তাহার মতো আর কিছুই নাই—একেবারে 'কেবল' মূর্তি! তাহার অংশ নাই—তুল্য নাই, তাহা ক্ষণাবলম্বী অনুভবধারা ছাড়া অন্য কোনরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এমন কি জীবনকে স্মরণ করা যায় কি না সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ঘটনা স্মরণ হইতে পারে, জীবন নয়। প্রাণহীন ঘটনার প্রয়োজন ইতিহাসে থাকিতে পারে; কিন্তু আজ যাহা সত্যকারের সুখ-দুঃখানুভূতি—তাহাতে তাহার স্থান কোথায়? আজ যে ক্রন্দনে বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ পূর্ণ, তাহার মধ্যে সেই জীর্ণ পুরাতনের স্থান কোথায়? তাই

আজ যখন আমার প্রথম যৌবনের জীবনের কথা স্মরণ করিয়া লিখিবার আহ্বান আসিল তখন আমি চমকিত হইয়া ভাবিলাম—সেই পুরাতন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাপাপড়া স্মৃতির খনি আবার কি করিয়া খনন করিব? পারিব কি?—পারিব না। যাহাকে ফুরাইতে দিয়াছি তাহা কি শেষ হয় নাই? সেই Myrtle and Ivy-র সত্যকারের Sweet two and twenty-র দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে—আছে শুধু একটা হায়-হায় মাত্র। অন্ধকার বাঙ্গলাব্যাপী হাহাকারের মধ্যে সেই ব্যক্তিগত জীবনের হায়-হায়ের স্থান নাই—নিশ্চয়ই নাই।

যাক, এখন যাঁর কথা লিখিতে বসিয়া আপন কাঁদুনির ঝুলি ঝাড়িলাম তাঁরই কথা আরম্ভ করিব। কিন্তু আগেই বলিয়ারাখিতেছি যে সত্য বলিব ; কিন্তু আমার অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছায়'যদিসেইসত্যকে কিছু বানাইয়া বলি তাহাতে আশা করি কেহ দোষ ধরিবেন না। কারণ যখন বনে যাইবার বয়স পার হইয়াছি তখন একটা বেপরোয়া ভাব আসিয়া গিয়াছে। অতএব সত্য বলিব এবং হয়তো বানাইয়াও বলিব—কারণ ঐ দুইটার মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ এবং তাহার পর যাহা হয় তাহা সাহিত্য জগৎ হইতে আমার অনেক দিনই হইয়াছে ; এখন স্থুল জগৎ হইতে এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ অথচ আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেহটা যাইলেই হয়।

শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন। আমার সঙ্গে সহপাঠীরূপে দেখা হয় নাই—দেখা হইয়াছিল শাস্তা—আদেশদাতারূপে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র এবং মাষ্টার পণ্ডিতের বিশেষতঃ দাদাদের গম্ভীর তত্ত্বাবধানের মধ্যে শাসিত ও পালিত। কিন্তু স্কুলের ছাত্র হইলে কি হয়, কবিতা দেবীর সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু ছোট বয়স হইতে নিশ্চয়ই মানুষ অনুভব করে। আমি এবং আমার ভগ্নী নিরুপমা উভয়েই তাহা

অনুভব করিয়াছিলাম—বিশেষতঃ আমার ভগ্নী তখন আমাদের বাড়ির সমজদারদের মধ্যে বেশ একটু খ্যাতিই অর্জন করিয়াছিলেন। আমার তখন বাড়ির সাহিত্যিক মহলে কোনো খ্যাতিই হয় নাই, কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া ইংরাজী কবিতার অনুবাদ অথবা বাঙ্গলা কবিতার পুনরনুবাদ করিতাম। রবীন্দ্রনাথেরও তখন আমাদের বাড়িতে পসার-প্রতিপত্তি হয় নাই। তখনও তাঁহার পূর্ববর্তী কবি এবং লেখকদিগের প্রবল প্রভাব। আমরা দুইটি ভাই-ভগ্নী প্রাক্-রবীন্দ্রী কবিগণের লেখার ভাঙাচোরাই হউক আর অনুকরণই হউক—একটা কিছু করিতাম। দাদারা বা মাষ্টার মহাশয়রা কখনো ভালবাসিতেন, কখনো বা হাসি-বিদ্রূপে বিব্রত করিতেন; কিন্তু তথাপি গোপনে গোপনে আমাদের কবিতার খাতা পুরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, সেই সব লেখা বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়তো তাহা শরৎদার হাতে দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত "ল্যাড়া" নামে অভিহিত। উপরন্তু তাঁহার তাৎকালিক স্বাক্ষরিত নাম St. Clare Lara। জানি না, তখন তিনি কবি Byron-এর Lara কবিতা পড়িয়াছিলেন কি না, কিন্তু বায়রনের ধরনটি যে পরে তাঁহাকে পাইয়া বসিবে ইহা বোধ হয় তাহারই পূর্বাভাষরূপে তাঁহার নাম-সহিটির মধ্যেও প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা-যাওয়া করিতে বা দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।

কিন্তু এ হেন শরৎচন্দ্র—সেই Lara—একদিন হঠাৎ আমার ছোট কুঠরীর মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র টেবিলটির পার্শ্বে আসিয়া হাজির। আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তিনি আমার কবিতার খাতাখানা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন—"কি ছাই লেখো, খালি অনুবাদ—তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের কিছু নেই তোমার লিখবার?"

আমি ত শুনিয়াই পৌনে মরা। কিন্তু কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বইখাতাপত্রে ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম তাহা আজ স্মরণ হয় না ; কেবল এইটুকু মনে আছে যে তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্য-সাধনার কুটীরের মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল। দিনের পর দিন তাঁহারই সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।

মনে পড়ে তাঁহার সেই ছোট ঘরখানির মধ্যে বসিয়া তাঁহার বাল্য-জীবনের কত কথাই না শুনিয়াছি। তাঁহার তখনকার অপটু লেখার মধ্যে কত না ভবিষ্যতের গৌরবের ছায়া দেখিয়াছি এবং আশা করিয়াছি। সর্বোপরি স্মরণ হয় তাঁহার জীবনের সঙ্গীদের কথা, যাঁহাদের একজনকে অন্ততঃ তিনি পরবর্তী জীবনে শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথরূপে চিরকালের জন্য অমর করিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত—কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি – কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের লিখিত 'জনা'র অভিনয়। 'জনা'র পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন পরবর্তীকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর—(তিনকড়ি কি ?) অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিলাম কি না সন্দেহ। অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের অভিনয়ে যে গম্ভীর সংযত তেজস্বিতা ও শোকপ্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম কলিকাতার প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহা পাই নাই বলিয়াই স্মরণ হয়।

আমরা সে সময় যে পাড়ায় থাকিতাম তাহার নাম "খঞ্জরপুর"। সেই পাড়ার প্রতিবাসী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া ছোট একটা থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিল। তাহাতে যে অভিনয় হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক এবং

শিক্ষক। সেই সময়ে অভিনয়ের পোশাকে যে ফটো তোলা হইয়াছিল তাহার একখানি অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের এলবামে ছিল—কিন্তু ক্রমশঃ তাহা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তারপর আর তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

এই থিয়েটারের রিহার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত। নদীর ধার (তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানের কবর-স্থান, দেবস্থান—কোনো স্থানই বাদ যাইত না। Shakespear-এর Midsummer Nights Dream-এর গ্রাম্য অভিনয়-চেষ্টার সমস্ত হাস্য ও করুণ রসটা আমরা প্রত্যক্ষভাবেই তখন অনুভব করিয়াছিলাম। তখন অবশ্য আমাদের Shakespear পড়িবার বয়স নয়, কিন্তু বিশ্বকবি যাহা হয়ত কল্পনা করিয়াছিলেন আমাদের বেপরোয়া শরৎ-চন্দ্রের উৎসাহে তাহা বর্তমানকালে স্থূলেই ঘটিয়াছিল।

তারপর মনে পড়ে, বেশী করিয়া মনে পড়ে আমার প্রিয়তম সুরেন, গিরীন, উপেনের কথা।—ইহাদের দেখিবার পূর্বেই শরৎচন্দ্রের কৃপায় ইহারা আমার আপনার জন হইয়া গিয়াছিলেন। উপেন গিরীনের কবিতার প্রশংসা—তাঁহাদের লিখিবার সাজসরঞ্জাম—কি করিয়া তাঁহারা আলমারির পাশে লুকাইয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেন—কি করিয়া তাঁহারা বিদ্যালয়ের পড়াশুনার অত্যাচারের মধ্যেও সময় করিয়া কাব্যদেবীর পূজা করিতেন—সবই শরৎদার মুখে শুনিতাম—সবই যেন এখন সেদিনের কথা বলিয়া মনে হয়। অথচ কোথায় তারা, আর কোথায় আমি!

তারপর কবে যে সুরেন গিরীনের সঙ্গে প্রথম দেখাশুনা হইল মনে নাই। শরৎদার কৃপায় কখন যে বাঙ্গালীটোলার গাঙ্গুলী-বাড়ির মধ্যে আমার স্থান হইল ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। এইটুকু কেবল মনে আছে যে আমাদের একখানা হাতে-লেখা কাগজ বাহির করিবার ব্যাপার লইয়া এই ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালীটোলা গাঙ্গুলী-বাড়ি তখন ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে

একটা শিক্ষা, দীক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। সেই গাঙ্গুলী-বাড়িতে দুইটি অপরিণতবয়স্ক যুবকের সঙ্গে জড়িত হইয়া আমিও তাঁহাদের একজন হইয়া গেলাম। অবশ্য ভাগলপুরে আমাদের বাড়ির তখন একটু প্রতিপত্তিও ঘটিয়াছিল ; কারণ আমার স্বর্গগত পিতৃদেব তখন ভাগলপুরের প্রধান সবজজ।

শরৎদা একদিন হঠাৎ প্রস্তাব করিলেন যে, যখন আমরা এতগুলি কুঁড়ি-সাহিত্যিক ফুটি ফুটি করিতেছি তখন একটা কাজ করা যাক। একটা হাতের লেখা কাগজ বাহির করা যাক। যে মুহূর্তে বলা সেই মুহূর্তেই কার্যারম্ভ।

এই মাসিকপত্রখানির সম্বন্ধে আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্বেই কিছু লিখিয়াছেন। অতএব সে বিষয়ে কোনো পুনরুক্তি না করিয়া আমার যতটুকু স্মরণ হয় তাহাই এখানে লিখিতেছি। এ বিষয়ে আমার স্মৃতি খুব প্রখর নয়, তাহা পূর্বেই বলিয়া রাখিতেছি। এই মাসিকপত্রখানা আমাদের কুঁড়ি-সাহিত্যিকদের সভার মুখপত্র হইল। ইহার প্রথম সম্পাদক যোগেশচন্দ্র এবং মুদ্রাকর গিরীন্দ্রনাথ, লেখক অনেকগুলি এবং লেখিকা মাত্র একটি—তিনি আর কেহ নন, আমারই অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী নিরুপমা। ইনি আমাদের বন্ধুদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকিয়াও আমাদের বন্ধুবর্গের একান্ত আপনার ছোট বোনটিই হইয়াছিলেন। ইহার তখনকার লেখা কবিতা বা প্রবন্ধ যাহা কিছু আমাদের সভার জন্য লিখিত হইত তাহা আমাকেই সভায় পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত এবং সভার মতামত আমাকেই বাড়ি গিয়া শুনাইতে হইত। আমাদের সাহিত্যসভার গুরুগম্ভীর মন্তব্য তখন তাঁহাকে কখনো দুঃখ কখনো আনন্দ দিয়াছে—কিন্তু আজ তাহা কেবল সুখেরই স্মৃতিমাত্র।

সাহিত্যসভা—হ্যাঁ, সত্য-সত্যই একটা সাহিত্যসভা এই তরুণদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাসিকপত্রখানির নামকরণ হইয়াছিল

"ছায়া"। এই সাহিত্যসভার অধিবেশন যে কোথায় কোনদিন হইত তাহার ঠিকানাই ছিল না। যেমন বেপরোয়া বেঁদাড়া তরুণ-সাহিত্যিকেব দল—তেমনি ছিল তাহাদের মিলিত হইবার স্থান ঃ কখনো বা ভাগলপুরের সরকারী বিদ্যালয়ের মস্ত বড় বাঁধান পয়োনালীর মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সভ্যগণের প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা—কখনো কোনো মাঠে বা গাছতলায় বা টিলার উপর চড়িয়া এই সব তরুণ-প্রাণের নিবিড় মিলন। ইহার মধ্যে চেঁচামেচিও ছিল, তর্কাতর্কিও ছিল—সবই ছিল। প্রয়োজন যখন মিলন, তখন বিনা প্রয়োজনের কমব্যস্ততাই ছিল আমাদেব একমাত্র কর্তব্য।

এই সময় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বোধহয় কলিকাতায় পড়িতেন। তিনি এবং তাঁহার কয়েকটি বন্ধুতে মিলিয়া ভবানীপুরে আমাদের 'ছায়ারই' মতো আর একখানা কাগজ হস্তযন্ত্রেই বাহির করিয়াছিলেন। তাহার নামটা ঠিক স্মরণ হয় না—বোধহয় "তরুণী"। যাহাই হউক, সেই কাগজখানা আমাদের ছায়ার বিনিময়ে ভাগলপুরে পাঠানো হইত। আমরা তাহা পাঠ করিয়া ফেরত পাঠাইতাম। বোধহয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভায়ারও ঐ তরুণীতেই সাহিত্যসাধনার হাতে-খড়ি। আমাদের 'ছায়া'তে ঐ কাগজের লেখকগণের মুণ্ডপাত হইত এবং যথানিয়মে আমাদের মুণ্ডপাতও ভবানীপুরের বন্ধুরা তাঁহাদের কাগজে করিতেন। কী গুরুগম্ভীর সেই সমালোচনা—যদি সে সময়ের "সাহিত্য"-পত্রিকার সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ও তাহা পড়িতে পাইতেন তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় বুঝিতেন যে তাঁহার উপযুক্ত সমালোচক-বংশধর তখনই অনেক বাঁশবনের ঝোপেঝাড়ে প্রচুর গজাইয়া উঠিতেছে!

শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেপরোয়া—কোনো দ্বিধা তাঁহাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না এবং শেষ জীবনে এই একান্ত নির্ভীকতার ভাবকেই সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কত না নূতন জীবনের সৃষ্টি এবং নূতন ভাবকে রূপ দিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই বোধহয়

তিনি বাল্যজীবনের এই সঙ্গী কয়টির অনেকেরই মধ্যে ইহা সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সঙ্গী কয়টিকেও এই সময় অনেকটা বেপরোয়াই করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই পরম নির্ভীকতা যে আমাদের মধ্যে কতখানি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার দু'টো-একটা উদাহরণ দিই। আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ির পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলা কবর আছে। আমরা হিন্দুর ঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকটির সঙ্গগুণে "মামদো" ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবরস্থানের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়াম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনের রক্তনয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিংবা থিয়েটারের রিহার্সাল-কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্চিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে তিনি ভয় কাহাকেও করিতেন না এবং কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বাধাও তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। বহুদিনের বহু কার্যে তিনি ইহা দেখাইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই বোধহয় তাঁহার পরবর্তী জীবনে তাঁহার নিজ প্রকৃত জীবনের এবং সৃষ্ট জীবনের মধ্যেও সেই একান্ত নির্ভীকতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমাদের মতো অনেক ভীরু যেখানে গিয়া থামিতে বাধ্য হইয়াছে, তিনি সেখানে থামেন নাই। তাই আজ তাঁহার সাহিত্যিক অনুবর্তিগণ তাঁহার সেই বেপরোয়া ভাবটাকেই আরও বাড়াইয়া ফুলাইয়া তুলিবার শক্তি পাইয়াছেন। তরুণ অবস্থাতেই তিনি যেন কোনো নিয়মের ধারা মানিতে চাহিতেন না। তিনি যেন জীবন দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, সৃষ্টির ধারার মধ্যে কেবল যে নিয়ম আছে তাহা নয়, বেনিয়মও আছে। সৃষ্টি ব্যাপারটার মধ্যে অনেকটাই খেয়ালীর খেয়াল আছে এবং কাজ করিতেছে।

Evolution-এর মধ্যে "সহসা" এবং 'হঠাতের" স্থান অনেকখানি। তাই বোধহয় তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় যে মূলাধার-চক্রের অধিষ্ঠাতা—চতুর্বাহুযুক্ত ব্রহ্মা ও শিশু—

"শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্‌বেদ বাহুঃ।"

তাঁহার এই নির্ভীকতা এবং শিশুসুলভ বেয়াড়া বেঁদাড়া ভাবই তাঁহার জীবনকে শেষ পর্যন্ত সামাজিক সমস্ত নিয়মকানুন মানার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছিল; তিনি যেমন প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়ম কোনোটাকেই নিজের জীবনে তেমন আমল দেন নাই, প্রকৃতি ও সমাজ কতকটা সেইজন্যই যেন তাঁহার স্থূল দেহটাকে ক্ষমা করে নাই। আমার মনে হয় যে, তাঁহার এই অকালমৃত্যু—এই যশ ও সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন-গগনে হঠাৎ শরৎচন্দ্রের চিরতিমিরাবৃত হওয়ার কারণও সেই আপনার উপর অযথা বলপ্রয়োগ।

কিন্তু তিনি যে আত্মজীবনসমুদ্রমন্থন প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নিজপক্ষে হলাহল উঠিলেও বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে সুধা উঠিয়াছে—কি বিষ উঠিয়াছে তাহার বিচার করিবার অধিকার বোধ হয় আমার নাই। কারণ সাহিত্যে যে পথ তিনি ধরিয়াছিলেন আমার ন্যায় ভীরু সে পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাক সেকথা, কিন্তু, এটা ঠিক যে, রস-স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মন্থন হইতেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শরৎচন্দ্রের জীবন-দেবতাও তাঁহার জীবনকে নিঙ্‌ড়াইয়াই রস বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

তাঁহার জীবনের আর একটা কথা এবং বোধহয় সর্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা। শেষজীবনে যে ভালবাসা পোষা পাখী এমন কি সামান্য একটা রাস্তার কুকুরের জন্যও অজস্র ব্যয়িত হইয়াছিল—পূর্বজীবনেও তাহা আমরা যে কতবার কত রকমে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে গেলে সামান্য একটা প্রবন্ধে কুলাইবে

না—প্রবন্ধটা গল্পে পরিণত হইবে। সেই ভালবাসাই বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া হঠাৎ একদিন দুইটি Fountain pen-এর আকারে আমার ও আমার ভগ্নী নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপমা তখন দিদি ও অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কিছু যশ অর্জন করিয়াছেন, আমিও তখন "স্বেচ্ছাচারী" লিখিয়া ভারতীতে ছাপাইয়াছি। শরৎদা যে কোথায়, তাহাও যেন তখন আমাদের তেমন স্মরণেই ছিল না। এমন সময় আমার নামে একটি একেবারে সোনার কলম, নিরুপমার নামেও একটা Waterman। আমি তো উহা পাইয়া অবাক! এত দামী কলম লইয়া কি করিব?

"আছে শেষে সেটা চোরের ভাগ্যে"—এই মনে করিয়া শরৎদাকে পত্র দিলাম। তিনি লিখিলেন—"বেশ করেছি দিইছি, তোকে ওতেই লিখতে হবে।" যেমন অদ্ভুত বেঁদাড়া মানুষ, তেমনি তাঁহার হুকুম। আমি উহা ফেরৎ পাঠাইয়া লিখিলাম যে—এ তো একটা গহনা, এ দিয়ে কখনো লেখা যায়! আপনি যা দিয়ে লেখেন তাই একটা পাঠাবেন;—বাস, আর কোথায় যাইব—আর একটা রূপায় মোড়া প্রকাণ্ড লেখনীর বংশদণ্ডাঘাত।

আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই কলমও চলিয়া গিয়াছে। চোরেরা তো আমার শরৎদা নয়। আমি অবশ্য লজ্জায় সেকথা তাঁহাকে লিখিতে পারি নাই—কিন্তু সে দুঃখটা আমার বৃদ্ধ বয়সের মনের সবভোলার ঘরের মধ্যেও নিভুঁলভাবে জমা হইয়া রহিয়াছে। লিখিতে বসিয়া আজ আমার এই শুষ্কচক্ষেও জল আসিতেছে।

আমার লেখায় পৌর্বাপর্য স্থির থাকিতেছে না; কিন্তু আমি নিরুপায়—পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ গানের মাত্রা-তাল ঠিক রাখা এ বয়সে আমার দ্বারা অসম্ভব—অতীত অনাঘাত, সব ফাঁক—সবই গুলাইয়া যাইতেছে।

শরৎচন্দ্র সে সময় যে সকল ইংরাজ ঔপন্যাসিকের উপন্যাস

পড়িতেন তাহা এখনো আমার মনে আছে। মিসেস্ হেনরি উড্ এবং মারি করেলীর উপন্যাসের তিনি একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং লর্ড লিটনের প্রতিও তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহারই প্রমাণ তিনি দিয়া গিয়াছেন লিটনের My Novel-এর ধরনে শ্রীকান্তের পর্বের পর পর্ব চালাইয়া। অবশ্য শেষজীবনের বড় বড় উপন্যাসগুলির বিষয় আমি কিছু বলিতে পারিব না। কারণ তাঁহার সহিত আমাব ২১।২২ বৎসর বয়সেই প্রত্যক্ষ যোগ একপ্রকার কটিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার বাংলার বাহিরের জীবনের সহিত আমার একেবারেই পরিচয় হয় নাই। তবে তিনি নিজের উপর যে প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির অত্যাচার চালাইয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি সাহিত্যজগতে অকৃপণ হস্তে ঢালিয়া দিলেও কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনেব প্রতি তিনি অত্যন্ত অবিচারই করিয়াছিলেন। নহিলে এত শীঘ্রই তাঁহাকে আমরা হারাইতাম না।

তিনি যখন রেঙ্গুনে ছিলেন তখন দু'একখানি পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিপত্র গুছাইয়া বাখ, কোনো কিছু গুছাইয়া রাখা আমার অভ্যাসের বাহিরে। তাই সে সমস্তই আমি হারাইয়া বসিয়াছি। আজ তাহা থাকিলে তাঁহার জীবনচরিত রচনায় হয়তো সাহায্য হইত।

পরিণত জীবনে তাঁহার বাজেশিবপুরের বাড়িতে কয়েকবার তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। তখন তিনি সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রতিষ্ঠার দায়ে তিনি মহা-আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ভিড়ভীতিগ্রস্ত। শেষজীবনে তিনি কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমি যখন আমার সেই তাকিয়াপ্রেমিক তাম্রকূটরসিক দাদাটির কথা স্মরণ করিতাম, তখনি ভাবিতাম সেই Agrophobia-গ্রস্ত মানুষটি কি করিয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন। ওকথা যাউক—সেই বাজেশিবপুরের বাড়িতে যখন তাঁহাকে দেখি, তখনো দেখিলাম সেই আমার বাল্যজীবনের ভালবাসাসর্বস্ব মানুষটি সেখানে নানা

ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়াই রহিয়াছেন। সেই হাসি—সেই চঞ্চলতা—সেই মহাব্যস্ততা।

আমি এবং আমার একটি পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত উভয়ে যখন দুয়ার ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম তখন একটা বিশ্রী কালো কুকুর আমাদের যে অভ্যর্থনা করিল তাহা স্মরণ করিলে এখনো মনে হয় যে, Agrophobia-গ্রস্ত মানুষের উপযুক্ত দারোয়ানই তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। Hydrophobia-র ভয় দেখাইয়া তিনি বোধ-হয় নিজের জন্য একটু বিশ্রামের অবসর করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। কুকুরটার চেঁচামেচিতে উপর হইতে বকিতে বকিতে নামিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে, এ আর কেউ নয়—তাঁহারই পুঁটু—তখন আর-এক মূর্তি। সেই চিরপরিচিত মূর্তি। আমরা গিয়াছিলাম কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ফিরিবার জন্য, কিন্তু হইল ঠিক তার বিপরীত—তিন দিন তিন রাত্রি অবিশ্রান্ত গল্পগুজব এবং অতীতজীবনের পাতার পর পাতা উল্টান। ক্রমাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা, তামাক এবং মাঝে মাঝে নানাবিধ খাবারের অত্যাচারে আমরা দুই বন্ধুতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; কিন্তু শরৎদার ভালবাসার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। আমি শেষে বলিলাম—"শরৎদা, আপনার এই obscene কুকুরটার প্রথম অভ্যর্থনায় মনে হয়েছিল যে, আপনি বুঝি কাল-ভৈরবের সাধনায় মন দিয়েছেন, কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে সেই আগেকার নটরাজের মূর্তিই বেরিয়ে এল।" শরৎদা কোনো উত্তর না দিয়া সেই কুকুরটার মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন মাত্র।

তাঁহার অতি-ভালবাসার আর একটা নিদর্শন ঐ বিশ্রী কুকুরটাই। সে কুকুরটার কথা অনেকেই লিখিয়াছেন কিন্তু সেই কুকুরের মালিকটার প্রাণটা বুঝিতে নিশ্চয়ই কাহারো ভুল হয় নাই। শরৎদা ঐরকমেরই মানুষ ছিলেন তাঁহাকে যে একটু ভালবাসিয়াছে, তাহার কাছে তাঁহার কোনো কিছুই ঢাকা থাকিত না। এই স্নেহময় প্রাণটার সমস্তটুকুই ছিল একেবারে খোলা। দোষ বল, গুণ বল—সমস্তই ছিল

উদার উন্মুক্ত। যেমন ছিল তাঁহার খিলখিল তরল-হাসি, তেমনি ছিল তাঁহার তরল স্বচ্ছ ব্যবহার। এ তরল সরস প্রাণটি যেমন আঘাত-অসহিষ্ণু ছিল, তেমনি ছিল পরের বেদনায় দরদী। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর একটা গরুর প্রসববেদনার কাতরধ্বনিতে সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছিলেন এবং সেই মূক অসহায় জীবের যন্ত্রণার উপশম করিতে না পারিয়া সারারাত্রি সৃষ্টিকর্তাকে গালি পাড়িয়াছিলেন। বিশ্বরচনার মধ্যে কোথায় যে গলদ আছে তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" বলিয়া সহস্র বেদবেদান্ত চীৎকার করিলেও জন্মমৃত্যুর দুঃখানুসঙ্গিতা লক্ষ্য না করিয়া মানুষ পারে না। স্নেহময় শরৎদাও পারিতেন না।

বাল্যজীবনে শরৎদা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশী করিয়া পড়িতেন তাহার মধ্যে চার্লস ডিকেন্‌স্ বোধহয় তাঁহার কাছে বেশী আদর পাইয়াছিল। অনেকদিন ডিকেন্‌সের ডেভিড কপারফিল্ড হাতে করিয়া এখানে সেখানে—এবাড়ি ওবাড়ি পর্যন্ত করিতে দেখিয়াছি। মিসেস্ হেনরী উডের ইস্টলিন্‌খানিও প্রায় তদনুরূপ আদরই পাইয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষবয়সের লেখার মধ্যে ডিকেনস বা উডের লেখার তেমন প্রভাব দেখা গিয়াছিল কি না সন্দেহ। বোধহয় মধ্যবয়সে কলিকাতা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তিনি যে সমস্ত আধুনিক লেখকদের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারই ফল তাঁহার লিখিত উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের লেখার দোষগুণ সম্বন্ধে বলিবার কোনো অধিকার আমার নাই। তিনি আমার বাল্যজীবনের সাহিত্যসাধনার গুরু—তাঁহার রচনা বিষয়ে আমি কিছু বলিবার স্পর্ধা রাখি না। তাঁহার সাহিত্যিক এবং রসসৃষ্টির মত ও ধারা আমরা সব সময় অনুসরণ করিতে পারি নাই এবং সেইজন্যই এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ রসজ্ঞের উপর ভার দিয়া আমাদের সরিয়া দাঁড়ানই শোভন।

আমরা ভাগলপুরে থাকাকালীন তাঁহার প্রথম সাহিত্য-জীবনে তাঁহাকে [শরৎচন্দ্রকে] যে জানিতাম এই কথার কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন...

আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানি না। (মেজদা ৺ইন্দুভূষণ ভট্ট বোধহয় তাঁহাকে "আদমপুর ক্লাবেই" প্রথম জানেন)। কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র (মেজদা কিন্তু ইহাকে 'ন্যাড়া' বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।)—তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক। প্রথম জীবনের সে অকিঞ্চিৎকর লেখার পাঠক আমাদের পরিবারের কয়েকটি সমবয়স্কদিগের মধ্যেই পূর্বে আবদ্ধ ছিল। দুইটি ভাজ, একটি ভগ্নী এবং একটি দুই বৎসরের বড় সহোদর ভাই—ইনিই শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট। ফার্স্ট ইয়ারে বা স্কুলের ছাত্ররূপে তিনিও তখন অজস্র কবিতা লিখেন, তাই আমার সহযাত্রী হইলেন। ভাজ দুইটির কল্যাণেই আমার সেই লেখা ও বৈমাত্রেয় বড় ভাই ভগিনীপতি প্রভৃতির মধ্যে প্রচারিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদের বন্ধুমহলেও প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহার অল্পদিনের মধ্যেই মেজ ভাজ মেজদার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্রপরিসর 'সাহিত্যচক্রে' (যাহাতে তদানীন্তন বাংলার বিখ্যাত লেখকদিগের গল্প উপন্যাস এবং কাব্য-কবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইত সেইখানে) হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'। শুনিলাম, দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলে অভিভূত তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে—

"এই গল্পটি প'ড়ে একজন ন্যাড়াকে মারতে ছুটে, তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়।" ক্রমে বৌদিদি দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন "অভিমানের" লেখকের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাব বিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মস্‌জেদ ছিল (শুনা যাইত তাহা নাকি সাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষচ্ছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোনো গভীর রাত্রে সেই মস্‌জেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ-চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো "যমানিয়া" নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন, "এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।" আমাদের সেই অল্পদিন অধিকৃত বাসাটি উক্ত নদীর তীরে সুবিস্তৃত সুউচ্চ টিলার উপর অবস্থিত ছিল; তাহার চারিদিকের অসমতল ভূমিতে তাহাকে পাবত্য অধিত্যকার মতোই দেখাইত। সেই বাটীর অধিকারীর আত্মজনের কয়েকটি স্মৃতিসমাধি নদীতীরের টিলার গাত্রে ক্রমোচ্চভাবে স্থাপিত ছিল। আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতি-সমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া আসিয়া গানের এক লাইন আবিষ্কার করিল—"আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি, অমনি মুদিলি আঁখি।" ইহার পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু বাঁশী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রচিত আরও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল "গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন।" আমাদের পাড়া খঞ্জরপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মস্‌জেদ ও নদীতীর প্রভৃতি তাঁহার বিচরণস্থান ছিল এবং দাদাদের কাছেও প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম—তিনি আমাদের ছোটদারই বিশিষ্ট বন্ধু। ইহাতে আমাদের দল সেদিন বিশেষ গর্বই বোধ করিয়াছিল।

আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদা তাঁহার

নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐসব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। একদিন দেখি—ছোটদা আমার একটি নূতন কবিতার মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন "আরো যাও—আরো যাও–দূরে—থামিও না আপনার সুরে।" পরে শুনিলাম শরৎ দাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন "ঐ একটি ভাব আর একটি কথা ছাড়া বুড়ী যদি আর পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে।" এই কথায় ছোটদার হাতে উক্ত কবিতাকারে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুশী করি তাহার কয়েক ছত্র মনে পড়িতেছে; সেও একটি 'সমাধি'র উদ্দেশ্যেই কল্পনার সঞ্চরণ; এও হয়তো অলক্ষ্যে পূর্বতন কবিদিগের কবিতার অনুসরণ বা অনুকরণ!

"ধরণীর সুস্নিগ্ধ বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই
নদীতীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি লুকায়েছ তাই!

* * *

নদী গায় সকরুণ তান, হুহু ক'রে উঠিছে বাতাস
এ বুঝি তোমার খেদ গান, এ বুঝি তোমারি দীর্ঘশ্বাস।"

ইত্যাদি। সেই ক্রম-বর্ধিতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাহার তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি ছোটদাকে বলিয়াছিলেন যে "বুড়ী যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও লিখিতে পারিবে।" কিন্তু সেকথা তখন বোধহয় আমরা তেমন বিশ্বাস করি নাই। ক্রমে আমরা শরৎ দাদার আরও কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। "বাসা" (যার নাম সুরেন্দ্রভাই 'কাকবাসা' দিয়াছেন, 'বাগান' (ইহাতে 'বোঝা', 'কোরেল গ্রাম', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প ছিল),

'চন্দ্রনাথ', 'শিশু', 'পাষাণ' (এই গল্পটিকে আর দেখিলাম না। একজন পরমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যন্ত্রণায় আমরা এতই অভিভূত হইযাছিলাম যে, সে গল্পটির কথা আজও মনে আছে ; পবে শুনিয়াছি যে, অভিমানের মতো সেখানিতেও একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের ছায়া ছিল। কিন্তু ঐ দুইটি গল্পে যে তরুণ শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত)। এই 'শিশু' গল্পটিই পরে 'বড়দিদি' নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তাঁহাদের "সাহিত্য-সভা" ও "ছায়ার" কথাও জানিতে পারি। আমার লেখাও তাহাতে 'শ্রীমতী দেবী' নামে তাঁহারা দিতে লাগিলেন। একটু-আধটু গদ্য লেখার চেষ্টা আসিলেও শবৎ দাদার গল্পপাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকাশে তখন বোধ-হয় আমাদেব লজ্জা আসিত। শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, আমার ছোটদা—ইঁহাদের সঙ্গেই আমার কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত. শরৎ দাদাই বিষয় নির্বাচন করিযা দিতেন এবং ছোটদার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বোধহয় এই 'ছায়ার' সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার উপরে আক্রমণ করিয়া উক্ত কবিদলের মধ্যে কে যে এই কবিতাটুকু লিখিযাছেন তাহা আজ মনে নাই ; কিন্তু কবিতাটুকু মনে আছে—

"ঐ কুঞ্চিত কেশ মার্জিত ক্রিটিক্ যোগেশ ক্রুদ্ধ
বলে দীনতার ছবি যত সব কবি কারাগারে হবি রুদ্ধ !"

শ্রীমান সৌরীনের অধিনায়কত্বেই (?) বোধহয় ভবানীপুর হইতে ঐরূপ "অঙ্গুলি-যন্ত্রে" মুদ্রিত 'তরণী' নামে মাসিক পত্রের সহিত 'ছায়ার' সম্পাদক দুই মাস অন্তর বদল হইত এবং তার প্রত্যেক সভ্য দুই মাস ধরিয়া 'ছায়া' সম্পাদন করিয়া নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতেন। 'তরণী' কাগজখানিও প্রত্যেকের কাছে প্রেরিত হইত এবং তাহার লেখাগুলির সমালোচনা প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে করিয়া সম্পাদকের নিকটে পাঠাইতেন। এইরূপে সমালোচনা-শক্তির বিকাশও

শরৎচন্দ্র সাহিত্যসঙ্গীগুলির মধ্যে অনিবার নানাবিধ পথ নির্দেশ করিতেন। শরৎ দাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই, কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—

"—ফুলবনে লেগেছে আগুন!" সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথার' বিষয় হ'লেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।

এইরূপে তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন। তবে আমার লেখা 'তারার কাহিনী', 'প্রায়শ্চিত্ত' ও এইরূপ ছোট ছোট গদ্যাকারে গল্প তাঁহাদের ছায়ায় প্রকাশিত হলেও গল্পলেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার মধ্যে সে সময়ে আসে নাই। শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমণির লেখিকা সুরূপা দিদি (৺ইন্দির' দেবী)-র উৎসাহেই আমি প্রথম একটা বড় গল্প লিখি। 'উচ্ছৃঙ্খল' নামে বহু পরে সেটা প্রকাশিত হয়। শরৎ দাদা বোধহয় তখন গোড্ডা নামক স্থানে চাকরি করিতে গিয়াছিলেন, অথবা মজঃফরপুর আদি দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই গল্পপাঠে তাহার মাথার উপরে লিখিয়া দেন "তুমি যে নিজের মতো করিয়া অনুকে ফুটাইতে পারিয়াছ, ইহাতে বড় সুখী হইলাম।"

ইহার পরেই বোধ হয় 'দেবদাস' লেখা হয়। ঠিক মনে পড়ে না। 'শুভদা' নামে একখানা খাতার অনেকখানি লেখা হইলেও সেটি আর শেষ হয় না। আমরা যখন ভাগলপুর হইতে চিরদিনের মতো চলিয়া আসি, তখন বোধহয় তিনি ভাগলপুরে ছিলেন না। ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

'মন্দির' গল্প লেখা আমরা দেখি নাই; কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশে

থাকাকালীন 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে উক্ত গল্প পড়িয়াই তাহা যে শরৎ দাদার লেখা—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। পরে 'যমুনায়' তাঁহার পুরাতন ও নতুন লেখা নানা গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরে তিনি একবার আমাদের বাড়িতে (বহরমপুরে) আসিয়া কয়েকদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। একটি কথার স্মরণে তাঁহার স্নেহের পরিচয় আজও মনে আসিতেছে; কথাটি নিতান্তই পারিবারিক কথা। ছোটদা তখন বি এল. পাস করিয়াছেন কিন্তু ৺পিতৃদেবের মৃত্যুর জন্য যে তাঁহাকে তাঁহার বড় সাধের এম এ. পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন —ছোটদা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া এম এ. পড়িবেন। আমরা তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যমুনায় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।

ইহার বহুদিন পরে সাহিত্য-সম্রাটরূপে বহরমপুরে তিনি আর-একবার আসিয়াছিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গেও দেখা করিয়া যান। সে সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে দাদা এবং তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু-মহলে যাহা আলোচনা হইয়াছিল সে কথাটিও আজ মনে পড়িতেছে। তাঁহার জন্য মস্ত বোট-পার্টি সজ্জিত—মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী অধুনা মহারাজ, স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন—সময় বহিয়া দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইতেছে 'উৎসব-রাজের" দেখা নাই। তখন বেশির ভাগ ব্যক্তিই এজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে নাকি বলিয়াছিলেন "এই তো ঠিক। কবি কি সকলের হাতধরা নিয়মে বাঁধা পুতুল হবে? সে স্বাধীন স্বতন্ত্র—তার বশেই সকলে চলবে-সে কারও বশে নয়।" বহু সাধ্য-সাধনায় সে পার্টিতে নাকি তাঁহাকে অল্পক্ষণের জন্য মাত্র উপস্থিত করিতে পারা গিয়াছিল

(কিংবা একেবারেই না কি না সেকথা আজ আমাদের স্পষ্ট মনে পড়ে না)।

তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধ প্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মতো প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেদিন আমার ৺স্বামীর সপিণ্ড-করণ শ্রাদ্ধ দিন। উক্ত 'যমানিয়া' নামে অভিহিত গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি ঠাকুরবাড়ি ছিল, তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্য বয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃজায়া (জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রবধূ) আমাদের সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগিনীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই ; (বোধহয় দুঃখে) মাত্র ছোটদা আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম তিনিই শরৎ দাদা। উক্ত কার্যের দানাদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎ দাদা বলিলেন—"ছাখ দেখি—কতটা হাঙ্গামে পড়তে হ'ল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনি দিলে না কেন ?" আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল (যাহা পশ্চিমে বড্ড বেশী) উক্ত শ্রাদ্ধ-কার্যের মধ্যেই আমাকে মোক্ষমভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল ; কিন্তু সেটা এমন সময়—যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয় নাই ; যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে তখন তাঁহারা জানিতে পারিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিষেধার্থ ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোটদার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্ম অনুরোধ করিতে লাগিলেন --অথচ তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয় সামান্মই। প্রতিবেশী এবং দাদাদের বন্ধু-ভাবেই সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন মাত্র। শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত

ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বাড়ি ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎ দাদা আমাদের বাড়ির দিক হইতে পুঁটুলির মতো কি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোটদার হাতে দিলেন। ছোটদা তাহা ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা—৺শ্রাদ্ধের পূর্বে যাহা বাড়িতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধহয় সে সময় আবার সেগুলা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই ছিলেন—ছোটদা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছেন এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজকার্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল। শরৎ দাদার বন্ধুবর্গ যে তাঁহার মনকে খুব কোমল পরদুঃখকাতর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন সেদিন আমাদের নিকটেও তাহা এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।

প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে সুরটি একজন মানুষের প্রতি কথায়, আচরণে, দৃষ্টিতে, অধরোষ্ঠের ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে, তার ভিতর সেই লোকটির ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাই। তিনি যদি লেখক হন, তবে নিজ রচনার মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সেটা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক আত্মিকরূপের একটি দিক মাত্র। আসল মানুষটিকে সেখানে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। স্বকীয় রচনার মাধুর্যে যে গুণী-আপামর সাধারণ সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন, তিনি আর এ জগতে নাই। তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের স্মৃতিতে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থূল-সূক্ষ্ম বহু অভিজ্ঞান রেখে গেছেন। সেই নিদর্শনগুলি আজ আমাদের কাছে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। চকমকি পাথরে সুপ্ত বহ্নি থাকে। আর একটা চকমকির সংঘাতে ও সংঘর্ষে যেমন একটা ক্ষণিক আভা জাগে, তেমনি আমরা প্রতিদিনের জীবনে যাদের সংসর্গে আসি, তারা আমাদের সুপ্ত চেতনার পাষাণ ঠুকে ঠুকে যেন নানা রঙ-বেরঙের ক্ষণপ্রভা উদ্দীপ্ত করে। সেই ক্ষণিক আলোকে আমরা পরস্পরের পরিচয় পাই। আমাদের ভাব চিন্তা সংস্কার শক্তি দুর্বলতা সব ধরা পড়ে সে বিচিত্র আভাসে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছেন, নানা আলাপনের উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী রইল আগামী যুগের অধ্যয়ন আলোচনার জন্য। তাদের মূল্য নিরূপণ করতে হলে যে পরিস্থিতির প্রভাবে ও প্ররোচনায়, সুখ-দুঃখের বিচিত্র প্রতি-ক্রিয়ায় শরৎচন্দ্রের সহজাত প্রতিভা ও অনুকম্পা উৎসারিত হয়েছিল তাঁর অন্তঃসলিলার মুক্তধারায়, সেই সব অনুকূল প্রতিকূল ঘটনাবলী ও পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে মাথটমাশুল কতখানি তিনি আদায়

করেছিলেন—তার একটা হদিস পাওয়ার প্রয়োজন আছে। এইসব মালমসলা হবে তাঁর জীবন-সংহিতার ভাষ্য।

ভ্রমরের একটা নাম মধুলিহ, কারণ সে ফুলে ফুলে মধু আস্বাদন করে এবং তার আর একটা নাম মধুকর, যেহেতু সে সৃষ্টি করে নানা পুষ্পনির্যাসে স্বকীয় মধু। শরৎচন্দ্র গৌড়জনের জন্য যে মধুচক্র নির্মাণ করে গিয়েছেন, সে মধু কোন পদ্মবনে, কোন মালঞ্চে, কোন আরণ্য-নিভৃতে সঞ্চিত হয়েছে তার সন্ধান লাভ করলে আমরা দেখতে পাব সমগ্র বাংলার পল্লী শহরে তার সুবিস্তীর্ণ পটভূমি।

আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে অব্যাহত গতি শুধু সাহিত্যিকের। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাঁদের বুঝতে হলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অবাচীনের কাছে তাঁরা দুর্জ্ঞেয়। পাণ্ডিত্যের একটা তকমা আছে। চাপরাশের কাছে সবাই প্রণত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রিই হোক বা অন্য কোনোরূপ বৈদগ্ধ্যের উপাধিই হোক, নির্বিচারেই তা সাধারণের কাছে সম্ভ্রম আদায় করে। আমরা মেনেই নিই যে, লোকটা মার্কামারা—মেকি নয়। কিন্তু অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের মতো সাহিত্যক উপাবিধারী নন। বাহিরের সম্বলের মধ্যে তাঁর আছে কেবল কালি, কলম আর কাগজ, আর আছে অন্তর্গূঢ় প্রতিভা। নিছক আত্মশক্তি ও অতন্দ্রিত সাধনার বলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ভুবনবিজয়ী হন। নদীর মতোই আপনার খরধারার আবেগে পথ কেটে চলেন, কূলে কূলে অমৃতধারা বিতরণ ক'রে। তিনি স্বয়ংভু, আত্মস্রষ্টা, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি।

যে পথ বিপদসঙ্কুল, সাধারণের অগম্য ও নিষিদ্ধ, সেখানে তাঁর অপ্রতিহত গতি। প্রাণের প্রেরণা স্থানে অস্থানে তাঁর জীবনতরীকে নিয়ে যায়। কত ঝড়ঝঞ্ঝা নৌকাডুবির দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি তাঁর দুর্বল পসরাটি পূর্ণ করে আনেন, আমরা নির্বিঘ্নে ঘরে ব'সে তার আনুকূল্য ভোগ করি। প্রমিথিউস্ স্বর্গ থেকে অগ্নি অপহরণ

করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ গিরিগহ্বরে বন্দিদশা ও চিল-শকুনের চঞ্চু-প্রহরণ। কিন্তু তাঁর কল্যাণে ঘরে ঘরে জ্বলল প্রদীপ, পাকশালার উনানে জ্বলল রন্ধনের আগুন। ডুবুরি যদি প্রাণভয় বিসর্জন ক'রে অতলস্পর্শে ডুব না দিত, তবে সাগরের রত্নরাজিকে উদ্ধার করত কে? শরৎচন্দ্রের অনুভূতি ও ভাবপ্রকাশ ছিল নিত্যযুক্ত তাঁর রচনায়, বার্নস্ বা রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন কথা ও সুর যমজ হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যথার সঙ্গে অশ্রু, ক্ষতের সঙ্গে রক্তপাত, প্রেমস্পর্শের সঙ্গে পুলক যেমন চিরসম্পৃক্ত। যে সত্যজীবনে পরিপাক লাভ করেছে, ধূমলেশহীন শিখার মতোই তা জ্যোতির্ময়। আগুনটা ভাল ক'রে ধরেনি যে কাঠে, তাতে ফোটে না তো বহ্নিদীপ্তি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে কেবল ধূম্রজাল। শিবপুর কলেজে ছিলাম যখন, সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বছর কুড়ি আগেকার কথা। আমি তাঁর লেখার ভক্ত ছিলাম; সশরীরে যখন দর্শন দিলেন তখন তাঁর কল্পমূর্তিটি পেল তার বাস্তুভিটা আমার চোখে। ভক্তের সঙ্গে ভক্তবৎসলের প্রীতি স্বাভাবিক, অল্পদিনেই অন্তরঙ্গ পরিচয় হ'ল। আমি আজন্ম শহরে বন্দী, আর পথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক, আমার পল্লীবুভুক্ষু মন তাঁর মুক্তপ্রাণের খোলা হাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে সময় ঘন ঘন আমাদের দেখাশুনা হ'ত, আর বাধত চিরচলিষ্ণু জঙ্গমের সঙ্গে এই স্থাবরের মল্লযুদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত রেডিয়ামের কণা যেন অজস্র বর্ষিত হ'ত আমার অন্ধকার মনের পর্দার উপর, স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে উঠল জ্বলে জ্যোতির্বিন্দুগুলি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত কেবল গল্প আর তর্ক। তাঁর জ্ঞানবৃক্ষের ডালে ডালে ঝাঁকি দিয়ে সংগ্রহ করতাম পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফলসম্ভার। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পরের বুলি কপ্‌চানো নয়—তাজা প্রাণের সুখদুঃখ-সঞ্চিত অম্লকটুমধুর দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। সিনেমার ফিল্মে আঁকা অফুরন্ত চিত্রাবলী, নানা ঘটনার পরম্পর দরদী হৃদয়ের স্নেহরসে অনুরঞ্জিত। স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত জীবনে যেমন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ, মুক্তশক্তির লীলা—তেমনি আবার বহু অনুশাসনে

নিষ্পিষ্ট রুদ্ধশ্বাস প্রাণধারায় আছে প্রবল বিক্ষোভ ও বেদনা। স্বেচ্ছাবৃত দৈন্যদুর্গতিতে কত প্রাণঋদ্ধি ও মহত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে এই বাংলার অন্তঃপুরে এবং আঁস্তাকুড়ে তার ইঙ্গিত পেতাম শরৎচন্দ্রের সহৃদয় ঘোষণায়। তাঁর যুক্তিবিচারের প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যক্ষের মর্মস্থলে, আর অটুট বিশ্বাস ছিল আপনার সূক্ষ্মদর্শী অনুভূতির উপর। হলে-যা-হতে-পারত সেই সম্ভাব্যতাকে দেখে প্রেমিকদের যে দৃষ্টি, শরৎচন্দ্রের সেই দৃষ্টি ছিল। বেসুরো জীবনের অন্তর্গূঢ় সুরটি তাঁর কানে জাগত। তাঁর প্রবীণ হৃদয়ের এই সহানুভূতি ও আশাশীলতা আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল। মানুষের ভাল এবং মন্দ দুই-ই তিনি যথেষ্ট দেখেছিলেন, তাই খাঁটি আর মেকির পার্থক্যটা চমৎকার বুঝতেন। মতে—আদর্শে—দৃষ্টিকোণের সংস্থানে—জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে আমাদের বৈসাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট, বাদানুবাদের অন্ত ছিল না, কিন্তু মনে পড়ে না কখনো সেজন্য কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তাঁর উদার প্রেমিক হৃদয় সব ব্যবধান অতিক্রম ক'রে হৃদয়ের মিলনকেন্দ্রটিতে সহজে উপনীত হ'ত। ছোট ছোট দু-একটি কথায় ঝলমলিয়ে উঠত অভিজ্ঞ জীবনের দামিনী দীপ্তি। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বোধ করি আত্মবিরোধ। আদর্শের সঙ্গে, অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে আজন্মের শিক্ষাদীক্ষা সঙ্গ-সংস্কার এবং সর্বোপরি দৈবনির্বন্ধ অন্তরের নির্দেশকে জীবনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে। এ ব্যর্থতা আমাদের সকলের জীবনেই অল্লাধিক পরিমাণে আছে। যাঁদের নাই অথবা থাকলেও ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তাঁরা মহাপুরুষ। কিন্তু মানুষের ত্রুটি প্রমাদ ভীরুতা অক্ষমতা যেমন সত্য, তেমনি তার আধ্যাত্মিক মহত্ব অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা, অনায়ত্ত আদর্শের জন্য ব্যাকুলতা ও বেদনা বোধহয় গভীরতর সত্য পৃথিবীর নদীপর্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যবিস্তার, দিবা-রাত্রির আলো-অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিগোচর, তার খনিজ গুপ্তধন সাগরগর্ভের রত্নাবলি অলক্ষ্যের অন্তরালে সুরক্ষিত গোপন সম্পদ।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে বাংলা আজ কণ্ঠহীন হইয়াছে। যে সুললিত কণ্ঠ অপূর্ব মাধুর্যের সহিত এতদিন বাঙালীর নিবিড়তম গভীরতম সুখদুঃখের বাণী বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল সে কণ্ঠ আজ নীরব; যে লেখনী বাঙালীর জীবনের তুচ্ছ সাধারণ কথাকে এতদিন অপূর্ব মাধুরী-মণ্ডিত করিয়াছিল সে লেখনী আজ স্তব্ধ হইয়াছে।

সারা বাংলা আজ তাই মূঢ় স্তব্ধ বেদনায় নির্বাক হইয়া এই সর্বনাশ শুধু অনুভব করিতেছে।

এ সর্বনাশ যে কত বড়, বাঙালীকে শরৎচন্দ্রের দান যে কত বৃহৎ, কত মহার্ঘ—তাহা নির্ণয় করিবার সময় আজ নয়, মুহ্যমান বঙ্গবাসীর তাহা হিসাব করিবার শক্তি বা অবসর আজ নাই।

আমরা আজ শুধু সেই প্রতিভার অবলুপ্ত অবতারের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রতীক্ষা করিব। সেইদিনের—যেদিন এই প্রতিভার স্ফুরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মূল্য নির্ণয় হইবে ও তাঁর স্মৃতি এমন একটা গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে যে গৌরব শরৎচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে পান নাই।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার যুগে আমরা ছাত্র ছিলাম। তখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর প্রবেশ করেছি, বঙ্কিমের প্রভুত্ব তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাজ করছে। কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে চোখের বালিতে এসে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু দোষে গুণে যে জীবন আমরা নিত্য যাপন করি তাকে আরো স্পষ্ট ক'রে আমরা সাহিত্যে পাবার জন্য লুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। শরৎচন্দ্র ঠিক সেই সময়ই আবির্ভূত হলেন এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দেশের চিত্তবৃত্তিকে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিলেন। হঠাৎ একদিন আমরা আবিষ্কার করলাম যে তিনি একান্তই আমাদের।

ভাবাবেগের ঢেউ কাটিয়ে যখন বিচার-বুদ্ধির শক্ত জমিতে পা পড়লো, তখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করবার দুষ্টবুদ্ধি মাথায় আসেনি এমন নয়—কেতাবী যুক্তিতর্কের যাঁতাকলে ফেলে বিশ্লেষণ করে দেখার ইচ্ছা হয়নি এমন নয়—কিন্তু সমস্ত অপচেষ্টাকে ছাপিয়েই তিনি আমাদের হৃদয়কে জয় করেছিলেন। সে তাঁর অনন্য-সাধারণ স্টাইল আর অকপট অনুভূতির জোরে—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অতিমানুষী প্রভাবের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এত বড় বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য দাবি করার শক্তি আর কারুরই হয়নি—হওয়া সহজও নয়।

বলা বাহুল্য, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত বলা যায় না—তিনি জীবিত থাকলে একথা শুনে হয়তো কান মলেই দিতেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি যে একান্ত তাঁরই ছিল এবং তাঁর স্টাইলও যে কারুর ধার-করা নয়, একথা কোনো প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য খবরের কাগজে তাঁকে দীন-দুঃখী ও নির্যাতিতের

বন্ধু এবং পতিতাদের পেট্রন ব'লে ঘোষণা করা হয়ে থাকে—সরল-হৃদয় শরৎচন্দ্রও এতে খুশী হতেন এবং মনে করতেন এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুতঃ এটা সাহিত্য-বিচারে সুলভ ism-এর দোহাই ছাড়া—এর উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এত বড় ছিলেন ; ism জিনিসটা জীবদেহে অস্থি-সংস্থানের মতো অন্তর্লগ্ন জিনিস—এ যে রচনায় গলাবাজি ক'রে বাইরে আত্মস্বাতন্ত্র্য দাবি করে সে রচনা আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না।

শরৎচন্দ্র কোনো দিনই মনে করেননি যে পাপতাপ পতনস্খলনই জীবনের চরম গতি বা পরম প্রসাদ। কিন্তু জীবনে এদের স্বীকৃতি আছে—নীতিজ্ঞানবশে এদের উড়িয়ে দিতে যাওয়া নিরর্থক—এদের মেনে নেয়াতেই জীবনের সার্থকতা—তাই তিনি এদের শ্রদ্ধা দিয়ে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর যদি মিশনারী বুদ্ধির আতিশয্য থাকতো তাহ'লে তিনি এদেরই মহিমান্বিত করে তুলতেন এবং এদের পাশে এসে ক্ষমা প্রেম পবিত্রতা তুচ্ছ হয়ে যেতো। বস্তুতঃ তা তিনি করেননি—দরিদ্রকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, কিন্তু অদরিদ্রের বিরুদ্ধেও তিনি জেহাদ ঘোষণা করেননি ; পতিতাকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু সতীর বিরুদ্ধেও তাঁর কোনো নালিশ ছিল না। জীবনকে যিনি সত্যকার চোখ দিয়ে দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টি কোনোদিনই সে রকম একদেশদর্শী হতে পারে না। এখানেই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি শুধু তাঁরই—তিনিই দেশকে বুঝিয়েছেন যে মানুষ দেবতাও নয়, দানবও নয়—দুয়ের উপাদানই তাতে আছে, তার চেয়ে বেশীও কিছু আছে, তা তার মানবত্ব। এই সর্বাঙ্গীণ মানবত্বের উপাসক বলেই তিনি আমাদের নমস্য।

তাঁর সাহিত্যে বিশ্বমানব নেই—তারা পরস্পরবিরোধী অনবৃত্তির প্রতিনিধি রূপে একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় না। তারা ভাল-মন্দ দোষ-গুণ নিয়ে একান্ত আমাদের মতোই মানুষ—তারা দোষ করে আমাদেরই মতো, আমাদেরই মতো দোষের উর্ধ্বে ওঠে—

ক্ষমা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, মমতা দিয়ে। সাহিত্যের মধ্যে তাদের মেনে নেয়াতে সত্যকেই মেনে নেয়া হয়, আর যে সাহিত্য তাই মেনে নেয় সেই সাহিত্যই সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য হয়। সেদিক থেকে তাঁর মতো খাঁটি বাঙালী লেখক এ যুগে আর কেউ নেই—বাংলাকে আর কেউ এত ভালো করে দেখেনি, এত ভালো কেউ বাসেনি। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দোষে গুণে বাঙালী জাতটা, বাংলা দেশটা বেশ'—তাঁর সাহিত্য তাঁর সেই ঐকান্তিক উক্তিরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। যুগ যুগ ধরে তা থেকে বাঙালী প্রাণের খাদ্য আহরণ করবে।

শরৎচন্দ্র আজ নেই—তাঁর সাহিত্য আছে, চিরদিনই থাকবে; কিন্তু যে মানুষটির জীবনব্যাপী সাধনা ও উপলব্ধি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে মস্ত হয়ে জাতির মনপ্রাণকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে, তাকে চিরদিনের জন্যে এত বড় করে দিয়েছে তাঁরও কি সত্যিই বিনাশ আছে!

শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সবেমাত্র আমাদের সাহিত্য-সাধনা শুরু হইয়াছে—সন তেরো শত উনিশ সালের মাঘ মাসে স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্যে" "বাল্যস্মৃতি" নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়; লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পল্লীগ্রামের এক গরীব বামুন কলিকাতার কোনো "মেসে" ঠাকুরের কাজ করিত, তাহাকে লইয়া গল্প। পাড়াগাঁয়ের লোককে লইয়া গল্প, গল্পটি আমাদের ভাল লাগিল। ইহার পূর্বে আমরা শরৎচন্দ্রের নাম শুনি নাই। তাঁহার কোনো লেখা পড়ি নাই। পরের দুই মাসে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' বাহির হইল, কাশীনাথ আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। কাশীনাথ পড়িলাম, পড়া বন্ধ করিয়া কাঁদিলাম।

কাশীনাথ পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু কাশীনাথ যে খুন হইল, কমলা যে আত্মহত্যা করিল, ইহা আমাদিগকে ব্যথিত করিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। মনে হইল সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিব, ভিতরের খবর জানিয়া লইব। সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

ভগবৎ-কৃপায় একদিন সুযোগ মিলিল। কলিকাতায় আসিয়া ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধরদাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হইলাম। অতঃপর একদিন ভারতবর্ষ কার্যালয়ে ২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ত্রিতলের একটি ঘরে শরৎচন্দ্রের দর্শনলাভ করিলাম।

সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শরৎচন্দ্র বসিয়া সিগারেট খাইতেছিলেন, দাদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমি প্রণাম করিলাম। তিনি 'হয়েছে হয়েছে' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। আমি বীরভূমের লোক জানিয়া তিনি বলিলেন—"আমি বীরভূমের

খানিকটা দেখে এসেচি, কিন্তু নানুর আর কেন্দুলী দেখা হয় নাই, একবার দেখে আসতে হবে।" আমি উৎসাহিত হইয়া হেতমপুর রাজবাড়ির নামে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম এবং বীরভূমের কোথায় কোথায় গিয়াছেন জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"যদি কখনো বীরভূম যাই আপনাকে খবর দেবো। আমি ট্রেনে সাঁইথিয়া বোলপুরের পথে কতবার যাতায়াত করেচি। একবার সাঁইথিয়ায় নেমে দিন দুই ধরে ঐ অঞ্চলটা দেখে গিয়েছিলাম। আর একবার ছোটখাটো একটা দলের সঙ্গে বক্রেশ্বর দেখতে এসেছিলেন। আমি কিছুদিন বনেলী স্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলচে। স্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্মচারী সেই কাজে স্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলেম। ডাঙার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হ'তো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচগানের মজলিস দিতেন। সেই সময় আমরা কয়েকজন মিলে বক্রেশ্বর বেড়াতে যাই। বক্রেশ্বরের শ্মশানটা আমার বড় ভাল লেগেছিল। শিবের মন্দিরের দিকটাও খুব নির্জন।"

প্রথম পরিচয়ের দিনেই এইরূপ প্রাণখোলা আলাপে অত্যন্ত আনন্দ হইল।

এইরূপ প্রাণখোলা আলাপে সাহস পাইয়া "কাশীনাথের" কথা উত্থাপন করিলাম। 'কাশীনাথ' নাম শুনিয়াই তিনি ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"শুধু কাশীনাথ নয়, সাহিত্যে যে ক'টা গল্প বেরিয়েছে, ওর সব ক'টাই আমার বাল্যকালের লেখা, গল্পে কি যে ছিল মনেও নেই। আমাকে না জানিয়ে একবার দেখতে পর্যন্ত না দিয়ে হঠাৎ গল্পগুলো বের করে দিয়েচে। প্রুফটা পেলে অন্ততঃ একবার চোখ বুলিয়ে দেওয়া যেত। ভায়াকে (ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে) বলেছিলাম—ভায়া, লিখে দিন ও গল্পগুলো আমার নয়—তা ভায়া কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন।"

দু-একটা কথার পর আমি কাশীনাথের খুন হওয়া এবং কমলার আত্মহত্যার কথাটা তুলিয়া একটু পরিবর্তন করা চলে কি-না দেখিতে অনুরোধ। করায় বলিলেন—"ও গল্প কখনো বই-এর আকারে বেরুবে কি-না জানি না। যদি বেবোয় নিশ্চয় পরিবর্তন করতে হবে। তবে ও গল্প আর বই কবে ছাপাবার ইচ্ছা নেই।" সাহিত্যে 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হওয়ায় তিনি যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন পত্রান্তরে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত পত্র হইতেও তাহা জানা যায়। অতঃপর কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে কতবার দেখা হইয়াছে। কত সভাসমিতিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি. প্রথম পরিচয়ের দিনের সেই স্নেহের কোনো ব্যতিক্রম দেখি নাই। আমি তাঁহাব বাজেশিবপুরের বাসায এবং পানিত্রাসের বাড়িতেও কয়েকবার গিয়াছি। একদিনের কথা বলিতেছি। বাজেশিবপুবে শবৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং অনুরক্ত ভক্ত হরিচবণ মিত্র স্টার থিযেটারে স্বর্গগত অপবেশবাবুর নিকটে প্রাযই আসিতেন। আমরা তাঁহাকে ভূতনাথবাবু বলিয়া ডাকিতাম। তিনি এ্যাব্রেট কোম্পানীর ঘড়ির দোকানে কাজ কবিতেন। একটা ছুটির দিন তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কথ বহিল সকাল সাতটা নাগাদ পৌঁছিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত দিনেব বেশির ভাগ সময শরৎচন্দ্রেব সঙ্গে কাটাইতে পারিব।

যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। শরৎচন্দ্র এই নিমন্ত্রণের কথা জানিতেন, তাই ভূতনাথবাবু একেবারে আমাকে শরৎচন্দ্রের বসিবার ঘরেই লইয়া গেলেন। একটা মাঝারি টেবিলের তিনধারে তাঁহার নিজের বসিবার চেয়ার ছাড়া আর খান-দুই চেয়ার এবং একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল। টেবিলের উপর সুন্দর বাঁধানো খান-দুই খাতা, একটি পরিষ্কৃত দোয়াতদানে লাল এবং কালো কালির দুইটি দোয়াত ও গুটি-চার কলম গুটি-দুই দামী ফাউণ্টেন পেন, আর কয়েকখানি বই যত্নসহকারে সাজানো। পাশে একটি প্রকাণ্ড গড়গড়া, চাকর আসিয়া তামাকু দিয়া গেল। আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম,

ভূতনাথবাবু বাজারে চলিয়া গেলেন। তামাক খাইতেছি, হঠাৎ গল্প বন্ধ করিয়া কিছু না বলিয়াই শরৎচন্দ্র ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। মনে হইল কে যেন ডাকিল; আমাকে কিছু না বলিয়া যাওয়ায় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হইলাম। দেখিতে দেখিতে আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল, শরৎচন্দ্রের দেখা নাই। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি শরৎচন্দ্র আসিতেছেন। চোখে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতেছে, কান্না চাপিবার চেষ্টায় সারা দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। মনে হইল যে তিনি বাড়ির ভিতরে থাকিতে পারেন নাই। হয়তো আমার কথা তাঁহার মনে ছিল না, এখন বাহিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; না পারি উঠিয়া যাইতে, না পারি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে। অনেকক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র কথা কহিলেন—"পাখীটা মরে গেল। কোনো রকমে বাঁচানো গেল না। তিনদিন মাত্র অসুখটা জানতে পেরেছি; কত চেষ্টাই তো করলাম—আজ তিন বছর পাখীটা সঙ্গে সঙ্গে ছিল, একদণ্ডের জন্য কাছছাড়া করিনি। তেমন বেশী গুরুতর অসুখ তো জানা যায়নি। হঠাৎ বেড়ে ওঠায় বাড়ির ভেতর থেকে খবর পেয়ে উঠে গিয়েছিলেম। কিছু মনে করবেন না।" মনে যাহা করিলাম, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দুই-একটি কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং ভূতনাথবাবুকে সব কথা বলিয়া কোনো রকমে বুঝাইয়া কলিকাতা পলাইয়া আসিলাম।

শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িয়া আমরা তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, এমনই ছোটখাট দুই-একটি ঘটনায় ও আলাপের মধ্যে দুই-চারিটি কথায় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার সরস আলাপ, তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা, তাঁহার মার্জিত রুচি এবং উন্নত চিন্তা সাহিত্যিকসমাজের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। এই মানবপ্রেমিক শক্তিমান সাহিত্যসাধকের অনুভূতিপ্রবণ কোমল প্রাণ অল্পেই চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র বাঙালী জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রকে আমি শুধু লেখক হিসাবেই জানিতাম না; সাহিত্যিক হিসাবে মানুষের প্রতি তাঁহার অসীম সহানুভূতি মমত্ববোধ এবং দুঃখী ও নিপীড়িতের মর্মবেদনা প্রাণ দিয়া অনুভব করা—তাঁহাকে দেশবাসীর একান্ত আপন ও প্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-স্রষ্টার অন্তরালে তাঁহার যে মনটা লুকান ছিল তাহার বহু পরিচয় পাওয়ার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁহার স্নেহ-প্রীতি লাভ করিবার সৌভাগ্য করিয়াছিলাম এবং তাঁহার বন্ধুত্বের মাধুর্য, সস্নেহ সাহায্য ও সমর্থনে আমি অভিভূত ছিলাম। বাস্তবিক ব্যক্তিগত জীবনে পরস্পরের প্রীতি-নিবদ্ধ বন্ধুত্ব যে পারিপার্শ্বিকতার ক্ষুদ্রতা ছাড়াইয়া কতদূর উঠিতে পারে—তাহার বার বার নিদর্শন পাইয়াছিলাম শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে ও চরিত্রে।···শরৎচন্দ্র যে তাঁহার মনীষা দ্বারা শুধু বাঙালীরই চিত্তজয় করিয়াছিলেন তাহা নয়, পাশ্চাত্ত্য দেশেও তাঁহার প্রতিভা সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে এবং বাঙালীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে। বিগত পাশ্চাত্ত্য দেশ ভ্রমণের সময় আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। একবার জেনেভায় লীগ অব নেশন কার্যালয়ে জনৈক বাঙালী বন্ধুর নিকট আমি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলাম যে, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পাশ্চাত্ত্য দেশে আর কোনো বাঙালীর নাম শুনা যায় না। এই কথায় নিকটে উপবিষ্টা একটি বিদেশিনী মহিলা অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বাঙালী লেখকও তো পাশ্চাত্ত্য দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন; তাঁহার দুই-একখানি পুস্তক নাটকরূপে রূপান্তরিত হইয়া লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ও বিদেশীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বলা বাহুল্য, সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশে এই সংবাদে আমি বাঙালী হিসাবে গর্ববোধ করিয়াছিলাম।

শরৎচন্দ্র ছিলেন উদার, কোমলহৃদয় ও আবেগময়। তাঁহার অন্তরে ছিল সর্বপ্রকারে অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। হৃতসর্বস্ব পদদলিতের জন্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল সীমাহীন করুণার স্রোতধারা। বাংলার শ্যামল মাটি হইতে টানিয়া লইয়াছিলেন দেহ ও মনের রস– আর তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার বিচিত্র সাহিত্যে। যে প্রতিভা নরনারীর কামনা-বাসনাকে শুধুমাত্র সৌন্দর্যভরা কবিতা ও গল্পে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে পাষাণের মতো চিরস্থায়ী করিয়া রাখে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সে দলের নয়।

তাঁহার লেখনী ছিল সমাজ-সংস্কারকের। তিনি ভুলিতে পারেন নাই তাঁহার চারিপাশের সমাজকে, ভুলিতে পারেন নাই অত্যাচারিত ভাইবোনদের।......

দরদী শরৎচন্দ্র সনৎকুমার রায়চৌধুরী

শরৎচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। প্রথম জীবনে বহু বাধা-বিঘ্ন ও কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল লোকদিগকে আমরা ভুলিয়াও একবার স্মরণ করি না, নিজেদের কুসংস্কার, দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য যেসব লোককে আমরা বরাবরই সমাজের বাহিরে রাখিয়া আসিতেছি, সেসব লোকদিগের প্রতি ছিল তাঁহার অপরিসীম দয়া ও সহানুভূতি।

তাহার সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা আমি এখানে উত্থাপন করিব না। কি কৌশল, কি বিষয়বস্তু, সমস্ত বিষয়ে ছিলেন তিনি আধুনিক কালের বাংলা ভাষার অদ্বিতীয় লেখক। নানা ভাষায় তাঁহার লেখা অনূদিত হইয়াছে। সাহিত্যে অগাধ ব্যুৎপত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ শেষবয়সে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর -উপাধি লাভ করেন। শক্তিশালী লেখক ছাড়াও তিনি ছিলেন প্রকৃত দরদী বন্ধু। বন্ধুত্বাভিলাষী ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কোনো কিছুতে বঞ্চিত হন নাই। যে উদারতা লইয়া তিনি পরবর্তী জীবনে দুঃখ-দৈন্য সহ্য করিয়াছেন নিঃস্ব ও বঞ্চিতদিগের প্রতি তাঁহার সেই দরদের ভাব পরবর্তী জীবনের লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার একখানি বই—জানি না কেন সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সরকারের মতে তাহা নাকি রাজদ্রোহমূলক। তাঁহার জীবন ছিল চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান।

শরৎচন্দ্রের অবিনশ্বর সৃষ্টি চিরদিন অমর অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যতদিন সাহিত্য থাকিবে ততদিন তিনিও থাকিবেন। বহু দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে জীবনের অবসান হইয়াছে, আশা করি তাহা অনন্ত শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করিবে।

স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র বসু

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের যে আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহা শূন্য থাকিবে। বাঙ্গালায় এমন কোনো পরিবার নাই যেখানকার আবালবৃদ্ধ নরনারীর নিকট তিনি পরিচিত ও সমাদৃত নহেন।

কিন্তু কেবলমাত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইয়াই যে আমরা শোকাভিভূত হইয়াছি তাহা নহে, শোকপ্রকাশের অপর কারণ—তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাঙ্গালার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জেলায় বিতরণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইবে।

তাঁহার সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর।...

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সূত্রেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে শরৎচন্দ্র এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে; একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—"কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নহে।"

শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—"আমি কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।"

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন

বিপন্না, তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহার আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকাল তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চিরসবুজ—তরুণ বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সরকার ও পুলিস তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত।

তাঁহার "পথের দাবী" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল—তিনি যে কারারুদ্ধ হন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারাবাস-জনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পারিত। সমাজে যাঁহারা বর্জিত ও উপদ্রুত, তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা। নিজের জীবন তিনি দুঃখ-দৈন্য ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। জীবনের এই কঠোর পরীক্ষায় যাঁহারা মুহ্যমান হইয়া পড়েন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের দলে ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুব-সমাজের নিকটে এই বিদ্রোহের বাণীই তিনি ছড়াইয়াছেন। সত্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্যের সত্য-প্রচারের প্রেরণাই যোগাইয়াছে।

আমাদের দেশে—বিশেষভাবে বাংলায় হাস্যরসের বড় অভাব। শরৎ-সাহিত্যে এই হাস্যরসের প্রাধান্য দেখা যায়। দুঃখ-দৈন্য

তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না বলিয়াই ঘোরতর দুর্দশা বর্ণনাকালেও তিনি হাস্যরসের নির্ঝর বহাইয়াছেন। এতগুলি গুণ একজন মানুষের সচরাচর সম্ভব হয় না—একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্বোপরি আদর্শ মানব।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্বমনপ্রাণে একজন খাঁটি মানুষ। দেহে, মনে ও চিন্তায় তিনি এই বাঙ্গালারই মানুষ, প্রাচীন ও আধুনিক ভাবের একটি সংমিশ্রিত বাঙ্গালীর চরিত্র। আধুনিক জগতের সকল প্রবল চিন্তাধারা প্রবহমান, যাহাদের চরম মূল্য আজিও নির্ধারিত হয় নাই—শরৎচন্দ্রের ভিতরে সেই সকল চিন্তার সমাবেশ দেখিতে পাই। অন্য সকল সাহিত্যিকগণের ন্যায় তিনিও বাঙ্গালী জীবনের অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ করিতে হইবে—তাঁহার সেই উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যা ভালবাসায় ও সহানুভূমিতে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। এই বস্তুই তাঁহাকে কোনো অজ্ঞাত ক্ষেত্র হইতে আকর্ষণ করিয়া বিপুল সাহিত্যযশের মধ্যে বসাইয়াছিল। তাঁহার প্রথম গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়িলেই মনে হয়, যে-জগৎ আমাদের এত পরিচিত অথচ যাহার সম্বন্ধে কেহ কিছু আমাদের চৈতন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরে নাই, তিনি তাহাদের উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের যে সকল নিত্যবস্তু, কেবলমাত্র প্রতিভাবানেরাই তাহাদের প্রকাশ করিতে পারেন। এই সংসারের প্রেম ও আশা, কামনা ও বাসনা, ক্ষয় ও ক্ষতি—শরৎচন্দ্র এই সমস্তকিছুকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, পাঠশালা-পলাতক ও গৃহবিতাড়িত বালকগণকে, চিনিতে পারি বিষাদময়ী কোমলপ্রাণ নারীদের—অজ্ঞাত মাধুর্য লইয়া যাহারা আমাদের যৌথ পরিবারের মধ্যে ফুটিয়া উঠে এবং ঝরিয়া যায়। ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি, মানুষের উৎপীড়ন, জীবনের উৎসমুখকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবার পথ, সংরক্ষণশীল সমাজের সংকীর্ণ অনুশাসনের পরিধির মধ্যে অসম্পূর্ণ প্রেম ও প্রণয়ের সংঘাত—এই সব।

এই সকলের ভিতর দিয়া ইহাও লক্ষ্য করি, এই সকল বাস্তব চিত্রের স্তরে স্তরে একটি উদার হৃদয়ের সহানুভূতি ও মধুর পরিহাসের রসচ্ছটা। এই পথ দিয়াই শরৎচন্দ্র আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতেন। জীবন, সমাজ ও প্রেম সম্বন্ধে আমাদের সংশয় ও শঙ্কা, সমস্যা ও সন্দেহ, সব কিছুর সহিত তিনি আমাদিগকে নিজেদের নিকটেই পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। আধুনিক জীবনের সহিত বাঙ্গালীর স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ ও আপন দেশের সহিত তাহার সংঘাত-চিত্র যেমন করিয়া এই সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর তুলিকায় ফুটিয়াছে, চিরদিনের মতো তাহা শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে প্রাণবন্ত হইয়া রহিল।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন শিল্পী ছাড়াও একজন ন্যস্ত মানুষ। তাঁহার হৃদয় ছিল প্রকৃত মানুষের ন্যায়। সপ্রতিভ ও শান্ত মানুষ—বিশিষ্ট দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং কেবলমাত্র সেই বন্ধুগণই অনুভব করিতেন এই বিখ্যাত শব্দশিল্পীর অন্তরালে মানুষ শরৎচন্দ্রের কতখানি মহত্ত্ব লুক্কায়িত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময়কালীন অন্তরঙ্গতা ও ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্যবশে আজ আমি এই শুভ সুযোগ পাইয়াছি; কিন্তু আজ একথা বলিতে পারিতেছি না যে, তিনি তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্যময় ভাবসম্পদের দ্বারা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছেন সেই অস্তাচলগত বিরাট প্রতিভার জন্য শোক-প্রকাশ করিব, অথবা মানব-সমাজ হইতে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তিরোধান ঘটিল বলিয়া নীরবে মহাকালের নিকট মাথা নত করিব। শরৎচন্দ্রের কথালাপ শুনিলে উল্লাস হইত; তাঁহার খেয়াল-খুশিগুলি ছিল অতি কৌতুকপ্রদ এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁহার দয়ার দান লক্ষ্য করা ছিল আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শরৎচন্দ্র আজ নাই, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি কালান্তর কাল অবধি অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

মানুষ শরৎচন্দ্র তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় বাক্যবিন্যাস করবার ক্ষমতা আমার নেই। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন, "H:s was a feast is presence" শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধেও আমি কেবল এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি। সাহিত্যিক হিসাবে শুধু নয়, মানুষ হিসাবেও তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো pose ছিল না। আমাদের দেশে এবং বিদেশে বহু বড় লোক দেখেছি; কিন্তু তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখেছি একটা অপ্রাকৃতিক pose. শরৎচন্দ্র অতো বড় হ'য়েও কিন্তু অতি সরল ছিলেন।

তিনি কখনও জানাতে চাইতেন না যে, তিনি একজন বড় সাহিত্যিক। তাঁর রসজ্ঞানও অতি প্রখর ছিল। তাঁর এই সব গুণের মূলে ছিল সমবেদনা।

শরৎ-সাহিত্য পাঠ করলেই এ-কথা বোঝা যায়। তিনি যে কেবল আমাদের সমাজের দোষ দেখিয়েছেন তা নয়—সমাজের ভবিষ্যৎ-গতি বুঝতে পেরে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি তারই নির্দেশ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন এমনি একজন, যিনি মহত্তর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আপন জীবনকে পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন।

শরৎ-প্রতিভা

দীনেশচন্দ্র সেন

বহু বৎসর পূর্বের কথা আজ মনে পড়ে—যেদিন আমি "রামের সুমতি" পাঠ করি ; সেদিন এই অজ্ঞাতকুলশীল লেখকটির ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করিয়া এতটা বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, সেই রচনাটির উপর চার-পাঁচদিন ক্রমাগত অশ্রুপাত করিযাছিলাম। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম এই লেখকের স্থান বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর পার্শ্বে এবং এই কথা বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করি নাই। সেই সময়েয় ভারতবর্ষে ১৫।১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী শরৎ-প্রতিভা অভিধেয় এক প্রবন্ধ লিখিয়া আমি তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম। তাঁহার অব্যবহিত পরে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজগুণেই তিনি দেশ উজ্জ্বল করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আমার গৌরব এই যে, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা অর্জিত যশের আমি প্রথম প্রচারক হইতে পারিয়াছিলাম।

হায় শরৎ, তোমাকে হারাইয়া আমাদের সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন ও সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তুমি যে সুহৃৎগণের কত অন্তরঙ্গ ও প্রিয় ছিলে, তাহা অনেকেই জানেন না।

একদিন এক সভায় গিয়াছি, এমন সময়ে একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিলেন, 'শরৎচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন।' সেই সভায় কিছু বলিবার ভার ছিল আমার, কিন্তু বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যস্রষ্টার বিয়োগে যে ব্যথা অনুভব করিলাম, তাহাতে বলিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। সে সভা হইতে একটি আরও বৃহত্তর সভায় গেলাম। সেখানে কিন্তু কাহারও মুখ তেমন মলিন দেখিলাম না। সায়েন্স কলেজের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে জনসংঘের মধ্যে আমিই সকলকে বিষণ্ণ মুখে দুঃসংবাদ দিলাম। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই সংবাদ পাইলাম যে, এ সংবাদ ঠিক নহে। বড় ভরসা হইল, মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটিলে পরমায়ু বাড়ে শুনিয়াছি। সেই ভরসা লইয়া দ্রুত শুশ্রূষা-নিকেতনে গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে শরৎবাবুর জীবনের সম্বন্ধে আশা লইয়া আসিতে পারিলাম না।

এই ঘটনার দুই দিন পরেই আবার সংবাদ পাইলাম যে, শরৎচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। তাঁহার বালীগঞ্জের বাড়ির বারান্দায় তাঁহার মরণশান্ত মূর্তি শেষ দেখিয়া আসিলাম। অন্তিম শোভাযাত্রার সময়েও উপস্থিত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালী তাহার প্রিয়তম লেখকের জন্য যে অশ্রুবর্ষণ করিল, তাহাও দেখিলাম। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না। অনেক কবি, কোবিদ বা জননায়ক জীবিতকালে সম্মান লাভ করেন না। অনেক সময়ে মৃত্যুর পরে তাঁহারা সম্মানিত হন। কিন্তু শরৎচন্দ্র জীবদ্দশায় যে সমাদর, সম্মান, খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাঙ্গালী নর-নারীর হৃদয়াসনে তিনি রাজ-সম্মান পাইয়া গিয়াছেন। তরুণদিগের মনে

তিনি একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তরুণ, অ-তরুণ সকলেই তাঁহাকে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। অবশ্য প্রতিকূল সমালোচনা যে তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহা নহে। সাহিত্যে যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, যাঁহারা পুরাতনের পক্ষপাতী এবং আদর্শবাদী, তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে ভাল চোখে দেখিতেন না। নূতনের প্লাবনে সমাজতন্ত্র নিমজ্জমান বলিয়া যাঁহারা সন্ত্রস্ত হইতেন, তাঁহারাও যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেম, একথা সত্য। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যশ এই প্রতিকূল সমালোচনা বা আশঙ্কাপ্রণোদিত আচরণে ম্লান হয় নাই, একথাও সত্য।

শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে উদাসীনতা অবলম্বন করিলেও, কখন কখন ইহাতে যে একটু উন্মনা না হইতেন, তাহা বলা যায় না। একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা সংবর্ধনা করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল। তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার ভার আমার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল। আমি অবশ্য তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান অকুণ্ঠিতভাবেই দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, তখন শুধু প্রতিকূল সমালোচনার কথাই বলিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার লেখা কুরুচিদোষে দুষ্ট, এই কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু তাঁরা যা কুরুচিপূর্ণ মনে করেন, সকলেই যে তা মনে করবে, এমন না-ও হতে পারে। আবার এমনও কি হতে পারে না যে, আজ যা কারও কাছে শ্রুতিকটু মনে হচ্ছে, পরে তা আর শ্রুতিকটু থাকবে না?" এইরূপ ভাবের অনেক কথা তিনি সেদিন এবং আরও অনেক দিন বলিয়াছেন। আমার ইহাতে মনে হইয়াছে যে, আঘাতের বেদনা হইতে তিনি তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার মন সংসারের নিষ্পেষণে কঠিন হইয়া যায় নাই এবং তাঁহার জীবনের ঘটনা এবং তাঁহার আচরণ হইতে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় কোমল ছিল, পরদুঃখে

তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন এবং সামান্য আঘাত করিলেও সে ব্যথা তাঁহাকে সহজেই পীড়া দান করিত।

তাঁহার লেখা পড়িলে বুঝা যায় যে, তাঁহার অনুভূতি শুধু সূক্ষ্ম ছিল না, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিও ছিল অতি প্রখর। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনার পরিস্থিতি এমন স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে যে, মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন অসামান্য অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারী ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁহার শ্রমলব্ধ সাধনার ফল, বা তাঁহার ইনটুইশান, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ঘটনার পর ঘটনা, তাঁহার লেখনী সাজাইয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকটি যেন প্রত্যক্ষের বিষয়, যেন বায়োস্কোপের ছবি। এই অসামান্য শক্তি তিনি কিরূপে লাভ করিলেন? কেহ কেহ বলেন যে, শরৎচন্দ্র যৌবনে বহু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অক্লান্ত অধ্যবসায়সহকারে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। আমাদের নিকট সে সকল অবশ্য নেপথ্য ভাগে। আমরা তাঁহাকে পরিশ্রমশীল সাধক হিসাবে দেখি নাই—আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি বীণাপাণির বরের মতো, প্রতিভাত স্বতঃস্ফূর্ত উৎসের মতো।

তিনি সাহিত্যের আসরে যেদিন আসিলেন, সেইদিনই যেন সুর জমিয়া গেল। যাঁহারা সুরজ্ঞ, তাঁহারাই বলিলেন—সুর থাকিলেই হয় না, সুর লাগাইতে পারা বহু ভাগ্যের কথা। একবার যদি সুর লাগে, তাহা হইলে আনন্দের অফুরন্ত ঝর্নাধারা আপনা হইতে উথলিয়া উঠে। শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে এই কথাটি খাটে। শরৎচন্দ্র সু-বক্তা ছিলেন না, তাঁহার ব্যক্তিত্বও প্রথমে বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যে তিনি এমনই এক গ্রামে সুর ধরিলেন যে, অচিরে বাঙ্গালাদেশ মাতাইয়া তুলিলেন।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব শান্ত ধরনের ছিল। যাঁহারা সেই চুম্বকের সম্মুখে আসিতেন, কেবল তাঁহারাই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের পরম প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার

ব্যবহারে আড়ম্বরপূর্ণ সৌজন্যের বিকাশ ছিল না, কিন্তু তাঁহার এমন এক স্বভাবসুলভ মাধুর্য ছিল, যাহা অল্প পরিচয়েই সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঘুচাইয়া দিত।

তাঁহার স্বভাবজাত উদারতা সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমি গত বৎসর বিলাত হইতে যেদিন বোম্বাই-এ পৌঁছিলাম, সেইদিন আমায় এক বন্ধু আমাকে একখানি সংবাদপত্র দেখাইলেন; তাহাতে দেখিলাম যে, শরৎবাবু ঢাকায় এক সভায় আমাকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি অপ্রিয়ভাষণ করিয়াছেন। তিনি সে সভায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার 'মহেশ' গল্পটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক হইতে অকস্মাৎ বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহাতে হিন্দুয়ানির বিরোধী ঘটনা অর্থাৎ গো-হত্যা বর্ণিত হইয়াছে, আর সেই স্থলে একটি হিন্দুভাবাশ্রিত গল্প দেওয়া হইয়াছে। আমি ইহা পড়িয়া ভাবিলাম, হয়তো আমার কোনও হিতৈষী বন্ধু তাঁহাকে এই মূল্যবান তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সত্য প্রকাশিত হইলেই শরৎবাবু তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তাহার পরে কলিকাতায় এক সভায় আমাকে অভিনন্দিত করা হইল। শরৎচন্দ্র, জলধর সেন প্রভৃতি অনেকে সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"ছোট গল্প"। আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আমি প্রসঙ্গক্রমে 'মহেশের' কথা তুলিলাম, গল্পটির প্রশংসাই করিলাম। তখন শরৎচন্দ্র বলিলেন, "আমার ধারণা ছিল, 'মহেশের' সম্বন্ধে আপনার অভিমত অন্যরূপ।" তখন আমি বুঝাইয়া দিলাম যে, 'মহেশ' গল্পটি অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহার স্থলে বৃহত্তর গল্প 'রামের সুমতি' দেওয়া হইয়াছে। এরূপ পরিবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারেই এবং বোর্ডের নির্দেশক্রমেই হইয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর ইহা নির্ভর করে না। এই নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'কাবুলিওয়ালা' বাদ পড়িয়াছে। 'মহেশ' বাদ দিয়া আমার 'প্রেমের ঠাকুর' দেওয়া হইয়াছে, এ-কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

কেননা, উভয় গল্প প্রায় ছয়-সাত বর্ষকাল পাশাপাশি পাঠ্য-পুস্তকে স্থান পাইয়াছে ইত্যাদি।

এই সব শুনিবার পর শরৎবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে আমাকে অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছে। কিছু মনে করিবেন না।"

আমার মনে হইল, যে চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাই আবার স্মৃতিপটে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল এমন নির্দোষ সরলতায় পূর্ণ হইল যে, আমি বুঝিলাম, ঐ সকল উক্তির জন্য তাঁহার এতটুকু দায়িত্বও ছিল না। পরদিন সংবাদপত্রে ওই সভার বিবরণ-সূত্রে অনেকে ইহা দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাব স্বাভাবসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠা এই অনিচ্ছাকৃত বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কিরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হইল, তাহাই আজ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত স্মরণ করিতেছি।

তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তাও ছিল অসাধারণ। তিনি অল্প লোকের মধ্যে বসিয়া অল্প সময়মধ্যে এমন গল্প জমাইয়া তুলিতে পারিতেন যে, আমার আর একজন বন্ধুকে মনে পড়িত। তিনিও দুষ্ট ক্ষতরোগে অল্পবয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন—আমি কবি রজনীকান্ত সেনের কথা বলিতেছি। তাঁহার সঙ্গ করিবাব সুযোগ আমার হইয়াছিল। এমন সুরসিক, মজলিসী বন্ধু জীবনে অধিক দেখি নাই। শরৎচন্দ্র এবং রজনীকান্ত এই স্বচ্ছরসের স্রোত বহাইতে পারিতেন, ইহা তাঁহাদিগের পুলকোচ্ছল মনের উদারতার জন্য; যে উদারতায় সমস্ত জগৎসংসার, সমস্ত স্থাবরজঙ্গম—সকলই আনন্দের তাড়িতসঞ্চারে রহময় হাস্যময়, শোভাময় হইয়া ফুটিয়া উঠে।

শরৎচন্দ্রের মানবিকতা | রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

অসামান্য চিত্রশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্য-সমাজ একটি অশান্ত ও বিদ্রোহী আত্মা হারাইল। জীবনের বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বহু আবেগ, বহু অন্তঃপীড়ার সাক্ষী—এই শিল্পী হইয়াছিলেন বাংলার সমাজের অন্তর্নিহিত গূঢ় বেদনার প্রতিমূর্তি। এমন করিয়া কোনো সাহিত্যিক সমাজের নিয়ম ও বিধিনিষেধের নির্মমতা ফুটাইতে পারেন নাই যেমন ক্ষুব্ধ ও বিহ্বল হইয়া তিনি ফুটাইয়াছেন। মানবিকতার এমন বিপুল গভীর আদর্শ কেহই আঁকিতে পারেন নাই যাহা শত অন্যায় ও অধর্ম, পাপ ও দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ বঙ্কিম পথ দিয়া উজ্জ্বল দীপশলাকার মতো তাঁহার কল্পলোকের নর-নারীকে দিক্‌দর্শন করাইয়াছে।

অপূর্ব সাহস এই উপন্যাসশিল্পীর—যিনি পাপবিদ্ধ এবং অসুন্দরকে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অক্ষত মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, সমাজধর্মের উপর ন্যায়ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যে ন্যায়ের সম্মুখীন হইয়া প্রেমের মান-অভিমান বিরহ-মিলন নিতান্ত ক্ষুদ্র ও লঘুচঞ্চল হইয়া দেখা দেয়।

তাঁহার বিচিত্র গল্প-উপন্যাসে প্রেমের ব্যঞ্জন হইয়াছেন বহু বাধা-নিষেধ ও বিচ্ছেদের ঘাত-প্রতিঘাতে। পাশ্চাত্য গল্প-উপন্যাসে আমরা ক্ষুব্ধ ও তিরস্কৃত প্রেমের পরিণতির পরিচয় পাই। কিন্তু এই প্রাচ্য শিল্পীর নিকট আমরা প্রেম-নিরাশ নারীর যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়াছি তাহা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। নারীর অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে, তাহার অগৌরব ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে তিনি যে অটল ধৈর্য ও অসঙ্কোচ সততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উহার সমস্ত কলঙ্ক ও অধর্মকে শোধন করিয়া দিয়াছে।

গর্হিত ও অসুন্দরের অন্তরে সততার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এই মহাপ্রাণ শিল্পী অসুন্দরকে যে শ্রী ও সম্পদে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহা কল্প-সুন্দরীর চরণকমলে অম্লান আভা দান করিবে।

সমাজ অনেক সময় মানুষের শুধু যে ব্যর্থতার কারণ তাহা নহে, তাহার পাপেরও কারণ হয়। যাহারা উদ্‌ভ্রান্ত, যাহারা অসৎ পথে গিয়াছে, তাহারা তত দোষী নহে, যত দোষ সমাজ ও জীবনের ঘটনা বিপর্যয়ে যাহা তাহাদের ভ্রান্তি ও অপরাধ সহজ করিয়া দেয়। পাপকে বর্জন করা যদি মানুষের ও সমাজের অসাধ্য হয়, পাপকে সহ্য করিবার ক্ষমতা, ক্ষমা করিবার অধিকার মানুষকে অর্জন করিতে হইবে। বিপুল সাহস, গভীর অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ সমবেদনা না হইলে এই সত্য-দৃষ্টি মানুষের হয় না। উদারতম মানবিকতার পরিচায়ক শরৎচন্দ্রের এই অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যে চির-অমরত্ব ও বিশ্বসাহিত্যে পরম গৌরবপদ দান করিবে, সন্দেহ নাই

কত যুগ যাইবে, কত পাঠক বাংলায় ব বিদেশে তাহার গল্প-উপন্যাসে মুগ্ধ ও আনন্দিত হইবে। বহু যুগ পরেও তাঁহার সাহিত্য প্রত্যেকের চক্ষের জলে আরও একটু অনাবিলতা প্রদান করিবে, প্রত্যেকের নিষ্ফলতার মধ্যে আরও একটু ধৈর্য, প্রত্যেক বিদ্রোহের মধ্যে আরও একটু কোমলতা ও ক্ষমা আনিয়া দিবে সমাজ নাই, ন্যায়-অন্যায় নাই 'সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই'—বাঙালী জাতির বহু বাধাবিঘ্নলব্ধ এই বিপুল অভিজ্ঞতা যাহা তাঁহার সাহিত্যে অপরূপ লিখনভঙ্গী ও অসামান্য সহানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছিল, তাহা যেন যুগে যুগে বাঙালীর লোকাচারের উপর, সমাজধর্মের উপর, ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে। শিল্পী সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গলময় রূপে দেখেন; কিন্তু যখন তিনি অসুন্দরকে সত্যের অপূর্ব গৌরব-আলোকে উদ্ভাসিত করেন, তখন তিনি শুধু শিল্পী হন না, তিনি সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি ধারণ করিয়া, ব্যক্তির পাপের গরল পান করিয়া হন বিশ্বের প্রেমের ভিখারী।

এই প্রেমে কিরণময়ীর দুর্নিবারতা অপেক্ষা জাগে বেশী সাবিত্রীর ধৈর্য, উহা পার্বতীর রাজপ্রাসাদের সদাব্রত অপেক্ষা অন্নদার গৌরবহীন সাপুড়িয়া-কুটীরে নীরব সেবাপরায়ণতায় অটল প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেম পুরুষকে মর্মন্তুদ পীড়া দেয়, বিদ্রোহী করে—যেমন উহা শ্রীকান্তকে ভবঘুরে, দেবদাসকে উচ্ছৃঙ্খল ও সুরেশকে উন্মত্ত করে। কিন্তু উহা নারীকে শত ব্যর্থতা, নির্যাতন ও বেদনার মধ্য দিয়া শ্রেষ্ঠ গৌরব দেয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীই প্রেমের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে, সে সফলতা যেমন অতি করুণ তেমনি অতি গরীয়ান।

এই প্রেম শুধু যে সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করে তাহা নহে, জাতি ও সমাজকে নবকলেবর দান করে।

'সব্যসাচী' মুরলীধর বসু

'পথের দাবী' যখন প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখন শুনিয়াছিলাম এখানি একখানি 'পলিটিকেল নভেল' হইবে, হয়তো হইয়াছেও তাই। কিন্তু সে-কথা আজ থাক।

পথের দাবীর বিচিত্র জটিল চরিত্রসৃষ্টির কথাও এখানে তুলিব না। সব্যসাচীর চরিত্রের পরিকল্পনায় লেখকের কৃতিত্ব অধিক অথবা আটপৌরে অপূর্বর চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার রূপদক্ষতার পরিচয় বেশি, সে অযথা তর্কের নিষ্ফল বিচারও এখানে শুরু করিব না।

আজ স্মরণ করিব কেবল সব্যসাচীর জীবনকে চিনিবার, মানুষকে বুঝিবার গভীর সহজ পরমাশ্চর্য দৃষ্টিটিকে। আজ অনুভব করিব ভারতবর্ষকে লইয়া তাঁহার অন্তরের অফুরন্ত বেদনা ও অনির্বাণ দাহের অন্তরালে ভারতী ও অপূর্বকে লইয়া তাঁহার গোপন প্রশান্ত আনন্দটিকে। ধরিত্রীর বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের এই অবিরাম অক্লান্ত অপচয়ের মধ্যেও মানুষ মানুষকে ভালবাসে—সেই ভালবাসার প্রস্ফুটিত রূপ আজিও দেশে দেশে অনাঘ্রাত, অনাদৃত, নির্যাতিত হইলেও—চেনা সহজ।

কিন্তু যাহা আজিও ফুটিয়া উঠে নাই, অথচ ফুটিবার অপেক্ষায়, অজানিতে সংগোপনে দিনে দিনে আকুল হইয়া উঠিতেছে, আগে হইতে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা অন্তরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সানন্দে বরণ করিয়া লইবার সাধনা সব্যসাচীর কোথায়, কবে, কেমন করিয়া শেষ হইল তাহাই ভাবি।

অন্তরে যে সত্যের অস্তিত্ব মানুষ নিজেই জানে না, অথবা জানিলেও প্রবলভাবে অস্বীকার করিতে চায়, তাহাকেই সুদূরের জ্যোতির্ময় সম্ভাবনা হইতে চিনিয়া চিনাইবার প্রয়াস বারে বারে সব্যসাচী কেমন করিয়া করেন তাহাই ভাবি।

শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন 'অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন, তাতে আমার ভাবনার কারণ নেই এইজন্য যে, কাব্যরচনায় আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা অতি বড় নিন্দুকেও অস্বীকার করতে পারবে না।'

গল্পরচনায় শরৎচন্দ্রের শক্তি তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথকে যদি ব্যালজাক; গ্যতিয়ে বা প্রস্পার মেরিমের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে শরৎচন্দ্রকে নির্বিবাদে, মোপাসাঁ বা শেহভের সমকক্ষ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নৈরাশ্য বা বিষাদ জীবনের প্রতি অভিযোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবি, রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন, তার ধূসর গৈরিক গাত্রাবাস লক্ষিত হয়নি। শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক, স্বীয় জীবনে পৃথিবীর রূঢ় নির্মমতা ও কুৎসিত কুশ্রীতা তাঁর অন্তরকে পীড়িত করেছে, তাই শরৎ-সাহিত্য বাস্তবের নিখুঁত ছবি। রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় গল্পে উপন্যাসে নয়—কাব্যে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভার একমাত্র পরিচয় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সংস্কারমুক্ত বিবেচক রক্ষণশীল হিন্দু। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তিনি আস্থাবান, কিন্তু অন্যায় লোকাচার বা দেশাচার নির্বিরোধে গ্রহণ করাকে তিনি কোনোদিন ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করেননি। সাহিত্য-জীবনের সূচনায় যথেষ্ট অবহেলা ও অপবাদ তিনি সহ্য করেছেন, কিন্তু যা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন তাকে ত্যাগ করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য—এই জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও অনুকরণীয় চরিত্রচিত্রণ শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি,

গহর, জীবানন্দ, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্বতী, কিরণময়ী, দেবদাস, বিজয়া প্রভৃতি চরিত্রাবলী কল্পিত কাহিনীর ঘটনাবলীর পারম্পর্যরক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয়নি, জীবন্ত এই চরিত্রগুলি এমনভাবে আর কোনও সাহিত্য-সাধকের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেনি। সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে- অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত নরনারীর ব্যথা ও বেদনা শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙালীর সংসারের চিরন্তন মূর্তি তাঁর অন্তরে প্রতিফলিত। স্বপ্ন নয় ভাববিলাস নয় —সহানুভূতি সমবেদনার মাধুর্যে শরৎ-সাহিত্য পরিপূর্ণ।

প্রচলিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে শরৎ-সাহিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আধুনিক সমাজবিপ্লবের মূলেও শরৎ-সাহিত্যের নির্ভীকতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে Times বলেছেন— 'When all is said, it is rather by intellectual effort than by political agitation that Indians will win for themselves the place they claim in the great society of nations.' যে কোনো দেশের সাহিত্য বিষয়ে এই জাতীয় মন্তব্যের মূল্য অপরিসীম। গতানুগতিকভাবে ধর্মের জয়, অধর্মের পতন প্রচারে শরৎ-সাহিত্য সৃষ্ট হয়নি। তাঁর জীবনে আমাদের জাতি ও সাহিত্যের জন্য যে পরিমাণ শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছেন উত্তরকালের সাহিত্যসাধকদের কাছে তাই পরম পাথেয়। জীবন-সায়াহ্নে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি দেশের অপরকে স্পর্শ করেছে। যে আদর্শবাদের প্রেরণায় স্বতোৎসারিত গতিতে শরৎ-সাহিত্য বাঙালীর চিত্ত জয় করেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য অপরিমেয়।...

আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সব কথা ছোট প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব। অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান দুটি : প্রথমতঃ, তাঁর প্রতিভাস্ফুরণের কাল এবং আমার পরিণতির একটি অধ্যায়ের সময় এক। আমার সাধনা এখনও চলছে, অথচ শরৎচন্দ্রের সাধনা সর্বাঙ্গীণ হয়ে আজ ফুরাল। আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর প্রভাব কিভাবে সম্পাত হবে এখন কি করে বুঝব ? দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রতিভার ক্ষেত্র বাংলা-সমাজের দুটি শ্রেণীতে বিস্তৃত এবং সেই শ্রেণীদ্বয়ের ভবিষ্যৎ রূপ ও গঠনের সাহায্যেই তাঁর দানের মূল্য যাচাই হবে। আমাদের সমাজ এখনও প্রধানতঃ নিম্ন-বিত্তশালীর সমাজ—এই গঠন যদি আরো কিছুকাল থাকে কিংবা অমর হয় তবে শরৎচন্দ্র অমর হবেন। আর যদি বদলায়, তবে দ্বীপ-সৃষ্টিতে প্রবালের মতনই তাঁর কীর্তি আত্মবলির সমতুল্য হলেও হবে কেবল ব্যবহারিক। সেই দিক থেকে শরৎ-সাহিত্য কথাটি নিরর্থক, তখন 'সাহিত্যে শরৎচন্দ্র' হবে প্রবন্ধের বিষয়। অতএব শরৎচন্দ্রের সমালোচনার অর্থ আমারই আত্মবিশ্লেষণ, সমাজ-শক্তির বিকলন, তার ভবিষ্যৎ নিরূপণ এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার। অনেক সুপণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ দুটি কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। প্রথমটি অশোভন। তাই আমি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক আলোচনা করব না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় বিশ বৎসরের ; তাঁর প্রায় সব লেখাই পড়েছি এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব ও তর্ক করেছি। আমি যেভাবে তাঁকে বুঝেছি তাই লিখছি। মুখে তিনি অনেক সময় অনেক বিপরীত কথা বলতেন—সে-সব বাদ দিলাম।

তিনি পার্‌সন্যালিটিতে বিশ্বাস করতেন। ব্যক্তি-সম্পর্ক-রহিত

আর্টের স্বকীয়তায় বিশ্বাস তিনি করতেন না। এই কারণে তিনি ছিলেন হ্যুম্যানিস্ট। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব মানতে গেলে অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাস করার শক্তি থাকে না। ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস সর্বগ্রাসী। তাঁর ধারণা ছিল মানুষ ফুটতে পায় না সমাজের চাপে। সেইজন্য তিনি সমাজকে তীব্রভাবে কষাঘাত করে গেছেন। কোনো ভণ্ডামি তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কারণ তাঁর মত ছিল এই যে, ভণ্ডামির অন্তরালে অত্যাচারই লুকিয়ে থাকে। এই জন্যই তাঁর irony অত কার্যকরী।

মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, তাই হ্যুম্যানিস্টের ধর্ম অনুসারে ঐ সম্বন্ধের রূপ ছিল আততায়ীর। সমগ্র প্রাণ দিয়ে তিনি যুদ্ধ যখন করতেন তখন প্রগতিশীল পাঠক-পাঠিকার ভালো লাগত, যখন—যেমন বিপ্রদাসে, সামাজিক ঐতিহ্যের সমর্থন করতেন, কিংবা তাকে মানুষের চেয়ে বড় করে দেখাতেন তখন অনেকের খারাপ লেগেছে।

ভাবের ওপর অভিজ্ঞতার সাহায্যে, হৃদয়ের আনুকূল্যে যে সিদ্ধান্ত রচনার বিষয়বস্তু হয় সেটি একাদেশদর্শী হতে বাধ্য। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানুষ সমাজের সম্বন্ধের যে প্রকৃতি বেরিয়ে আসে সেটি আর্টিস্টের হাতে পড়লে অন্য রূপ নেয়। আর্টিস্ট না হলেও তার দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎ রূপ ও তার পরিবেশে ভবিষ্য-সমাজের মানুষের ছায়া মনের ওপর পড়তে পারে। শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল না। তাই আর তাঁর হ্যুম্যানিজম্‌কে বাঙালীর বিশেষত্ব বলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ গরিমা অনুভব করেছি। শরৎচন্দ্রের চোখ ছিল বুকে। এই প্রকার ইন্দ্রিয়গত স্থানচ্যুতিতে তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও দৃষ্টির ক্ষেত্র অপ্রসারিত হয়।

স্ত্রীজাতি ছিল তাঁর কাছে নির্যাতিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ প্রতীক। মেয়েমানুষকে তিনি মেয়ে হিসেবে দেখেননি, মানুষ ভাবেই দেখেছেন। আরো দুটি প্রতীক তাঁর ছিল—উচ্ছৃঙ্খল মানুষ ও জীবজন্তু। প্রতীক

হল নির্বিশেষ, তাই চরিত্রের পার্থক্য পাঠকের চোখে সব সময় ফোটেনি।

মনুষ্যত্বে আস্থাবান ছিলেন বলেই তিনি ছিলেন তেজী। কারুর কাছে হাত পাততে তাঁর মাথা কাটা যেত। এইটাই তাঁর স্বদেশপ্রেমের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের অত বড় ভক্ত জীবনে দেখিনি, কিন্তু তাঁকেই শরৎচন্দ্র প্রথম প্রথম বই উপহার দিতে ইতস্ততঃ করতেন পাছে কবি কেবল ভদ্রতার খাতিরে বই-এর সুখ্যাতি করেন। এটা দম্ভও নয়, ঈর্ষাও নয়—নিছক মনুষ্যত্ব।

আর একটি মাত্র কথা লিখব। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু তাঁর সহ্য করবার শক্তি ছিল অসীম। মুখের ওপর তাঁকে কত রূঢ় কথা বলেছি, হেসে বলেছেন—'বড্ড গালাগালি দিচ্ছ তুমি, অতটা আমার প্রাপ্য নয়।' একবার মূর্খের মতো বলেছিলাম, 'আপনি যুবকদের betray করেছেন।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেছিলেন, 'করিনি। যদিও করে থাকি—জানি না, ইচ্ছা করে নয়।' আমি ক্ষমা চাইতে পারিনি তখন, আজ চাইছি, সর্বান্তঃকরণে চাইছি।

মজঃফরপুর শহরে তখন প্লেগের প্রবল দৌরাত্ম্য শুরু হয়েচে। শহর ছেড়ে আমাদের শহরতলীতে আশ্রয় নিতে হ'ল। যেস্থানে আমরা আশ্রয় নিলাম -আম আর লিচুর বাগান। একদিন সেখানে দাঁড়িয়ে দাদামশায় বললেন, শরৎবাবুর নাম শুনেছিস ?

বললাম, কে শরংবাবু ?

দাদামশায় বললেন, লেখক শরৎবাবু। আলমারিতে যাঁর বই রয়েচে —'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ' এই সব। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত বইগুলি পড়ে দেখবার সুযোগ তখনও আমার হয়নি। সুতরাং বললাম, না, আমি তাঁর নাম শুনিনি। হঠাৎ তাঁর কথা কেন ?

দাদামশায় বললেন, মনে পড়ে গেল। তিনি এইখানে থাকতেন কিনা।

এইখানে, এই জঙ্গলে ?

জঙ্গল কেন রে, তখন এখানে এক মস্ত জমিদারের বাড়ি ছিল, হিন্দুস্থানী জমিদার। শরৎবাবু অনেকদিন তাঁর কাছে ছিলেন। পরীক্ষা দিতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে এইখানে ছিলেন। দু'দিনেই জমিদারের প্রাণের বন্ধু হলেন, তাঁকে নইলে জমিদারের গানবাজনার আসর কিছুতেই জমতো না। তিনি খুব ভালো গান গাইতেন, তবলার হাতও ছিলো চমৎকার ··

তুমি কি করে জানলে ?

আমাদের বাড়িতে কতবার এসেছিলেন, তোর বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাতও সেই থেকে। তোর বাবা তখনই বলতো, 'শরৎ-দা মস্ত বড় লেখক হবেন।' আমরা তখন বিশ্বাস করিনি।

কিছুকাল পরে দেশে ফিরে এলাম। একদিন হঠাৎ আলমারির

ডাকের ভিতরে খুঁজে পেলাম অপরিচিত হাতের লেখা খানকয়েক চিঠি। ছোট ছোট অক্ষরগুলি কী পরিচ্ছন্নভাবে লেখা! পাতা উল্টে দেখলাম, চিঠিগুলি রেঙ্গুন থেকে শরৎবাবু লিখেচেন বাবাকে [৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়)]। চিঠিগুলি অসাবধানতা-বশতঃ আমি হারিয়ে ফেলেচি, নইলে সেগুলি থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের অনেক কথাই আজ সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে পারতাম। ছেলেবয়সে সেই চিঠিগুলি আমি বারংবার মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঠ করেছিলাম। তা থেকে শুধু এইটুকু মনে করতে পারি যে, 'চরিত্রহীন' যখন প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন কেউ গ্রন্থে কয়েকটি ছবি সন্নিবিষ্ট করবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাতে সম্মত হননি। 'বিন্দুর ছেলে' যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন প্রথম প্রথম তাতে গ্রন্থকারের ফটো' থাকতো; কিছু পরে শরৎচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেশ থেকে কলকাতায় এলাম। তখন স্কুলের লেখাপড়ার পালা প্রায় শেষ ক'রে এনেচি। দাদামশায় সঙ্গে করে আমায় নিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে, তাঁর শিবপুরের বাড়িতে। সেই প্রথম দেখলাম তাঁকে। ছবিতে তাঁর মুখে গোঁফ দাড়ি ছিলো— কিন্তু আসল মানুষটির মুখে তার পরিচয় পাওয়া গেল না। তবু কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই বুঝতে পারলাম, আমি কল্পনার শ্রীকান্তকে যেমন করে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে এঁর কোথাও অমিল নেই। এই লোকটিই শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীর নায়ক। কিশোর-মনে কি করে যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, আজও আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি।

তারপর বড় হয়ে শুনলাম, সত্যিই 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। তার কতখানি সত্য আর কতখানি কল্পনা—তা আমার জানা নেই; কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, একমাত্র 'শ্রীকান্ত' রচনা করেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হতে পারতেন। অথচ এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার পূর্বে শরৎচন্দ্রের

মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল যে, পাঠক-সাধারণ হয়তো এ গল্প পড়ে খুশী হবে না।

বড় হয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কয়েকবার মাত্র দেখা হয়েছে। তার মধ্যে বছর-দুই-তিন পূর্বের একটি দিনের কথা বিশেষ করে বলবাব। তখন Communal award নিয়ে কংগ্রেসী মহলে ভাঙন ধরেচে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠন করেছেন, য়্যানে প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সেই দলে যোগ দিয়েছেন।

শবৎচন্দ্র বললেন, পণ্ডিত মালবা এতদিনে মস্ত বড় ভুল করলেন।

কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

শবৎচন্দ্র বললেন, কংগ্রেস যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাব ব্যাপারে ভুল করেই থাকে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কি সে ভুল সংশোধনেব চেষ্টা কবা চলতে না? মালব্যজী যে পথ বেছে নিলেন তাতে যে কংগ্রেসকেই দুর্বল কবা হবে। অথচ কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে Communal award রদবদলেব চেষ্টা কি কোনোদিন সার্থক হবে ভাবো?

আমি তখন সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উৎফুল্ল হয়ে বললাম, আপনাব এই অভিমত সর্বসাধারণকে জানাতে পারি?

শরৎচন্দ্র বললেন, লিখে বিষয়টা আমাকে দেখিও।

পরদিন বিষয়টা সাজিয়েগুজিয়ে লিখে নিয়ে গেলাম। তিনি আদ্যন্ত পড়ে বললেন, কিছুই হয়নি। মোটেই লিখতে পারোনি হে।

জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখেব দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন, মালব্যজীকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—সেই কথাটাই কোথাও পরিস্ফুট হয়নি। দেখো, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের সমালোচনা করি ক্ষতি নেই, কিন্তু যে কথাটা বলবো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা চাই। তোমাদের সাংবাদিকদের এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। ওটা দাও, আমি নিজেই আগাগোড়া লিখে দেব।

তাঁর সেই রচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং এখানে তা সবিস্তারে উল্লেখ করবার প্রলোভন সংবরণ করলাম।

এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে তখন কয়েকবার শরৎচন্দ্রের বাড়িতে যেতে হয়েছিল প্রত্যহ বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়েচি। শরৎচন্দ্র যখন গল্প বলেন, তখন তাঁর মুখের কথাতেই তাঁর অশান্ত জীবনের ছবি একেবারে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তিনি কেবল গল্প লিখতেন না, গল্প করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সভায় তাঁকে মানাতো না, কিন্তু গল্পের বৈঠকে তিনি ছিলেন যাদুকর গল্পী। দৈনিক দেখতাম, গল্প বলতে-বলতেও তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলতেন। গল্প বলতে-বলতে হঠাৎ আরাম-কেদার ছেড়ে উঠে অকারণ ঘরময় ঘুরে বেড়াতেন। তারপর হঠাৎ আবার চেয়ার দখল করে, হয়তে বা চোখের চশমাখানা খুলে রেখে, আর এক জোড়া চশমা চোখে লাগিয়ে প্রশ্ন করতেন: - হ্যাঁ. গল্পটা কোথায় ছেড়েছিলাম বলো তো…?

মাসিক পত্রিকায় তিনি সর্বশেষ যে উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেছিলেন তাও শেষ হয়নি। শেষ প্রশ্নের' পর 'শেষের পরিচয়' আমরা পেলাম না। ইদানীং যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেচেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন. তাঁর শরীর যতই অশক্ত হয়ে পড়েছিল, মনে মনে তিনি যেন ততখানি অস্থিরতা বোধ করছিলেন। মনের সঙ্গে তাঁর দেহের এই সংগ্রামের আভাস আমি কতদিন তাঁর মুখে স্পষ্ট অনুভব করেচি। কখনও মনে হয়েছে, এই আধুনিক ও নাগরিক জীবনযাত্রা যেন শরৎচন্দ্রের জন্য নয়: এখানে তিনি নিজেকে উৎপীড়িত ও ক্ষুণ্ণ মনে করেন। তাঁর সত্যিকার স্থান রূপনারায়ণের তীরে, প্রকৃতির নিকটতম এবং অকৃত্রিম পরিবেষ্টনের মধ্যে। কারণ দৈহিক অশক্তির সঙ্গে তাঁর মানসিক বার্ধক্য দেখা দেয়নি। রূপনারায়ণের তীরে তিনি হয়তো তাঁর বিস্মৃত শৈশব খুঁজে পেতেন, কিশোর বয়সের সেই সব দৌরাত্মের কাহিনী হয়তো ক্ষণকালের জন্যেও তাঁর দেহকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তুলতো।

মধ্যে মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে বসে

থাকতেন। কি ভাবতেন তিনি—মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করতাম। মনে পড়ে যেতো Disraeli-র কথা। ভাগ্যের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে Disraeli ও শরৎচন্দ্রের মতো জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর শেষ বয়সের কথা বলতে গিয়ে আঁদ্রে মরোয়া বলেছেন :

One passion survived in this beaten body and that was the taste for the fantastic. When he was alone forced by his suffering into silence and immobility, unable even to read, he would reflect with an artist's pleasure on his marvellous adventures Was there any tale of the thousand and one nights, any story of a cobbler made sultan, that could match the picturesqueness of his own life ?

চিন্তামগ্ন দুর্বলদেহ শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে আমারও মনে হতো ঠিক এই কথাই। জীবনের অজ্ঞাতক্ষেত্র থেকে বাংলা সাহিত্যে যাঁর আকস্মিক অভ্যুত্থানের কাহিনীরূপকথার মতো বিস্ময়কর, যাঁর অতীত জীবন সমাজের বিরুদ্ধে, লোকাচারের বিরুদ্ধে বিরাট একটা বিদ্রোহ, এক কথায় যাঁর জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকাণ্ড adventure, তাঁকে শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যে কতদূর কষ্টকর সেকথা যাঁরা ইদানিং তাঁকে না দেখেছেন, তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ঠিক এমনি অবস্থায় Disraeli বলেছিলেন :

I am certain there is no greater misfortune than to have a heart which will never grow old.

শরৎচন্দ্র এমন কথা কোনোদিন কারও কাছে বলেছেন কি না জানি না, কিন্তু জীর্ণ দেহ নিয়েও তাঁকেও নিত্য-নবায়মান মনঃশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শরৎচন্দ্র যেদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সেদিন তাঁর সম্বন্ধে

কত সন্দেহ, কত সংশয়, কত তীব্র বিষোদ্গীরণ। তাঁর অতীত জীবন-যাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে তাঁর কাছে পত্র লিখতেও লোকে কুণ্ঠবোধ করেনি। এমন কি, একবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে কোনো এক ব্যক্তি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে খবরের কাগজে মামলার বিবরণ পাঠ করে কেউ কেউ বলেছিল, 'এই সেই নভেল-লিখিয়ে শরৎচন্দ্র'—এ গল্প আমি তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেচি। কিন্তু তবু তাঁর জয়যাত্রার গতি কোনোদিন রুদ্ধ হয়নি। বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর স্থান কোথায় সে বিচারের ভার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকের, কিন্তু বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরকালের। তাঁর পার্বতী আর দেবদাস, চন্দ্রমুখী আর বিজলী, সতীশ আর সাবিত্রী, রমা, রমেশ আর জ্যেঠাইমাকে বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েদের চিরকাল সমান দুঃখ আর আনন্দ দেবে। আদিগঙ্গার কূলে তার জন্য যদি কোনোদিন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত না হয় তবু তিনি একালের ছেলে আর একালের মেয়েদের মনে বেঁচে থাকবেন।

আমি আগেই বলেছি যে, ইংলণ্ডের অমর রাজনীতিক ও ঔপন্যাসিক ডিজরেলির জীবনের সঙ্গে আমি বাঙ্গলার এই কথাকুশলী সাহিত্যিকের জীবনে আশ্চর্য একটি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি। জীবনের শেষ মুহূর্তেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একদা যাঁকে পথের বহু বাধা অপসারিত করে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করতে হয়েছিল, তাঁর কুশল-সংবাদ জানবার জন্য দিনের পর দিন অসংখ্য নরনারী নার্সিং হোমের বাইরে অপেক্ষা করেচে। ডিজরেলির কুশল-সংবাদ জানবার জন্যও ঠিক এমনিভাবে নরনারী তাঁর বাসভবনের বাইরে প্রতীক্ষা করে থাকতো। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ডিজরেলি হঠাৎ মাথা খাড়া করে বিছানায় উঠে বসেছিলেন; যারা তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল তারা ভেবেছিলো, কমন্সসভায় ডিজরেলি যেন বক্তৃতা করতে উঠচেন। কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর বাক্যস্ফুরণ হয়নি। তার পরেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কি কথা তাঁর বলবার ছিল তা আর জানা যায়নি। শরৎচন্দ্রও

অন্তিম মুহূর্তে চীৎকার করে উঠেছিলেন—"আরও দাও, আমায় আরও দাও।"

কি চেয়েছিলেন তিনি? খ্যাতি না শান্তি?

এর উত্তর দিতে পারেন শুধু মহাকাল।

ডিজরেলির মৃত্যুর পর যখন রাশি রাশি পুষ্পস্তবক তাঁর মৃত্যুশয্যা অলঙ্কৃত করেছিলো, তখন তাঁর বিরোধীদল তা দেখে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছিলো। কিন্তু ঘরোয়া তাতে বিচলিত না হয়ে লিখেছেন:

No, Disraeli was very far from being a saint. But perhaps as some old spirit of spring, ever vanquished and ever alive and as a symbol of what can be accomplished in a cold and hostile universe, by a long youthfulness of heart.

বাঙ্গলার এই সাহিত্য-নায়কের সম্বন্ধেও একথা বোধ করি অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে।

শরৎ-চন্দ্র একদিন বলেছিলেন—"লেখায় উচ্ছ্বাস যত বাদ দিতে পারেন ততই ভালো।" আজ লেখার ভালো-মন্দের কথা নাই।—ভাবছি আমাদের এই দুর্দিনের কথাটা জেনেই কি ওই উপদেশটা তিনি দিয়েছিলেন।

তাঁর কোন দিনের কোন কথাটা লিখবো? তাঁর লক্ষাধিক ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই যা না-জানাই সম্ভব, সেইরূপ দু'একটি কথারই উল্লেখ করি।

তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তাঁর লেখার মধ্যে বোধহয় কোথাও তিনি ভগবান বা দেবতার উপর নির্ভর করে উত্তীর্ণ হবার চেষ্ট পাননি, সহজ-যুক্তির সাহায্যই নিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমাব প্রথম সাক্ষাৎ। কথা প্রসঙ্গে বললেন—"মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন?"

বললুম—"সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অলাভ নেই তো। তবে ঝঞ্ঝাট থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আস। ওই সঙ্গে দেশের লোকেও যে কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়—তাও নয়"

"এইটে ঠিক বলেছেন", বলে হাসলেন শরৎচন্দ্র।

তখন আমরা দশাশ্বমেধের কালীবাড়ির সামনে এসে পড়েছি।

আমি 'মা'কে প্রণাম করলুম।—দেখি তিনি তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন—"আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধহয়?"

বললুম—"অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্যে দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে—আপনি পরম আস্তিক।"

"কে বললে, কোথায় ?—ভুল কথা"…

"যা নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই সেই 'চরিত্রহীনে'ই রয়েছে—দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিলো। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারেনি। ফেরবার পরে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রু ক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ি ফিরতে পারেনি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন বিশেষ ক্ষতিও হ'ত না। আপনি পারেননি।"…

"ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবাস্তরের সাহায্য নিতে হয়। ঐ একটাই তো"…

"বহুত আছে। জগতে অবাস্তরও বহুত আছে। মন প্রিপট' ধরেই চলে। ওই বই থেকেই বলি ;-- আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি "ইনটেলেকচুয়েল জায়েন্টস্" বানিয়েছেন, আবার সুরমাকে (পশুটিকে) ছিঁচুর ঘরের একটি সরলবিশ্বাসী প্রতিমা গড়েছেন। যা'র সামনে কিরণময়ী স্তব্ধ নিষ্প্রভ হয়েই ফিরেছিল। এটা করলেন কেন ?"

"আমার লেখা এমন করে কেউ দেখে বলে জানতুম না. তাহলে সাবধান হতুম"·

"অনেকেই দেখেন, যাঁর ভালো লাগে তিনিই দেখেন। দেখুন, নাস্তিকেরা অতি সাবধানী, তাঁরা মাথার সাহায্যে লেখেন বলেই মনে হয়! সুরমাতে মাধুর্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।"

"যান যান, বেলা হয়েছে, নমস্কার।—দেখতে যেন পাই।"

দ্রুত চলে গেলেন।

তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হতে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে ফেরেননি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি, আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরি নয়ন সিক্ত হয়েছিলো। অতি বড় নাস্তিককেও সে দৃশ্য দেখলে আস্তিক্য পান। বড়কে বাদ দিয়ে কেউ বড় হতে পারেন না।

১

তাঁর আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলেছি। এইবার তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলি।

অন্তরে অন্তরে তাঁর ছিল উদাস প্রকৃতি—সংসার-নির্লিপ্ত। একমাত্র সাহিত্যই তাঁকে দশের মধ্যে টেনে রেখেছিলো। তার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য আর কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। কতবারই বলেছেন—"আমি যা লিখি তা যথেষ্ট খেটেই লিখি, অন্তর দিয়েই লিখি তার চেয়ে ভালো লিখতে আমি চেষ্টা করেও পারি না।"

এই সাহিত্যই ছিলো উদাসীর প্রেমের অবলম্বন। তাই তাঁকে আমরা পেয়েছিলুম। অর্থ, ঐশ্বর্য, অট্টালিকা তাঁর মোহের বস্তু ছিলো না—কাম্যও ছিলো না। তারা নিজেরাই এসে উদাসীকে ঘিরেছিলো।

জীবনের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য বহুদিনের। তাঁর লেখা পত্র থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করি—

৯ই এপ্রিল, ১৯২৪, বাজেশিবপুর

কেদারবাবু—আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করেন, সেকথা একদিনের জন্যও ভুলিনে।

(খবরের) কাগজে (অসুখের) খবর পেয়ে আমার দীর্ঘজীবনের কামনা করেছেন, এর ভিতরের বস্তুটি কি ভুল করবার!

কিন্তু দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা কেন? আপনাকে সত্যি-সত্যিই বলছি—কাল যদি এর ফেরবার ডাকা পড়ে, বলিনে যে বাপু পরশু এসো- একটা দিন পরে যাবো!

অনেক দিন তো বাঁচলাম! *** আমি শান্ত হয়ে গেছি কেদারবাবু; এ ছাড়া আর বিশেষ কোনো রোগ-বালাই নেই। কেবলি আমাকে খাটাতে চায়।

বাজেশিবপুর ১৪-১০-২৪

*** "বৎসরও আসবে বিজয়াও আসবে, একদিন কিন্তু আপনিও থাকবেন না—আমিও না। আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন—সেদিন যেন আমার বেশি দূরে না থাকে। আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ দুঃখ, একবার হাসি একবার কান্না—নিতান্তই আমার পুরনো হয়ে গেছে। আটচল্লিশ বছর বয়স হ'ল—ঢের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে—এর পর কি আছে পেতে। নিরর্থক কতকগুলো বিলম্ব হবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করিনে।"**

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোস্ট, ৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩।

*** 'সেদিন দিলীপকুমার রায়কে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন শরৎ শুনেছি নিজে***নিঃসঙ্গ বন্দী-ব্রত গ্রহণ করে বসে আছেন''*** 'কেদারবাবু, বন্দী-ব্রতই নিয়েছি। শহরেই থাকি বা পাড়াগাঁয়েই বাস করি, আমি সংসারের জোয়ার-ভাঁটায়—উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি। দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে। মনে আছে হয়তো আপনার - ৫১ বৎসরে যাবার দিন কোষ্ঠিতে ধার্য করা আছে আর বড় তার বিলম্ব নাই- বছর দেড়েক। জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন ''***

আরো আছে থাক, আর নয়। লিখেও সুখ নাই, পাঠেও কারো আনন্দ নাই।

লিখেছিলেন—"আমার বড় ইচ্ছে, এর পর কি আছে পেতে।" তা তুমি নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমরা চাই—অনেক অশান্তকে শান্তি দিয়েছ, বহু তাপিতকে আনন্দ দিয়েছ, তোমার আত্মা শান্তি পাক, আনন্দে থাকুক। ক্লান্ত—বিশ্রাম কর।

শরৎচন্দ্র তাঁর ভালবাসা ও দরদের দিকটা তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর সাহায্যে নির্ভীকভাবে তাঁর প্রত্যেক পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শান্তিজলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু লিখে তার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নেই, বাংলার ঘরে ঘরে তা পৌঁছে গেছে।

আমি নিজের একটা কথা বলছি—যা অন্যত্র পূর্বেও বলেছি, এখন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"পূর্ণিয়া থেকে, এখানকার যা নামী ও দামী জিনিস—ম্যালেরিয়া সেটি সংগ্রহ করি। পুরো পাঁচ মাস তার উৎপাত সয়ে, পূজার পর কাশী চলে গেলুম! দেখি তিনিও সঙ্গে এসেছেন—কাশীবাস করতে চান - আমাকেই অবলম্বন করে!***

'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্তীর বাসায় উঠেছি। জ্বর ভোগ করি, ছুটি পেলেই 'কোষ্ঠির ফলাফল' লিখি। সেইটাই ছিল আমার দুঃসময়ের অবলম্বন।***

শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রকে বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে বিদায় চেয়ে লিখলুম—"এইবার সত্যের সন্নিকটে হয়েছি" ইত্যাদি। তিনি লিখলেন এত সত্বর ঈশ্বর হলে চলবে না। দেখা হওয়া চাই—যাচ্ছি। আনন্দ হতে বঞ্চিত করবেন না।"—ইত্যাদি। পড়ে মুখে দুঃখের হাসি হল। সত্যই কি আসবেন।

'কোষ্ঠি' আর শেষ বুঝি হয় না। মানব আর আভিজের কথা চলছে। সামঞ্জস্যের দিকে আর নজর নেই; বলবার যা ছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলো সরবার দিকেই ঝোঁক।

শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিন—বাইরের ঘরে বসে লিখছি। সহসা শুনলুম—এইটা কি সুরেশবাবুর বাসা? বাবু গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লোকটির হাতে গড়গড়া। অকাট্য পরিচয়।

পিপাসিতের মতো ছুটে গিয়ে দেখি তিনিই তো বটে! বিদায়বেলায় বাঞ্ছিত দেখা দিতে এসেছেন। চোখে জল এসে গেল, জড়িয়ে ধরলুম! বললেন—"কি, হয়েছে কি! এখন যাবেন কোথায়?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।*** "ভোলা, শীগগির তামাক সাজ" বলে বসলেন। তার পর কত কথা, অসুখের উল্লেখ মাত্র নয়।—অসুখ আবার কি? ও সেরে গেছে। কথাটা ব্রহ্মবাক্যের মতোই কাজ করলে। আমার যে অসুখ ছিল বা আছে, সে কথাটা শরীরে বা মনে অনুভবই করিনি।

তার পর—'দিন যায় রাত্রি আসে,' স্নানাহার স্মরণ থাকে না। আনন্দ-মুখর তরুণেরা আসে যায়। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেই হবে ;—সুরেশের লাইব্রেরিতে সরস্বতী পূজা—সভাপতি শরৎবাবু। সুরেশের হৈ-চৈ আর আনন্দ থামে না।

এইবার আমার রোগের ব্যবস্থা। উদ্‌যোগ পর্বেই ঘন ঘন গুড়ুক এবং সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা। *** সময় আমাদের অধীন থাকবে—আধিপত্য করতে দেওয়া হবে না—কি বলেন?—বললুম—অত বজ্র বাঁধুনি দেবেন। হাসলেন 'এই দেখুন না।"

আজ আমাকে নিয়ে বেরুতেই হবে। টাঙাওলাকে বলে দেওয়া হ'ল—"কাল ঠিক আটটায় আসা চাই দেখিস—খবরদার বিলম্ব না হয়,—বুঝাতা?' 'হাঁ হুজুর' বলে সে চলে গেল পরদিন সেলাম করে জানিয়ে দিলে ঠিক আটটায় হাজির হয়েছে।

বেলা ৯টার সময়—দ্বিতীয় সেলাম। তখন চা খাওয়া চলছে, ভোলা তাওয়া চড়াচ্চে। গাড়ওয়ানকে বললেন—"এই ছাখ্ না চট্ করে নিচ্চি—সত্বরই যাতা হায়।"

ক্রমে তরুণদের আগমন। তাওয়াও ফিকে মেরেছে।—'ভোলা, করচিস কি, বাবুরা এসেছেন—কোনো আক্কেল নেই!"

বেলা ১১টায় তৃতীয় সেলাম।—তাই তো কেদারবাবু, এ বেটা যে ছাড়ে না দেখছি। এ বেলা কি যেতে পারবেন?

বললুম—"এঁরা সব দূর থেকে এসেছেন, এঁদের ফেলে'…

"তাই তো তা ও-বেটা বোঝে না কেন।—ওহে, এগারোটা তো বাজ গিয়া, এখন খাও-দাও গিয়ে, তোমাদের আবার 'পাকাতে' হয়। কাশীতে তো কষ্ট দিতে আসতে নেই। যাও—ঠিক চারটে বাজলেই আও কিন্তু"

সে কি বলতে যাচ্ছিল। "হাঁ হাঁ, বুঝা হায় তোমরা ক্ষতি নেই করে গা—ভাড়া ঠিক পাবে গা।" সে চলে গেল।

বললেন—"আচ্ছা বলুন তো, বড়লোকেরা এত সেলাম সয় কি

করে? উঃ, তিন সেলামেই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ কিন্তু দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু। কাজ থাকে তো সেরে রাখুন। তখন যেন··দেখুন চা খাওয়াটা একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট, ভারি সময় নষ্ট করে দেয়। ও কাজটা ফেলে না রেখে, এ বেলাই সেরে রাখলে কি হয়”...

বললুম—“সময় বাঁচাবার এমন সহজ উপায় ফস্ করে মাথায় এলো কি করে! আপনি উপন্যাসের দিকে মাথাটা দিলেন কেন-- এই সব শক্ত শক্ত আবিষ্কারের দিকে লাগালে যে অনেক কিছু পাওয়া যেতো!”—হাসলেন।

টাঙাওলা দু'বেলাই ঠিক আসে। রাত ১১টার পর সাত টাকা নিয়ে যায়। দু'দিন এইভাবে কাটলো।

বললুম—“কাশীতে কাজটা ভালো হচ্ছে কি? আপনি ধর্মভীরু মানুষ—ঘোড়াটার যে ইহকাল পরকাল গেল—বাতে ধরে মরবে যে।”

“নাঃ—কাল আর কারো কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি সকাল সকাল উঠবেন—পারবেন তো?—যার রোগ তার চিন্তা নেই, সেটা ভালো নয়”...

তৃতীয় দিনও সকালে বেরুনো হয়ে উঠলো না। বৈকালে মরিয়ার মতো উঠে পড়া গেলো। “আপনি বাইরের হাওয়া লাগান না, ওই আপনার দোষ! চলুন—হাওয়ায় খানিক ঘোরা যাক।” পরে-এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে কিছু না পেয়ে শেষে বেঙ্গল কেমিকেলের দু'শিশি 'পাইরেক্স্' নিয়ে ফেললেন—“এই খান দিকি—একদম ম্যালেরিয়ার মৃত্যুবাণ!”

দু'দিন এইভাবে বেড়ানো চললো। বেশ বুঝতে পারতুম—কথাবার্তা, হাসি-রহস্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ, সবই আমাকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে। ফেরবার আগে রাত্রে বললেন—“একটানা নাটক লিখুন দিকি, আপনি নাটক লেখেন না কেন? আপনার ভাষা আপনার 'ডায়লগ্' লেখার ভঙ্গী, সবই নাটকের উপযোগী। নাটকের

প্রয়োজনও রয়েছে। আরম্ভ করে দিন আসুন—আজ নাটক নিয়েই কথা কওয়া যাক্।”...

রাত একটা বাজলো।

বললুম—“কাল চলে যাবেন, শুয়ে পড়ুন”...

বললেন—“আপনি লেখেন তো, আবশ্যক হলে আমি খাটাতে রাজী আছি।—কথাটা মনে থাকবে তো?”

আমার মনটাকে এক নতুন কিছুতে নিবিষ্ট ও একাগ্র করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য—(সে কথা পরে শুনেছি)।

তাঁর আন্তরিকতা ও ভালোবাসার গভীরতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করে আমাকে বিচলিত করছিলো। বললেন—“কি ভাবছেন? রোগ আপনার সেরে গেছে”...

ষষ্ঠদিনে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নীরব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ-বেদনা বহন করছিলুম। বললেন—“কোনো চিন্তা রাখবেন না, কেদারবাবু, নাটকের কথাটা ভুলবেন না—বিজয়ার পত্র পাওয়া আমার বন্ধ হচ্ছে না।” (সত্যই বন্ধ হয়নি বন্ধু!)

ট্রেন ছেড়ে গেল।

কী আনন্দেই সে ক'দিন কেটেছিলো! কোনো নিয়ম রক্ষা করা হয়নি—জ্বরও হয়নি। ব্যথা-ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে ভাবতে ফিরে-ছিলুম—“তুমি কত বড়, তোমার প্রাণ কত কোমল। আমাকে এ সৌভাগ্য দান—তোমাতেই সম্ভব হয়েছিলো। তুমি যে বাংলার বেদনা-কাতর সাহিত্যিক। তোমার সেই স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি আজ বাংলার ঘরে ঘরে তোমাকে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে। নিপীড়িতা, পতিতা, অনাথা, ব্যথিতা—তোমাতে ব্যথার-ব্যথী পেয়েছে। তোমার দান বাঙালী সগৌরবে অসীম শ্রদ্ধার সহিত মাথায় করে রাখবে—বিশ্বের সমাদর আকর্ষণ করবে। হে বাণীর বরপুত্র, আমার দরদী বন্ধু—ব্যথিতের নমস্কার লও।

As for Bengali we have had Bankim, have still Tagore and Saratchandra. That is achievement enough for a single century.

AUROBINDO

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

করকমলে—

এইমাত্র আপনার সাদর পত্র পেলাম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে একটি লেখা চেয়েছেন। এজন্যে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। তবু লিখতে সঙ্কোচ আসে যে। কারণ তাঁর হৃদয়ের দিকটা সম্বন্ধে কিছু বলবার আমার আছে বটে, কিন্তু মুশকিল এই যে, সে বিষয়ে যা-ই লিখি না কেন, নিজের কথা কিছু-না-কিছু এসে পড়বেই। অন্যদিকে অতি সন্তর্পণে নিষ্কলঙ্ক শীলতার প্রতিটি দাবিদাওয়া মেনে লিখতে গেলেও খটকা লাগে : এ ধরনের মামুলি স্মৃতিতর্পণ করা কি সাজে তাঁর সম্বন্ধে, যিনি জীবনে এ শ্রেণীর লৌকিকতারই ছিলেন সবচেয়ে বিরোধী?

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে? তারও কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। কেন না, আমি জানি যে, আমাদের সাহিত্যে তাঁর দান দীর্ঘজীবী হবেই—আমরা তাঁর সম্বন্ধে লিখি বা না লিখি। তাছাড়া তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশস্তি লেখবারও অনুকূল সময় তো এ নয়। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম লিখবই না। পরে মনে হ'ল—অন্তত কিছু লেখা আমার চাই-ই। বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, তাঁর স্নেহ-প্রবণতার সম্বন্ধে আমার অনেক অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা আছে। তাই মনে হ'লো—এই সূত্রে সহজ ঘরোয়াভাবে তারই কয়েকটির কথা

লিখে যাই না কেন ?—আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সহজভাবেই নিবেন—বিশেষ যখন স্মৃতিতর্পণে ব্যক্তিগত কথা বলাটা অশোভন নয়। তাই কলম ধরেছি—চিঠির ভঙ্গিতেই লিখি, কেন না তাতেই আমি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কোথায় আপনার নিশ্চয় মনে নেই, কিন্তু আমার আছে, আপনারই লাইব্রেরীতে—উপরতলায় একটি ঘরে ১৯১৩ সালে। সেই প্রথম দর্শনেই তাঁকে আমি ভালোবেসেছিলাম। বিখ্যাত নাট্যকার মার্লোর একটি কথা মনে পড়ে; "Who ever loved not at first sight?" আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে সেই শুভদৃষ্টিতে যে রোমান্সের স্পন্দন বেজে উঠেছিল—যে আনন্দের আলো জেগে উঠেছিলো—তাতে বাদল আর নামেনি কখনো এই পঁচিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠতায়—এমন কি কখনো কোনো সূত্রে এতটুকু মনকষাকষিও হয়নি তাঁর—আর ৺অতুলপ্রসাদের সঙ্গে। প্রথম শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ি—"রামের সুমতি" গল্প। তখন ৺পিতৃদেব জীবিত। আমি ও আমার বোন মায়া তো মুগ্ধ। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন মায়াকে : "কেমন লাগল রে ?" সে মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ সংযমের সুরে সন্তর্পণে গম্ভীরভাবে বলল : "ভালো"। পরে মিলিয়ে নেবেন—ও যদি বাঁচে তবে ক্রিটিক হবেই। বাবা বললেন : "ভালো কি রে ? 'চমৎকার' বল্।"

এ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ৺পিতৃদেবের একটা মস্ত গুণ ছিলো—তিনি যে-প্রশংসা করতেন সে-প্রশংসায় ক্রিটিক ভঙ্গিমা কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠত না। কারণ তিনি ক্রিটিক ছিলেন না, ছিলেন রসিক, প্রেমিক। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিলত। শরৎচন্দ্রও যখন প্রশংসা করতেন যখন সত্যিই মনে হ'ত প্রশংসা করতে তিনি ভালোবাসেন ব'লেই সাধুবাদ দিচ্ছেন—ক্রিটিক হ'য়ে নাম কেনবার জন্যে না। আমার এক তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান ক্রিটিক বন্ধু আমাকে একবার কী তিরস্কারই করেন—লেখেন : "ওহে, কাউকে প্রশংসা করবার

সময়ে কম ক'রে বলবে, হাতে রেখে—নইলে এফেক্ট্ হবে না।" (আজও মরমে ম'রে আছি ভেবে যে, আমার 'হাতে না-রাখা' কত কথারই এফেক্ট্ হয়নি—যেখানে তাঁর প্রতি সমালোচনা আমাদের সাহিত্যের নীহারিকা হয়ে রইল!)

শরৎচন্দ্র এ-জাতীয় জীব ছিলেন না—প্রশংসা করতে এক পা এগিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে দশ পা পেছুতেন না—এফেক্ট্ হওয়াবার জন্যে। তাঁর কখনো ভুল হ'ত না এমন কথা বলি না—(সংসারে কে-ই বা অভ্রান্ত বলুন?) কিন্তু তিনি ছিলেন দিলদরিয়া: আর যা-ই করুন—ভুলের পরোয়া করতেন না। মানে, প্রশংসার পিছনে তাঁর দিল্ বলত "বহুত আচ্ছা"—হৃদয় তুলত জয়ধ্বনি। তাই বুদ্ধি সাবধান হ'তে চাইলেও এঁটে উঠতে পারত না। কারণ তাঁর হৃদয়টা যে ছিলো মস্ত। ক্রিটিকরা হয়ত বাঁকা হাসবেন—এ কি ব্যাজস্তুতি হ'ল না? অর্থাৎ—'হৃদয়' বটে, কিন্তু "বুঝ লোক যে জানে সন্ধান"—এতে ক'রে বলা হ'ল না কি যে বুদ্ধিতে তিনি যথেষ্ট—বাকিটা কটাক্ষেই? কথাটা উঠলই যখন—বলি, এ সম্পর্কে যা আমার মনে হয়েছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে।

তাঁর বুদ্ধি ছিলো তীক্ষ্ণ—উজ্জ্বল—সদা-সজাগ। কিন্তু ইংরাজিতে যাকে বলে ইনটেলেকচুয়াল তা তিনি ছিলেন না। তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিলো হৃদয়বত্তার দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ বাইরের বস্তুজগতে তাঁর মূল রীতিটি ছিলো অন্তঃশীলা—হৃদয়প্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ নয়, যেমন ধরা যেতে পারে আলডুস হাক্সলির। এই দুই মনীষীর উপন্যাস পড়তে পড়তে একথা আমার কতবারই মনে হয়েছে। আর মনে হয়েছে ঔপন্যাসিক হিসেবে শরৎচন্দ্র আলডুসের চেয়ে এত উর্ধ্বে এর জন্যেই। কারণ শিল্পকারুতে বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে হৃদয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ঢের বেশি গভীর রসের যোগান দেয়। আলডুসের উপন্যাসের ক্ষুরধার বিশ্লেষণাদি পড়তে পড়তে মন বলে: "বাঃ!" শরৎচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে হৃদয় ব'লে ওঠে: "আহা!"

এই হৃদয়াবেগ তাঁর প্রতি কথায় উঠত ফুটে। শরৎচন্দ্রের স্নেহের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছে তাঁরাই একথায় সায় দেবেন। তাই না তাঁর স্নিগ্ধ কথার দু-একটা চূর্ণ ঢেউয়ে এমন সহজে প্রাণমন উঠত দুলে। কিন্তু সে সব কথার ব্যাখ্যান তো হয় না। কারণ সে সব কথার মূল্য যে সব জড়িয়ে তবে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখাতে যাওয়া তো চলে না। তবু দু-একটা কথা না বললেই নয়।

তখন আমার বয়স হবে সতেরো-আঠারো—আমি একটি বাঙালী ওস্তাদের কাছে গান শিখি। এ-লোকটি খুবই ভদ্রঘরের ছেলে ছিলো—এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে নিয়ে বসবাস করত ব'লে জাতিচ্যুত হয়। শরৎচন্দ্র এ কথা আমার কাছে শোনেন—কারণ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন—এমন দুশ্চরিত্রের কাছে আমি গান শিখি ব'লে। মানুষকে সুচরিত্র ও দুশ্চরিত্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ ক'রে নীতির ধ্বজা ওড়ানোর পক্ষপাতী আমি ছিলাম না কোনো দিনই, তাই একথা বলতে বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠেছিলাম।

শরৎচন্দ্র কিন্তু হাসেননি, বললেন: "এ তো হাসবার কথা নয় মন্টু। এই যুবককে আমি শ্রদ্ধা করি—যে সমাজচ্যুত হ'ল, জাতিচ্যুত হ'ল—তবু মেয়েটিকে সে ভাসিয়ে দিল না—তার সঙ্গেই ঘরকন্না করছে একনিষ্ঠভাবে। যারা তোমাকে এর কাছে গান শিখতে মানা করে তাদের কথা ভেবে আমার কান্না আসে, হাসি না।"

এক একটি কথায় চমকে যেতে হয়। যেমন গানে এক একটা সুরের দমকা হাওয়ায় এক একটা চুল ওঠে ঝলমলিয়ে। শরৎচন্দ্রের নানা কথোপকথনে এইভাবেই আমার কত যে শিক্ষা হয়েছে—এই চমকের পথে। জীবনের কত বেদনার জায়গা যে তিনি দেখিয়ে দিতেন তাঁর ছোট্ট দু-একটি করুণার কথায়—দরদের ব্যথায়—যেমন এই গান-শেখা নিয়ে। একটি পতিতা মেয়ের গল্প শুনেছিলাম তাঁর কাছে—কিন্তু না, সে-কাহিনী এখন বলব না—হয়ত ছাপতে আপনিও ভরসা পাবেন না। পরে হয়ত কোনোদিন নিজের বেদনা বইয়ে

লিখব—কারণ সে সব লেখার নিন্দার দায়িত্ব থাকবে তখন একা আমারই।

তবু এটুকু ব'লে রাখলাম এইজন্যে যে তাঁর কাছে জীবনে উদারতার ও অনুকম্পার নানান্ দীক্ষাই পাই—নানা সূত্রে। সংসারে ভালোর জন্যে দরদ প্রকাশ করার রেওয়াজ আছে—তাতে বাহবাও মেলে কম না। কিন্তু বছর কুড়িক আগে মন্দের জন্যে—বিশেষতঃ মন্দভাগিনীর জন্যে—দরদ প্রকাশ করা ছিলো রোমহর্ষক কাজ। শরৎচন্দ্রের বহু গল্প, কথোপকথন ব্যাখ্যানে এই সব দুর্ভাগিনীদের প্রতি তাঁর যে দরদ নিত্যই ফুটে উঠত তাতে—(ক্ষমা করবেন ঘরোয়া কথাটার জন্যে) চোখে জল আসত সত্যিই। জীবনের সঙ্গে ছোয়াছুঁয়ি যখন হয় কল্পনার ঘটকালিতে তখন মন বলে: "বাঃ।" কিন্তু যখন প্রেমই এসে জীবনের ছায়ালোকে ফেলে আলো—তখন হৃদয় বলে: "আহা!" শরৎচন্দ্রের মনুষ্যত্ব—humanism-এর গোড়াকার দৃষ্টি--ভঙ্গিটি ছিলো এই জীবনবন্ধুর—দরদীর—প্রেমিকের। বিশেষ ক'রে নারী-চিত্রণে, শিশু-চিত্রণে ও পশুর দুঃখ-চিত্রণে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছত্রে ছত্রে উঠেছে ফুটে। তাই তো বার বার তাঁর গল্প উপন্যাস পড়ি—তবু হৃদয় বলে ঐ এক কথা: 'আহা!" তাঁর নিষ্কৃতি, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, অরক্ষণীয়া প্রভৃতি কতবারই তো পড়েছি, তবু এখনো ফের যেই পড়া শুরু করি বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। সাধে কি রোলাঁ তাঁর শ্রীকান্ত প্রথম ভাগের ইংরাজি অনুবাদ প'ড়ে বলেছিলেন: "নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য!" প্রসঙ্গত একটা কথা ব'লে নিই। বছর কয়েক আগে আমি একরকম আবদার ধ'রেই শ্রীঅরবিন্দকে বলি শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্প পড়তেই হবে—শ্রীঅরবিন্দ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—(শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি ও মহেশ ছাড়া আর কিছুই বোধহয় তিনি পড়েননি) তবু আমার উপরোধে এ-গল্পটি প'ড়ে আমাকে লেখেন: "A wounderful style and a great and perfect creative artist with a profound emotional

power." পরে "নিষ্কৃতি" পড়তে পড়তেও আমাকে নানা সময়ে লিখে জানাতেন—ওর সূক্ষ্ম দরদ, নিপুণ দৃষ্টি, বর্ণনাশক্তি, সংযম—আরো কত কত শিল্পসম্পদ, প্রেমসম্পদ। সে চিঠিগুলি হাতের কাছে নেই খুঁজে বের করতে পারব না ভেবে; তাই এ পত্রে সে সব উদ্ধৃতি দিতে পারলাম না।

কিন্তু যা বলছিলাম: শরৎচন্দ্র গল্পালাপে কত গভীর সুরই যে ফোটাতেন দু-একটি হাল্কা কথায়। একদিন মনে আছে তাঁর শিবপুরের বাসায় তিনি বলেছিলেন: "অমুক ঔপন্যাসিক তাঁর অমুক চরিত্রকে একেবারে নিখুঁত পাষণ্ড ক'রে এঁকেছেন। কিন্তু মানুষকে এরকম নির্জলা মন্দ ক'রে আঁকা উচিত নয় মণ্টু, কাউকেই এভাবে অপমান করতে নেই। সংসারে যেমন নিখুঁত দেবতাও নেই, তেমনি নিখুঁত শয়তানও নেই।"

আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও যে কথাটা সত্য—এ বিষয়ে সন্দেহ কি? গীতায়ও তাই "সুদুরাচার"-এরও "ক্ষিপ্রধর্মাত্মা" হওয়ার কথা আছে। কিন্তু আমি তাঁর মতামতের আধ্যাত্মিক সত্যাসত্য যাচাই করতে এ-প্রসঙ্গ তুলিনি। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি তাঁর হৃদয়টা স্বভাবতই কত বড় ছিল। হয়ত অনেকে বলবেন: "আহা, ভারি নতুন কথাই বললেন—এ তো যে-কেউ তাঁর গল্প উপন্যাস পড়েছে সেই জানে।" না জানে না। খুব কম লোকেই আন্দাজ করতে পারে কত গভীরভাবে তিনি অপরের ব্যথা বুঝতেন। তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এলে এ জানা সম্ভব হ'তো না। রচনায় তাঁর এ-বেদনার সিকির সিকিও ফোটেনি। তাই গল্প উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি জানা যায় না তাঁর অনুভবের জীবন্ত বেদনার কথা। কারণ জীবন যে শিল্পকলার চেয়ে ঢের বড়—ছোট আধারে বড় ধরবে কেন? এ সূত্রে আমি জোর দিতে চাইছি তাঁর সেই জীবন-বেদনার উপর। কী গভীর বেদনা সে!—মনে আছে একদিন একটা পথের ঘেয়ো কুকুরকে সেই তাঁর আদর ক'রে ডেকে লুচি খাওয়ানো—

কুকুর সম্বন্ধে তাঁর গভীর ব্যথার কথা তাঁর গল্পেও মেলে সত্য, কিন্তু চোখের উপর এ-দরদ দেখলে বোঝা যায় যে গল্প থেকে তার গভীরতার তল অনুমান করা যায় না কিছুতেই। এ ঘটনাটা ঘটেছিল মনে হচ্ছে ১৯২৩ সালে, দিল্লিতে। যে বছর সেখানে কংগ্রেস হয় সেই বছরে। সালটা আমার ভুল হয়েছে কিন্তু। ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। দিল্লি থেকে আমরা একসঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াই—বৃন্দাবন আগ্রা আরো কোথায় কোথায়। এ সময়ে আমরা অনেকদিন ছিলাম একসঙ্গে। কী আনন্দেই যে কাটত দিনগুলি। আর কত যে শিখতাম তাঁর কাছে—রোজই। তাঁর সঙ্গে আরো নানাভাবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাটা ছিল আমার কাছে একটা শিক্ষা, তারও বেশি—দীক্ষা তাঁর চরণতলে জীবনকে দরদের চোখে দেখার পার্ট নেওয়া। একদিন আমার এক বন্ধু শরৎদার খুব নিন্দা করেন আমার কাছে। আমি চুপ ক'রে থাকি। প্রতিবাদ করিনি এই জন্যে যে, প্রতিবাদে সত্য বলতে গেলে তাঁকে ব'লতে হ'তো : "ভাই শরৎবাবুর বড় দিকটা যে তোমার চোখেই পড়ল না ; এজন্য দায়িক তাঁর বড় দিকটা নয়, দায়িক তোমারই চোখের দৃষ্টিদৈন্য।"

কিন্তু না, দৈন্য শুধু চোখের নয়—এ দৈন্যের মূলে—সঙ্কীর্ণবুদ্ধির একদেশদর্শিতা। বুদ্ধির ধর্মই যে এই একচোখোমি। তাই তো তার দেখা এত অসম্পূর্ণ। কাউকে টুকরো টুকরো ক'রে দেখলে যে তাকে ভুল দেখা হয়—এইটেই সে বোঝে না, বুঝতে চায় না। কেননা সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির স্বভাব—ঔদ্ধত্য, কাজেই সে ভোলে যে সবচেয়ে গভীর দৃষ্টি হ'লো দীনতার দর্শন। শরৎচন্দ্রের ছিল এই দিব্য দৃষ্টি—প্রেমের দরদের। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতনই প্রেম ও দরদ ছিল তাঁর সহজাত। কিন্তু প্রেম ও দরদকে বুঝতে হ'লে চাই ঐ দুটি বস্তুই—ওদের কোনো বদ্‌লিকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব, মানে যদি কাউকে ঠিক বুঝতে হয়। তাই প্রেমের প্রণামী দিয়ে যে-লোক শরৎচন্দ্রের হৃদয়সিন্ধুর কাছে আসতে চায়নি—ছুঁতে চায়নি

তাঁর গভীর প্রেমকে, যে তাঁকে শুধুই দূর থেকে দূরবীন নিয়ে দেখেছে—সে রাখবে কেমন করে তাঁর প্রেমের বিস্তৃতির খবর? জানবে কেমন ক'রে তাঁর দরদের গভীরতার কথা?

তাছাড়া শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এ সময়ে তিনি ভারি হাল্কামি করতেন—চিঠিপত্রেও। এ-ভঙ্গি হ'ল ফরাসি-প্রকৃতিতে: এর নাম blague: অর্থাৎ কিনা নিপুণভঙ্গিতে রটানো যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ-ভঙ্গিকে চেনে না তারা স্বতই ওঠে চ'টে—ভাবে কত কী ভুল কথা। এই জন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই, কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালিগালাজ করলে আমাকে বাজত—(এ বিষয়ে বোধ করি আমি একটু সেকেলে, লয়ালটি বস্তুটিকে আমি বিশ্বাস করি) কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ খুশী হ'তেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি কথা। আমি একবার অনেক খোঁজ ক'রে এক মস্ত উলঙ্গ তিব্বতী যোগীর দেখা পাই কাশীতে। যোগীটি গুপ্ত থাকতেন। অনেক কষ্টে তো তাঁর কাছে পৌঁছই। তিনি হেসে বললেন ভাঙা হিন্দিতে: "পাড়াপড়শিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে বাপু আমি দারুণ দুশ্চরিত্র আমি ভগবানের কথা কী বলব হে?" আমি ভারি রাগ করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু সে দীর্ঘ কাহিনী—যা হোক শেষটায় তিনি আদর ক'রে কাছে টেনে নিলেন—কী যে চমৎকার চমৎকার কথা বললেন—আমার দুটি ভজন গাওয়ার পরে। মনে হ'ল—এই দুই মূর্তি কি একই লোকের। শুনেছি নাকি মহাযোগী বারদীর ব্রহ্মচারীর ভারি উপভোগ করতেন লোককে বুঝিয়ে যে তিনি অতি পাষণ্ডী। শরৎচন্দ্রকে বলতাম: "যা হোক সাধুসঙ্গে আছেন বৈকি—you are in great company". শরৎচন্দ্র ধরা দিতে চাইতেন না সহজে।

কিন্তু স্মৃতিকথা শনৈঃ শনৈঃ বড় হ'য়ে যাচ্ছে—তাঁর কথা দু-একটি প্রবন্ধে লিখে তো ফুরোবেও না—কাজেই এ-যাত্রা উপসংহার পর্বে আসি।

আমার এ-প্রবন্ধের বাকী সুরটিতেই আসি ফিরে। বলছিলাম না তাঁর হৃদয়বত্তার কথা? মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে সবচেয়ে টানত তাঁর হাসি ও স্নেহ—অন্ততঃ আমাকে। তাঁর হাসির নানা গল্প লিখব হয়ত কখনো পরে। আজ শুধু তাঁর হৃদয়ের কথাটাই বলি, আর একটু এমনিই ঘরোয়া ভঙ্গিতে।

শরৎচন্দ্র তাঁর নানা লেখায়ই বার বার বিলাপ করেছেন যে, চিঠি লিখতে তিনি পারেন না। কিন্তু তাঁর চিঠির ছত্রে ছত্রে যে-হৃদয়রাগ উজ্জ্বল হয়ে উঠত এ আবেগ-দীন জগতে তার জুড়ি কমই মেলে। নিচে তার দুটি চিঠি উপহার দিই নমুনা হিসেবে:

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

তুমি হয়তো জানো না যে, আমি আট নয় মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। লেখা-পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্যন্ত না। এ-জীবনের মতো লেখা-পড়া যদি শেষ হয়েই থাকে তো অভিযোগ করব না। মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী—এখনো তাই যেন থাকতে পারি।…

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, আমার চেয়ে কে বড় কে ছোট এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই। ***যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'তো না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করছি। এইজন্যেই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করিনে। যৌবনে এক-আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে; কিন্তু সে

আমার প্রকৃতি নয়—বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে বসেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশিদিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করিনে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনিধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

আমার চিঠি লেখা চিরকালই এলোমেলো হয়, বিশেষতঃ এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে ক'রো না। ইতি—৩রা মাঘ, ১৩৪২।

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পত্রটি এই :

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে কলকাতার বাড়িতে ফিরেছি।...

তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকাল পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম, বড় আনন্দ হ'ল। একবার সত্যিকার দেখা দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেছি এ জীবনে আর হ'লো না। না-ই হোক্।

তোমাকে যে টাইপ-রাইটার পাঠিয়েছি তা যে তোমার পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই।...তোমাকে দিয়ে আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

শ্রীঅরবিন্দের হাতের লেখাটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন। শ্রীঅরবিন্দ এত ক'রে আমার বইয়ের অনুবাদ দেখে দিচ্ছেন... যাঁরা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। নিঃস্বার্থ-ভাবে পরের জন্যে না ক'রে থাকতে পারেন না তাঁরা। হয় করেন না—কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানেন না।...

তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু। এর বেশি আর

কি বলব ? চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল, কেমন যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারিনে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হ'ল না—সে আমার অক্ষমতার জন্যে, অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়—এ বিশ্বাস ক'রো। ইতি—৩রা মাঘ, ১৩৪১।

শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'এ-পত্রটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ মুগ্ধ হন ও আমাকে লেখেন পরদিনই (আমার একটা তর্কের উত্তরে) :—

"Sarat Chaterjee's letter is not a glory of the vital at all even though it may have come through the vital—but from it; it is psychic throughout, in every sentence. If I were asked how does the psychic work in the human being, I could very well point to the letter and say "like that". The ordinary vital is another guess thing! The psychic is the soul, the divine spark animating matter and life and mind and as it grows it takes form and expresses itself through these three—touching them to beauty and hiness—it worked ever before humanity in the lower creation leading it up towards the human, in humanity it works more freely though still under a mass of ignorance and weakness and coarseness and hardness leading it up towards the divine. In yoga it becomes conscious of its aim and turns inward to the Divine. It sees behind and above it—that is the difference.

Of course all prayer is not heard—the world would be a still more disastrous affair than it is, if everybody's prayers were heard, however sincere. Even the Godward prayer is not always heard—at once ; even as faith is not always justified at once. Both prayer and faith are powers towards realisation which have been given to man to aid him in his struggle—without them—without aspiration and will and faith (for aspiration is a prayer) it would be difficult for him to get anywhere. But all these things are merely means for setting the Divine Force in action—and it sometimes takes long, very long even, before the forces come into action or at least before they are seen to be in action or beat their result. The ecstasist is not altogether wrong even when he overstates his case. Even the overstatements sometimes help to convince the Cosmic Power."

ভাবার্থ : শরৎচন্দ্রের চিঠির মহিমা ওর প্রাণবত্তায় নয় ;—কারণ যদিও প্রাণের প্রণালীর মধ্যে দিয়েই ওর ঢেউ উঠেছে, কিন্তু প্রাণ সে-ঢেউয়ের উৎস নয়। এ পত্রটির প্রতি ছত্র আখরে অন্তরাত্মার আলো। মানুষের মধ্যে এই অন্তরাত্মা কিভাবে সক্রিয় হয় একথা যদি আমাকে কেউ শুধায়, আমি অকুণ্ঠে বলতে পারি : "ঐ চিঠির মতন।" অন্তরাত্মাই হ'ল আমাদের অন্তরপুরুষ, দিব্যজ্যোতিঃ, সে-ই বস্তুজগৎ, প্রাণজগৎ ও মনোজগৎকে তোলে জীবন্ত ক'রে। যতই এর বিকাশ হয় ততই ও রূপোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে সুকুমার মূর্তি ধারণ করে। মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জীবজগতেও ওর শক্তি নিরন্তরই সক্রিয় ছিল, কেবল মানুষের মধ্যেও ঢের বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে—করে তাকে দেবত্বের অভিসারী—যদিও বহু অজ্ঞান, দুর্বলতা, স্থূলতা, কঠিনতার

বোঝা ঠেলে তবে। যোগের সঙ্গে ওর সাধারণ ক্রিয়াভঙ্গির কেবল এই তফাত যে, যোগে ও নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা লাভ করে— দেখতে পায় পিছনেও ঊর্ধ্বেও। তাই দিব্যশক্তির সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসীও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়—যখন সে নিজের অনুভব সম্বন্ধে অত্যুক্তি ক'রে বসে। কারণ এসব অতিশয়োক্তিও অনেক সময়ে জৈবলীলার প্রত্যয়-বুদ্ধিকেই দৃঢ় করে।

আজ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী—এক্সটেসিস্ট হ'তে আমার বাধেনি আরো গুরুদেবের ভরসা পেয়ে। আর কিছু না এ সূত্রে শুধু এইটুকুই আমার বিশেষ ক'রে বলবার কথা যে তাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহের স্বাদ যেই পেয়েছে সেই মানবে যে সে অভিজ্ঞতা থেকে নিঃস্বার্থ স্নেহ কাকে বলে সে সম্বন্ধে কম আলো পায়নি। ম্যাথিউ আর্নল্ড্ বলেছেন না—ভালো কাব্যই আমাদের নিকষ হ'য়ে বিরাজ করে; অন্য কাব্য ভালো কি না সে যাচাই করি আমরা তারই আনন্দের সঙ্গে তুলনা ক'রে। শরৎচন্দ্রের অতুলপ্রসাদের ভালোবাসা ছিল এমনি কষ্টিপাথর। জীবনে এমন দান বড় বেশি মেলে না। অথচ যখন মেলে কত সহজেই মেলে—কোনো যোগ্যতারই দরকার হয় না। সুলভ হওয়াই যে দুর্লভের ধর্ম।

আর একটা কথা শুধু—আমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের শেষ দেখার সংক্ষেপে। গত বছর (১৯৩৭) জুলাই মাসে—কলকাতায় তাঁর বাড়িতে। রাত তখন প্রায় এগারটা। কত কথাই হ'ল। সঙ্গে ছিল কেবল আমার ভাই শচীন।

শেষে বললেন: "তুমি আর কতদিন থাকবে কলকাতায়?"

শচীন বলল: "পনরই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন—তাঁর দর্শন মেলে জানেন তো? তাই মন্টুদা আগস্টের এগারই বারই নাগাদ রওনা হবে ভাবছে।"

শরৎচন্দ্র একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "তাহ'লে তো আর বেশি দিন নেই।"

ফের একটু থেমে : "তোমার সঙ্গে এবার কিছুই কথা হ'ল না মণ্টু। পরে আর হবে কি না তা-ও জানি না। কিন্তু তোমাকে আর থাকতেও তো বলতে পারিনে—তাঁর জন্মদিনে তুমি অন্য কোথাও কাটাবেই বা কী ক'রে?"

এমনি ছোট্ট কথা···কিন্তু মনটার মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে···বললাম হেসেই : "কিন্তু কলকাতার তো প্রায় সবাই বলে কী হবে এসব সেকেলে মনোভাবে?"

—"না মণ্টু," বললেন শরৎচন্দ্র, 'আমি মন্ত্র তন্ত্র জপ তপ বুঝিনে। কিন্তু এ বুঝি ও মানি যে, পাওয়ার মতন কিছুই পাওয়া যায় না প্রণাম করতে না শিখলে!"

একটা উর্দু গজলের ধুয়ো গুনগুনিয়ে ওঠে :

"তোমায় প্রণাম করতে হৃদয় চায়।
মরণকে জীবন দেব না—দেব তোমার পায়।
বৈরাগী এ-প্রাণ শুধু ঐ প্রেমের দুরাশায়॥"

ঢং ঢং ক'রে বারটা বাজল।

প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম।

ইতি—স্নেহের মণ্টু

[শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লেখা একখানি 'খোলা চিঠি'।]

সেই খামখেয়ালী আত্মভোলা এলোমেলো মানুষটির মধ্যে অতিশয় কোমল এবং অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল্ একটি অন্তর ছিল, যা সহজে বাইরের লোকের কাছে প্রকাশিত হ'ত না; বরং শুষ্কতার আবরণে সংগুপ্ত থাকত। যতখানি তিনি গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, ততখানিই ছিল তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে মুখে উপেক্ষা। "আমি তো একটি মহা নাস্তিক" এ-কথা তাঁর মুখে বহুবার শুনলেও যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা জানতেন এই মৌখিক কথার মূল্য কতটুকু ছিল তাঁর জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর সাহিত্যগুরু বলে মনে মনে পূজা করতেন, কিন্তু সেও তাঁর ঐ নাস্তিকতার আবরণে আবৃত গভীর আস্তিক্য বুদ্ধির মতই ছিল একান্ত সঙ্গোপন। যাঁদের কাছে মন খুলে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা জানেন, কি নিবিড়তম শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি।

তিনি বলতেন—"বাংলা সাহিত্য বলতে আর অন্য কিছু আছে কি? বাংলা পড়তে হলে একমাত্র রবিবাবুই তো সম্বল।" বহুবার তাঁকে দুঃখ করে বলতে শুনেছি—"বাংলাদেশে প্রকৃত রসিক সাহিত্য-সমঝদার এখনও বেশী জন্মেনি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক্ রস গ্রহণ করতে পারে এমন সমঝদার শিক্ষিত লোকের মধ্যেও কম।

অধিকাংশ লোকই দেখি বুঝুক না বুঝুক ফ্যাসানের খাতিরে বুঝদারের ভান করে। কিন্তু চেপে ধরলে আবার তারাই দেখি রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেয় সবচেয়ে বেশি। এদের সাথে একটু বিপরীত সুরে কথা কয়ে দেখেছি, এরা প্রাণ খুলে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও ত্রুটির তালিকা দিতে শুরু করে দেয় এবং আমাকেও ওদেরই দলের একজন ঠাউরে নিয়ে খুশী হয়ে ওঠে। ঐ সকল লোকেরাই যখন আমার রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমারই

সামনে আরম্ভ করে, তখন হাসি পায় দুঃখও হয়। আমি অনেক লোকের উপরেই এই সূত্রে শ্রদ্ধা হারিয়েছি। আমায় এ পরীক্ষায় দু-চারজনকে মাত্র উত্তীর্ণ হতে দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্থ ছিলো। 'বলাকা' ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাব্য। 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন; স্মরণশক্তি ছিলো তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ। কোনোখানে আটকাত না বা ভুল হ'তো না। তাঁর সাথে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। বহু দীর্ঘ সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেছে আমাদের কাব্যসাহিত্য আলোচনায়।

কতবার তিনি হেসে বলেছেন—সংসারে খাঁটি ভক্ত মেলা ভার রাধু! রবিবাবুর সামনে যারা নিজেদের পরম ভক্ত বলে প্রণাম করে থাকে, তাদেরও নেড়েচেড়ে দেখেছি—ভিতরে ফাঁকি ভরা। আমার সামনে যারা আমার স্তুতিবাদ করে, তারা আড়ালে যে আমার নিন্দাই করবে, এ তো স্বাভাবিকই।"

তাঁর দ্বিতলের পাঠকক্ষে যাঁরা যাবার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা দেখে থাকবেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পূর্বতন আধুনিক গ্রন্থ ছিলো তাঁর সর্বক্ষণের প্রিয়সঙ্গী। তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার গুটি-কয়েক পংক্তি প্রায়ই শোনা যেত, অনেকে নিশ্চয় শুনেও থাকবেন। আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়ছে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে বারংবার শোনা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইন ক'টি :

"বাঁশি যখন থামবে ঘরে, নিভবে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে পড়বে যবনিকা;
তখন যেন আমার তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;

সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ।"

শরৎচন্দ্র স্বভাবতঃ আত্মগোপনশীল মানুষ ছিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করা ছিলো তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁর চরিত্রের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা ছিলো তাঁর গভীর ও বহুবিচিত্র। অনেক আশ্চর্য কাহিনীই তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি। এই সকল ঘটনা নিয়ে তাঁকে আত্মজীবনী লিখবার অনুরোধ করলে তিনি হেসে বলতেন—"জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় সাহিত্যে রূপ দেওয়া চলে না। সেই অভিজ্ঞতার ফল একমাত্র সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি করার কাজে লাগতে পারে।"

তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ইতিহাস নানা বিচিত্র বেদনা ও আনন্দের নিবিড় রসে পরিপূর্ণ। জীবনকে তিনি অবাধ মুক্তির মধ্য দিয়েই চালনা করে নিয়ে এসেছেন। কখনও কোনো বন্ধন জীবনে গ্রহণ করেননি বা মানেননি। সংসারে একটিমাত্র বন্ধনকে তিনি স্বীকার করতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তা মেনে গিয়েছেন—সে বন্ধন অকৃত্রিম ভালবাসার। এই বস্তুটির জন্য তিনি সমস্ত কিছুই অবহেলা করতে পারতেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসের নানা স্থানে তাঁর কৈশোর ও যৌবনকালের জীবনের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে তাই ফুটে উঠেছে। আপনার জীবনে গভীরতর দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। সে দুঃখ তাঁর হৃদয়কে খাঁটি সোনা করে তুলেছিল। অন্তর-বেদনার এমনতর পরম অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এরূপ গভীর রসসৃষ্টি করা তাঁর ঘটে উঠত না। শরৎ-সাহিত্যের

বিশেষত্বই হচ্চে, জীবনের কঠোরবাস্তবতার সাথে সুষমা-স্নিগ্ধ কল্পনার অপূর্ব সুসঙ্গতি।

শরৎচন্দ্রের সেই পরদুঃখকাতর কোমল অন্তঃকরণটির সাথে পরিচয় যাদের ঘনিষ্ঠভাবে ঘটেছিল, তাঁর আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ যারা নির্ধারিত ধারায় লাভ করেছে—আজ সাহিত্যস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের চেয়ে মানুষ শরৎচন্দ্রকে হারানোর বেদনাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে এবং উঠবে। সেই নিরভিমানা স্নেহপ্রবণ শুভ্রকেশ মানুষটির প্রসন্ন হাস্যস্মিত মুখ আব যে তাদের ঘরে সময়ে অসময়ে দেখা দেবে না, রোগের দিনে, আপদ-বিপদের দিনে আত্মীয়েরই মতো, অকৃত্রিম উৎকণ্ঠায় আন্তরিক সহানুভূতি দান করবে না, বিরামের ক্ষণ তাঁর সাহচর্যে নানা আলাপ-আলোচনায় রঙ্গরসিকতায় গল্পে কাব্যালোচনায় সুন্দর মধুর হয়ে উঠবে না—এ ক্ষতিটাই এখন সবচেয়ে বাস্তব হয়ে কঠিন বেদনায় বুকের মধ্যে বাজছে। স্রষ্টা ও শিল্পী শরৎচন্দ্রের মৃত্যু নেই, তিনি অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন তাঁর সৃষ্টিরই মধ্যে। কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্র যে আর নেই—এ ক্ষতির দুঃখ তারা ভুলবে কেমন করে—যারা তাঁর সেই স্নেহস্নিগ্ধ অন্তরের দুর্লভ মমতাস্পর্শ পেয়েছিলো ?

শরৎচন্দ্র মানুষটি বিলীয়মান খাঁটি বাঙ্গালী-মজলিসের প্রতীক ছিলেন। তাঁর জীবনের অতি নিকট সংস্পর্শে এসে কতদিন না আমার মনে হয়েছে—মানুষটি যেন একটি অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা, তারই উৎসমুখের ধারাজলে অবগাহন ক'রে যে পুলকে যে সহানুভূতিতে চিত্ত ভরে উঠতো এই আনন্দহীন জগতে বুঝি সে জীবনানন্দের তুলনা নেই। আর সেই জীবনানন্দের নিখুঁত ও পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলুম তাঁর গল্পে—মজলিসে। আজ সেই সব ছোট বড় গল্পের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই গল্পের কথক শরৎচন্দ্রকে। তাঁর মুখ থেকে সেই সব গল্প যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কাছে বোধ করি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তাঁর অননুকরণীয় সরস কথনভঙ্গী।

তাঁর একটি গল্প মনে পড়ে। শরৎচন্দ্র তখন বর্মা থেকে সবেমাত্র কলকাতায় ফিরেছেন। থাকেন বাজেশিবপুরে বাড়ি ভাড়া ক'রে। সেখানকার এক বুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পাড়ায় থাকে—কাজেই দেখাশুনা ও দুটো-চারটে কথাবার্তা হয় রোজই। একদিন তিনি দেখলেন সেই বুড়ী একটা মনি-অর্ডারের ফর্ম নিয়ে ভারি ব্যস্তভাবে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছে; শরৎচন্দ্র তাঁকে ডেকে এতো ব্যস্ততার কারণ ও গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলেই বুড়ী জানাল সে কোনো এক ভদ্দরলোকের কাছে যাচ্ছে—বড় দরকার। শরৎচন্দ্র বললেন—ও বুড়ীমা, শুনিই না বাছা, কি দরকার তোমার? বুড়ী যেতে-যেতেই বললে, এই মনি-অর্ডারের কুপনের ওপর একটা ছোট চিঠি এসেছে, তাই যাচ্ছি এই চিঠি পড়াতে সেই ভদ্দরলোকের কাছে। শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন: বুড়ীটা ভাবত এ এক লুচিভাজা বামুন, কুপনের ওপর দু'ছত্তর বাংলা চিঠি পড়ার বিদ্যেও এর নেই।

এই বাজেশিবপুরে থাকার সময়কার আর একটি গল্প তিনি বলেন। সেই সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর হঠাৎ তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মায় এবং তিনি বিস্তর টাকা খরচ করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভালো ভালো সব বই কিনে গভীরভাবে সেই বই অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন এই বিদ্যে আয়ত্ত করতে। অনেকদিন অধ্যয়নে কাটাবার পর তাঁর ইচ্ছা হ'লো নিজে লোকের চিকিৎসা ক'রে এইবার দেখবেন কতখানি কৃতকার্য হন। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেল কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর—পেসেন্ট খুঁজতে লাগলুম। বাড়িতে যারা আসে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি তাদের কিছু অসুখ হয়েছে কি না। সবাই বলে—না, কিছু হয়নি। গরহজম? মাথাব্যথা? চোঁয়াঢেকুর? অম্বল? সবাই বলে--না, কোনো অসুখই হয়নি। বেজায় দমে গেলুম, কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে! যাই হোক, অনেক চেষ্টা-চরিত্তিরের পর বাড়ির পেছনদিকের এক গয়লানীর অসুখ হতে একদিন আমার কাছে এলো। খুব ভালো ক'রে দেখেশুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু'একদিন পরেই এসে আবার ওষুধ নিয়ে যেও বাছা—আর যদি তোমার কেউ জানাশোনা থাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো—অমনি ওষুধ দেবো। কিন্তু সেই যে সে গেলো আর আসে না। একদিন বাড়ির পিছনদিকের জানালাটি খুলে দেখি সে গরুকে ঘাস খাওয়াচ্চে। তাকে ডেকে বললুন, হ্যাঁ বাছা—তোমার সেই যে কি অসুখ করেছিল, আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে—আর আসো না কেন? গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছি, আর দরকার নেই। যাঃ বাবা এতো পড়লুম, অমনি চিকিৎসা করব, ওষুধ দেবো, তাতেও রুগী জুটল না, যাও বা জুটল, তাকে আর চিকিৎসা করতে হ'লো না, এক ওষুধে সেরে গেলো।

শরৎচন্দ্র যখন 'অরক্ষণীয়া' গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদ ভারতবর্ষে দেন

তখন তার উপসংহার অন্যভাবে করেছিলেন। সেটি পরে তাঁর চিরশুভার্থী বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাজেষ্ট করেন—ঐভাবে শেষ না করে এইভাবে (বর্তমান গ্রন্থে যে উপসংহার আছে) শেষ করলে ভালো হয়। শরৎচন্দ্র তাই করেছিলেন। বই বেরোবার কিছুদিন পরেই মফঃস্বলের এক ক্লাবের কতকগুলি ভদ্রলোক হরিদাস-বাবুকে চিঠি লিখে জানান যে, তাঁদের ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তুমুল তর্ক, এমন কি বাজী রাখাও হয়েছে উপসংহারের বক্তব্য নিয়ে। একদল বলছে, জ্ঞানদার সঙ্গে অতুলের বিয়ে হবে, শরৎবাবু এই ইঙ্গিতই করেছেন; আর-একদল বলছে, না—তা কখনোই না। অতএব হরিদাসবাবু যেন শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন জ্ঞানদাকে অতুল শ্মশান থেকে নিয়ে যাবার পর তাদের কি হ'লো এবং তিনি কি বলেন সে কথা যেন তাঁদের হরিদাসবাবু জানান। শরৎচন্দ্র আসতেই হরিদাসবাবু তাঁকে সব কথা বললেন। শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে; বললেন, আপনার জন্যেই তো এই বিপদ হ'লো—বেশ দিয়েছিলুম জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে, অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচত লেখক বাঁচত, প্রকাশক বাঁচত, এখন এর কি জবাব দেবো আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে—এরকম চিঠি রোজ এলেই তো গেছি। ব'লে হাসতে হাসতে বললেন, তারা তো জানতে চেয়েছে জ্ঞানদা ও অতুলের শ্মশান থেকে যাবার পর কি হ'লো? আচ্ছা লিখে দিন: শরৎবাবু বললেন—তারপর আমাদের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই; সুতরাং কি হইল তিনি বলিতে পারেন না।

এই রকম কত গল্পই তিনি করতেন। কত দিন কত রাত্রি তাঁর চারপাশে বসে তাঁর অনুরাগী বন্ধু স্নেহভাজনরা কি অবিমিশ্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন—প্রাণখোলা হাসি হাসবার সুযোগ পেয়েছেন তার বুঝি সীমা নেই। কিন্তু শুধু হাসির গল্পই তিনি বলেননি, বলেছেন নিজের জীবনের অদ্ভুত সব গল্প। রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমরা তা শুনতুম, কত মানুষ কত ঘটনা ছায়াচিত্রের মতো চোখের সামনে

ভেসে উঠতো, অন্তর ভরে উঠতো সহানুভূতিতে। সেদিন তাঁর মুখের এই সব গল্পকে গল্পই মনে করতুম ; আজ মনে হয় হয়তো তিনি নিছক গল্পের জন্যেই গল্প বলতেন না, সেই গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকত একটি দরদী জীবন-রসিক। তাঁর সাহিত্যও এই দরদী জীবন-রসিকটিকে আমরা শিল্পীর ছদ্মবেশে কখনো-কখনো দেখে থাকবো। রাঙা নদীর তরঙ্গের উপর দিনান্তের পলাতক আলোর আভাসের মতো মাঝে মাঝে নির্বিকার শরৎচন্দ্রের মধ্যে সেই দরদী জীবন-রসিককে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কি কথা তাঁর সাহিত্যে তাঁর জীবনে বার বার নানা সুরে আমাদের বলতে চেয়েছেন ? কি মন্ত্র জীবনের তিনি শুনিয়েছেন ?

কি সে ? তাঁর সাহিত্য আর জীবন উপক্রুত বঞ্চিত অপমানিত মানুষের কথাই আমাদের শুনিয়েছে। বলে গেছে : 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' বলে গেছে : জীবন-প্রবাহের আবর্তে মানুষ অসহায়, ঘটনার দাস, নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ভুলভ্রান্তি অন্যায়-অপরাধ সব ক্ষমা করে তাকে ভালবাসো। জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম—প্রেম, সেবা, ক্ষমা। সব মানুষের মধ্যেই জীবনদেবতার এই শ্রেষ্ঠ দানগুলি—ধর্মগুলি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মানুষের ভুলভ্রান্তিই বড় নয়, তার মধ্যেকার আসল মানুষটাই বড়, তাকেই দেখা সত্য দেখা। মানুষ দেবতা নয়, সে মাটির পৃথিবীর মানুষ—দোষে আর গুণে। A man is a man for a' that.

শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর দুঃখবাদের। তবু তাঁর সাহিত্যের সকরুণ দুঃখবাদকে অতিক্রম ক'রে তাঁর বলিষ্ঠ আশাশীলতা ওই ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর মানুষের কানে অভয়বাণী দিয়ে বলে, জীবনে গভীর নৈরাশ্য অকথিত বেদনা—স্বপ্নভঙ্গ আছে জানি কিন্তু তাতে বিচলিত হ'য়ো না। জীবনের সব বিফলতা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে গভীর-ভাবে ভালবাসতে শেখো—স্থূল বাস্তবতার শত আঘাতেও যেন স্বপ্নভঙ্গ না হয়, তাহলে একদিন 'কার জন্যে বেঁচে থাকব ?' এই প্রশ্নটির জবাব জীবন থেকেই পাবে।

যার জন্য সাধনা নেই, আয়োজন নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে বস্তুকেও মানুষের আদর কত! ক্লেশলেশহীন সুদূর যাত্রাপথের নিঃসঙ্গতার মধ্যে যদি সাথী এসে জুটে; অনেকের কাছে সে যেন পরম বিত্ত। যাত্রাশেষে ক্ষণিকের সে সাথীর জন্য বুঝি বা বিচ্ছেদ-বেদনাও জাগে।

কিন্তু ইপ্সিত যদি মনের মতো হয়ে আসে, তার চেয়ে আর প্রিয় কে আছে? যার জন্য প্রদীপ জ্বেলে পথ আলো করে রেখেছি, পরম আকাঙ্ক্ষিত সে মানুষটি যদি লগ্ন মেনে নাচদরজায় এসে দাঁড়ায়—হাসিমুখে বলে—"এসেছি"—তাকে কি না ভালবেসে থাকা যায়?

বাঙালীর জীবনে শরৎবাবুর আবির্ভাব আমার মনে এমনি একটি ছবি ফুটিয়ে তুলে। বিয়ের রাত্রে বরের আবির্ভাবের মতো—আবশ্যক, অবশ্যম্ভাবী, প্রিয় এবং প্রার্থিত হলেও এ আগমন আকস্মিক। চাইছি বলেই পাবো, এমন সৌভাগ্য কয়জনের? কিন্তু পাওয়া গেলো!

প্রথম শরৎ-সম্বর্ধনায় তাই আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের উৎসব মিলে একটা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল—প্রশ্ন, সন্ধান আর কৌতূহলের অন্ত নেই—এবং যেদিন জানা গেলো অপরিচিতের বেশে এলেও তাঁর চারপাশে কোনো রহস্য নেই, জটিলতা নেই, আমাদেরই ঘরের মানুষ, বাঙালী—সেদিন মনে-প্রাণে সুখী হয়েছি।

... ...

শরৎবাবুর উদয়ের মধ্যে কোথায় যেন অনিবার্যতা ছিল। তিনি আপন মহিমায় যে আসন অধিকার করেছিলেন বাঙালীর মনে সে

আসন যেন পাতা ছিলো, এই আগমনের অপেক্ষা করে। না এলে যেন চলতো না—অসম্পূর্ণতা থেকে যেতো।

শরৎবাবু এলেন ইংরেজীতে যাকে বলে সাজান রঙ্গমঞ্চে। একশ বৎসর ধরে বাংলায় নব-জীবন-যজ্ঞ চলেছে— বিরাট সব মানুষ বাংলার মাটিতে বিচরণ করছেন—রামমোহন এসেছেন, বঙ্কিম এসেছেন, ভূদেব, মধুসূদন, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—শান্তির মন্ত্র নয়, যীশুর মতো সকলেই এনেছেন নিশিত তরবারি। আত্মবিস্মৃত জাতিকে নবজীবনের দীক্ষা দেবার সে কী মহামহিম আয়োজন! আকাশে বাতাসে বিপ্লবের বাণী, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্রোহের দ্যোতনা। বাঙালী ভয় পেয়েছে, অভিমান করেছে, দ্বন্দ্ব করেছে - কিন্তু বিরাট আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেনি—অপ্রস্তুত সুপ্তিমগ্ন গ্রামে বন্যার অতর্কিত আক্রমণের মতো এসেছে বিরোধী ভাবের প্লাবন। ভাবালুতার অন্ধকারে শত্রু মিত্র নির্ণয় হয়তো কঠিন হয়েছে—পথ ভুল করেছে, কিন্তু বাঙালী যুদ্ধবিরতির সাদা পতাকা হাতে নিতে লজ্জা পেয়েছে। সে এক অপূর্ব কাহিনী—বাঙালীর বিচিত্র ইতিহাসে সে এক নব পর্যায়।

প্লাবনের শেষে পলির মতো ভাব—দ্বন্দ্বের বিরতিতে দেখা গেলো জাতি লাভ করেছে নতুন মতি, নতুন গতি, নব নিষ্ঠা ও অভিনব দৃষ্টি —এবং সবচেয়ে নতুন যে এই পরম প্রাপ্তিকে ব্যক্ত করবার মতো সে পেয়েছে শক্তিমতী বাণী। 'আবার মানুষ হবার' আশা নিয়ে জাতির অগ্রসবের কাহিনী হয়তো অনেকের কাছে অপরিচিত নয়।

কিন্তু বিরাটের জয়-তিলক আঁকা এই বীরের ভিড়ে সাধারণ বাঙালী যেন অস্বস্তি বোধ করছিলো। বাংলার সে যুগের এই অসামান্য মানুষগুলি যেন পর্বতশিখরের মতো দুরধিগম্যতার মহিমায় আসীন। নাগরিক জীবনে মানুষ মানুষকে জানতে পায় না, জানবার চেষ্টাও করে না। এই না-জেনে থাকায় সে অভ্যস্ত। গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব অপরিচয়ের অপূর্ণতা মানুষকে পীড়া দেয়।

পরিচয়ের বা আয়ত্তের অতীত লোক যে থাকে তাকে নিয়ে অনাগরিকের অস্বস্তির আর সীমা নেই।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক এমনি একটি অস্বস্তি বাঙালীকে ক্ষুব্ধ করেছিল দুরূহ ভাষা, দুরারোহ ভাব-শিখর এবং সুদুর্লভ সঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে অনেকদিন তাদের কাছে পর করে রেখেছিলো।

সান্নিধ্যলোভী বাঙালী তাই এমন একটি মানুষের আশায় মনে আসন সাজিয়ে বসে ছিলো—বাইরের হলেও যিনি ঘরের বলে উৎসব করা যায়। "দাদা" বলে এক ছুটে কাছে যাওয়া যাবে, হাসিমুখে কথা কইতে বাধবে না এবং ভেবে কথা বলতে হবে না—তবে না আপন?

এ হেন সময়ে এলেন শরৎচন্দ্র—প্রার্থিত এ আবির্ভাব—এমন আপন করে অসামান্যকে বাঙালী কোনোদিন তার চণ্ডীমণ্ডপে পায়নি। যতটা আশা ছিলো, শরৎচন্দ্র নিঃশেষে তা পূরণ করেছেন এবং কৃতার্থতার নির্বাধ আনন্দে জাতি তাকে আদর করেছে।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের একটি বিশেষত্ব যে তা আকস্মিক। ছোট-বড় ভালো-মন্দ রচনার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে জানতে হয়নি। তিনি এলেন সাজানো রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ সজ্জায় প্রস্তুত ভূমিকায়।

"মন্দির", "বড়দিদি" হয়তো সাধারণ বাঙালী পাঠকের অন্যমনস্ক দৃষ্টি এড়িয়েছে, কিন্তু "বিন্দুর ছেলে", 'রামের সুমতি" প্রমুখ রচনাবলী থেকেই জাতির শিক্ষিত দলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়ের সূত্রপাত। বাণী সেবার বলিষ্ঠ নিষ্ঠায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, অপূর্ব প্রকাশ-কৌশলে তিনি যেন সামান্য কালের মধ্যেই চিরপরিচিত হয়ে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য নিতান্ত অল্প —বেশী করে হিসাব করলেও তা ঘণ্টাদশেক হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পড়ার ঘরে প্রথম পরিচয়ের চিত্রটি আজও আমার মনে অম্লান।

সেদিন শরৎবাবু সঙ্গে এনেছিলেন গ্রামের গন্ধ। তাঁর দৃষ্টির, ভাষার ও ব্যবহারের ঋজুতায় ছিল গ্রাম-জীবনের আন্তরিকতা।

সে সন্ধ্যায় আবেষ্টনের মধ্যে শরৎবাবুকে খাপ খাওয়ান মুশকিল, অথচ বুঝতে দেরি হয় না যে তার মধ্যে 'কায়দা' ছিলো না। যদি কোথাও originality থাকে, সে তাঁর sincerityর রূপভেদ মাত্র।

প্রত্যেক মানুষের একটি বিশিষ্ট গতি আছে—গতির নিয়মে ছন্দ মেনে চলার মধ্যেই যেন জীবনের সার্থকতা। ছন্দচ্যুতির মধ্যে থাকে পরিণতিহীনতার দ্যোতনা। আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের ছন্দ ছিল এই আন্তরিকতায়।

মুখোশ পরে বিরাটের অভিনয় করবার যার সাধ সে শুধু বিদ্রূপ কুড়োয় - মানুষের যদি কোনো সাধনা থাকে সে কেবল আপন হবার। আপনাকে অতিক্রম করবার কল্পনা, পৃথিবীর বাইরে যাবার ইচ্ছার মতোই অসার, হাস্যকর।

যে সকল রচনায় শরৎচন্দ্র 'দেশের দুলাল', তার মধ্যে তাঁর এই আন্তরিকতা সরল ও সবল আবেগে রূপায়িত হয়েছে। বোধ ও দৃষ্টি এত পরিচ্ছন্ন যে অনায়াসে চিহ্নমাত্র নেই। বিরাট বোধের জটিলতা-হীন রচনাবলী বাঙালী পাঠককে সেদিন অপূর্ব তৃপ্তি দিয়েছিল। অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়ের "দুর্বোধ্য" রসগ্রহণ চেষ্টার ক্লেশ থেকে শরৎচন্দ্র তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

অতি সান্নিধ্যের ফলে যা ছিলো নগণ্য, অতি পরিচয়ে যা ছিলো অবহেলিত—তার সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের আবেশ শরৎচন্দ্রের রচনায় যে লীলায় প্রস্ফুটিত, তেমন আর কোনোদিন বাংলায় হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথা, বাংলার ঘরের কথা, কিন্তু সে ঘরে থাকে পুরন্দর আর শ্রীগোরা আর বিনোদিনী—ইন্দ্রনাথের বা "দিদি"র সেখানে যাবার সাহস হ'তো কি ? বিশেষ নয়, কুলি বাঙালী নির্বিশেষে যে ঘর আশ্রয় করে আছে শরৎচন্দ্র তাদের কথাই বলতে চেয়েছিলেন—বাঙালীকে শরৎবাবু দিয়েছেন তার আশার অতিরিক্ত—কিন্তু মনে হয় তার অপেক্ষা এবং তার সাধ যে তিনি পূরণ করেছেন, এতেই বাঙালী চিরকৃতজ্ঞ, চিরকৃতার্থ।

শরৎ-স্মৃতিমাল্য কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস। শরৎচন্দ্র তখন থাকতেন পানিত্রাসে। তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ি তখনো তৈরী হচ্ছে। হুগলী জেলা সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হবার অনুরোধ নিয়ে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। অনেকদিন তিনি কোনো সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেননি। মনে ভয় ছিল, আমাদের অনুরোধ হয়তো তিনি রাখবেন না। তাই ক্ষুদ্রজনের উচ্চ অনুরোধের সুদৃঢ় রক্ষাকবচ হিসাবে 'বিচিত্র'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সঙ্গী। মনে মনে ভয় থাকলেও ভরসা ছিলো, বাতপঙ্গু মামার এই কষ্টস্বীকার দেখে শরৎচন্দ্র হয়তো আমাদের উপেক্ষা করতে পারবেন না।

দেউলটি স্টেশনে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই শরৎচন্দ্র যে গ্রামের লোকদের কত প্রিয় তার পরিচয় পাওয়া গেলো। শরৎবাবুর বাড়ি কোন পথে যাব জিজ্ঞেস করতেই কয়েকটি লোক উপযাচক হয়ে আমাদের সঙ্গে এসে খানিকটা এগিয়ে দিলেন। দু-একটা কথাবার্তার পর একজন তাঁর পরিচয় দেবার ছলে বললেন, আমাদের গ্রামের জন্যে তিনি কত করেছেন মশাই! স্কুল, রাস্তা, কত কি! একান্ত ভালবাসার পাত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরে যে শ্রদ্ধা এবং মুখে যে হাসির উদ্ভাস দেখা যায় তা-ই ছিলো এই লোকটির।

মাঠের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা এবং বাঁধের উপরকার ধূলিভরা উঁচু-নীচু পথ পেরিয়ে পাড়ার ভিতরকার দু-একটি ভাঙা-ভাঙা জটিল রাস্তা শেষ করে পৌঁছলুম শরৎচন্দ্রের বাড়ি। বাড়িটা একেবারে রূপনারায়ণের উপর। সামনেই স্বচ্ছ অল্পবিক্ষুব্ধ নদ। ভাগীরথী-তীরের লোক আমরা নদীর অত রূপালী জল দেখিনি।

পাশে একটি বারান্দায় শরৎচন্দ্রের বসবার আসন। বারান্দার সামনে নদীর দিকে একটি ছোট ঘর—এদিকে ওদিকে কয়েকখানি ইংরেজী বই আর কাগজপত্র, লেখার সরঞ্জাম। বসবার আসনের ঠিক সামনে ছোট্ট একহারা একটি জানালা, তার ভিতর দিয়ে রূপনারায়ণ হঠাৎ এসে চোখে পড়ে। বাইরে বারান্দায় শরৎচন্দ্রের নিজস্ব দু-তিনটি আসন—আরামচৌকি, লেখার সরঞ্জাম এবং এক-একটি বড় রকমের গড়গড়া। শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বসে লেখাপড়ার কাজ করতে পারেন না, তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর খেয়ালী চঞ্চল মনের পুরো পরিচয় পেলুম যখন তিনি সলজ্জভাবে আমাদের বসবার আসন নির্দেশ করে দিয়ে বারান্দায় খুব তাড়াতাড়ি পায়চারি শুরু করে দিলেন। দেখলুম, তাঁর শীর্ণ মুখের মধ্যে অপরূপ হচ্ছে তাঁর স্নিগ্ধ ভাবময় দৃষ্টি। এর মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নয়, দরদী চিত্তের একটা ভাবনিবিষ্টতা সকল মানুষকেই আকৃষ্ট করে। তাঁর মুখের আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাকের গর্ত দুটি।

কিছুক্ষণ পরে স্থির হয়ে বসলে আলাপ শুরু হ'লো। উপেনবাবুকে বললেন, কিছু একটা মতলব নিয়ে নিশ্চয়ই এসেছ উপীন। উপেনবাবু স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টিকথার ফাঁকে আমাদের আর্জি পেশ করলেন। তিনি সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব শুনে তো চীৎকার করে উঠলেন। ছোট ছেলের মত না-না করতে লাগলেন। সাক্ষাতের প্রথমে যে অসামাজিক ভাব দেখিয়েছিলেন, বুঝলুম, তা তাঁর মনে সলজ্জতা মাত্র; একবার আলাপ শুরু হয়ে গেলে ঘরোয়াভাবে অজস্র কথাবার্তা বলে যান। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকী খোসগল্পের চাটনিও মেলে।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে অনেক সমস্যা এসে পড়েছিলো। সব কথার পুরোপুরি পর পর বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। কথাবার্তার মধ্যে মানুষ শরৎচন্দ্রকে যেমন দেখেছিলুম, তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করব। কথাশিল্পের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর—তাঁর গুণ এবং ত্রুটি,

মহিমা এবং দুর্বলতা—দুই নিয়েই তিনি যা তাই। আমাদের দেশে প্রতিভাসম্পন্ন লোকেদের কথা বলতে গিয়ে সাধারণত আমরা ভক্তির প্রাচুর্যে মানুষটিকে নিজেদের কল্পনায় তৈরি করে দেখবার চেষ্টা করি। মহিমা এবং দোষ-ত্রুটি নিয়ে মানুষটির সত্যকার পূর্ণ ছবি সহ্য করার শক্তি আমাদের থাকে না। মিথ্যার মোহ এমনি প্রখর। শরৎচন্দ্রকে আমরা শ্রদ্ধা করি—শরৎচন্দ্র যা ছিলেন তার জন্যই—তিনি যা হলে আরও ভালো লাগতো তার জন্যে নয়।

সভাপতি হতে রাজী হয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, দেখো, তোমাদের এই সব বড় বড় সভা আমার মোটে ভালো লাগে না। সভাপতিত্ব করতে গিয়ে দেখছি, ক' ঘণ্টা বসে রইলুম, না হ'লো গ্রামের পাঁচ-জনের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ, না কারো সঙ্গে মেলামেশা। সভা করে দশটা প্রবন্ধ পড়ার কোনো সার্থকতা বুঝি না। শ্রোতাদের মধ্যে খুব কম লোকেই শোনে। তার চেয়ে ছোটখাটো বৈঠক কর, যাব, দশজনের সঙ্গে গল্প করবো, আলাপ-পরিচয় হবে—বেশ ভালো লাগবে।

কথা হতে-হতে শরৎচন্দ্র হঠাৎ হাঁক দিয়ে বললেন—ওরে, তামাক দে না। কয়েক মুহূর্ত পরেই 'পুরাতন ভৃত্যের' মতো অম্লান বদনে তাঁর খাস চাকর এসে একটা মস্ত বড় কল্কে গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে গেল। তিনি চেয়ারে শুয়ে পড়ে বেশ আরামে টানতে লাগলেন। আমরা জানালুম, আমাদের সভায় রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধ পাঠাবেন, প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেন। তিনি শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, কবি শুনেছেন যে আমি সভাপতি হব? তাঁর গলার স্বরে বেদনার অস্পষ্ট সুর বাজল। উপেনবাবু হেসে বললেন, কবির বিরুদ্ধে কিছু ব'লো না হে, এরা ভক্তদের এক মহাপাণ্ডা। তারপর গম্ভীর হয়ে মূল কথাটায় ফিরে এলেন, দেখো শরৎ, কবির ওপর তুমি অভিমান করে ভুল বুঝো। কবি তোমাকে খুব স্নেহ করেন।

—আমারো কি তাঁর প্রতি ভক্তি কিছু কম! জবাব এলো—

বার বার তো বলি, তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক পেয়েছি। ওঁর সাহিত্যের যে তুলনা হয় না আমাদের দেশে। অবাক হয়ে ভাবি, এত বড় প্রতিভা এদেশে জন্মালো কি করে! তাঁর কাছে আমরা যে কিছুই নই।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাবার কথা উঠল। জিগ্‌গেস করলুম—তিনিও কি লিখতেন, না আপনার এই প্রতিভা সম্পূর্ণ আপনার নিজের থেকে পাওয়া?

শরৎচন্দ্র বললেন, আমার বাবাও খুব উপন্যাস লিখতেন; আমাদের বাড়িতে একটা পুরানো ভাঙা সিন্দুকভর্তি তাঁর ছেঁড়া খাতাপত্তর ছিলো। ছেলেবয়েসে চুরি করে সেগুলো খুব পড়তুম। বাবা খুব লিখতেন কিন্তু তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো. তিনি কোনোখানা শেষ করতে পারতেন না। মাঝপথেই তাঁর উপন্যাসগুলো থেমে পড়ত। জিগ্‌গেস করলুম, সে সব খাতাপত্তর আর কিছু নেই আপনার কাছে?

—না, অনেকদিন ছিলো। তারপর কেমন করে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেলো। এককালে খুব পড়তুম সেগুলো। মনে আছে, পড়তে পড়তে কতদিন রাত্ত কেটে যেতো।

গল্প করতে করতে শরৎচন্দ্র হঠাৎ আলবলার সংশ্রব ছেড়ে জোরে দাঁড়িয়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি শুরু করে দিলেন। আমার বন্ধু 'পথের দাবী'র ডাক্তারের কথা তুলে প্রশ্ন করলেন—একটুও চরিত্রটা অস্বাভাবিক হয়নি—ওরকম চরিত্র আমাদের সংসারে কি সম্ভব?

জবাব এলো, খুবই সম্ভব। বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশেছি, দেখেচি ওরকম চরিত্র। অপরে সম্ভব নয় বললেই মেনে নেবো! দেখো, ছেলেবয়েসে আমার একজন মাস্টার ছিলেন। আমাকে তিনি ভালবাসতেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে কোনো যোগ ছিলো না। যখন সবেমাত্র আমার দু-একখানা লেখা কাগজে বেরুচ্ছে, এমন সময়

একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি উপদেশ হিসেবে সেদিন একটা দামী কথা বলেছিলেন, শরৎ, একটা কথা মনে রেখো। যা দেখনি সে সম্বন্ধে কখনো যেন লিখো না। কথাটা আমি খুব মানি। যে জীবন আমি দেখিনি সে সম্বন্ধে আমি মোটেই লিখি না। এ বিষয়ে আমি খুব সিন্‌সিয়ার। সাহিত্যে ফাঁকি চলে না। কথাটা ঘুরে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলো। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, অতি-আধুনিকদের তো তাই বলি, তোমরা যে জীবন দেখেছো তার কথা লেখো। অপর দেশে যা মনের তাগিদে হচ্ছে তাকে অনুসরণ করতে গেলে এর মূল্য কখনো স্থায়ী হবে না। তখন অতি আধুনিকদের সৃষ্টির দিকে সবেমাত্র জনসাধারণের পুরোপুরি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলুম, কারণ তিনি নিজে একদিন সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতি বিতর্ক উপলক্ষে অতি আধুনিকদের সাহিত্যকে সমর্থন করেছিলেন।

ক্রমে কথাশিল্পীর প্রিয় প্রসঙ্গে আমরা এসে হাজির হলুম। সমাজে মেয়েদের আসন কি হীনতার মধ্যে—তার কথা তিনি বেশ আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন। মনের সংস্কার আমাদের কত নীচেয় বেঁধে রেখে দিয়েছে—সে কথা বলতে শরৎচন্দ্রের অন্তরের বিদ্রোহী গর্জে উঠলেন। হিন্দুসমাজে ঘরে বাইরে নারী-নির্যাতনের বিষয় থেকে ক্রমে মুসলমানের হাতে নারী-নির্যাতন প্রসঙ্গে এসে পড়লেন। দেখলুম মেয়েদের ওপর তিলমাত্র অত্যাচার পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারেন না। ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর থেকে জলখাবার এসে হাজির হ'লো। শরৎচন্দ্র বিনীতভাবে এবং সস্নেহে বার বার খাবার অনুরোধ করলেন। খেতে খেতে উপেনবাবু জিগ্‌গেস করলেন, তাঁর কলকাতার বাড়ি কতদূর এগোল। তিনি যা জবাব দিলেন তাতে বুঝলুম, কলকাতায় থাকার পক্ষপাতী তিনি নন। বললেন, আমায় সকলে মিলে ওখানে বাড়ি করাবে। আমার ইচ্ছে ছিলো কলকাতার আশেপাশে গঙ্গার ধারে একখানা ছোটখাটো বাড়ি করে থাকব। হ্যাঁ হে, তোমাদের

দেশ কি রকম? জবাব দিলুম, শুনেছি অনেকদিন আগে কোন্নগরে খুব ম্যালেরিয়া হ'তো। এখন তো তার কোনো পরিচয় পাই না।

শরৎচন্দ্র বললেন, ইচ্ছে ছিলো তোমাদের দেশের দিকে বাড়ি করি। গঙ্গার ধারে ভালো জমি পাওয়া যায়? দেখো, তাহলে না হয় নতুন বাড়িখানা দিই বিক্রি করে।

আমি কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে জিগ্‌গেস করলুম, পানিত্রাস কি রকম জায়গা, এখানে ম্যালেরিয়া নেই?

তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, উপীন, তুমি সে গল্প কাননকে করনি। আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, তাঁর বয়েস প্রায় সত্তর। তাঁকে পানিত্রাসের স্বাস্থ্যের কথা কেউ জিগ্‌গেস করলে জবাব দেন, আর কেন বলেন মশাই, এই বুড়ো বয়সেও খোলা জায়গায় নিশ্চিন্তে একটু তামাক খেতে পাই না।

কথাটার মধ্যে কোথায় হাসি তা ধরতে পারিনি বুঝতে পেরে উপেনবাবু ব্যাখ্যা করে দিলেন, পাড়াগাঁয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে তামাক খেতে নেই। শরতের ভগ্নীপতির চেয়েও বড় এত বুড়ো এখানে আছেন যে তাঁর তামাক খাওয়ার নিয়ত ব্যাঘাত হয়—এমন ভালো স্বাস্থ্য এখানকার। ব্যাখ্যা শুনে আমরা খুব হাসতে লাগলুম।

জলখাওয়া শেষ হলে তিনি আমাদের নিয়ে বাড়ি দেখাতে লাগলেন। ক্রমে আমরা তাঁর বাগানের শেষে একেবারে রূপনারায়ণের তীরে এসে দাঁড়ালুম। সেখানে শরৎচন্দ্রের ছোট ভাইয়ের সমাধির উপর সাদা পাথরের বেদী আছে। রূপনারায়ণের সাদা স্বচ্ছ স্রোতের তীরে জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো। তারিফ করতেই শরৎচন্দ্র বেশ সংযতভাবে বলতে লাগলেন—কিন্তু কণ্ঠে আবেগের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলো: যখন ইচ্ছে হয় এই নির্জন জায়গাটায় এসে বসি, মনটা শান্ত হয়ে আসে।

বারবার দেখেছি পৃথিবীতে এক-একটা এমন জায়গা থাকে যেখানে এলে মনটা আপনা থেকেই গভীর তলে তলিয়ে যায়।

এইখানে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। উপেনবাবুরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। তখন দুপুরবেলা। রূপনারায়ণের ছোট ছোট ঢেউ ছুঁয়ে ঝিরঝিরে বাতাস বইছিলো। আমি ভাবতে লাগলুম শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আজ আমার কি ধারণা হলো। মনে হতে লাগলো, মানুষ কত না ভুল করে। কথাশিল্পী যে আমাদের দেশের সমস্যা নিয়ে এতো ভাবেন তা তাঁর সাহিত্য পড়ে মোটেই মনে হয় না। শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে যে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তাঁর মনের গড়ন বিশ্লেষণিক এবং বুদ্ধিপ্রধান নয়। শরৎ-সাহিত্যে সমস্যা হিসাবে সমস্যা বিশেষ নেই—সমস্যার অপরূপ চিত্র আছে মাত্র। তাঁর সৃষ্ট নরনারী প্রধানতঃ বুদ্ধিপ্রবণ নয়—হৃদয়াবেগপ্রবণ। শরৎ-সাহিত্যে intellectual note-এর খুবই অভাব। অথচ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি ঘণ্টা-কয়েক আলোচনা করে মনে হ'লো, তিনি কতই না ভাবেন—কত সমস্যা—সমস্যা হিসাবে নিয়ত তাঁর মনকে চঞ্চল করে তুলছে ফেরার পথে পুনরায় ভাবতে লাগলুম। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে দূরে এসে একে একে তাঁর কথা এবং যুক্তিগুলো স্মরণ করতে শুরু করলুম। বিচার করে দেখতে দেখতে নিজের ভুল স্পষ্ট হয়ে এলো। বুঝতে পারলুম, আমার আগেকার ধারণাই সত্যি। শরৎচন্দ্র হচ্চেন "that order of minds to whom the analysing logical discoursing intellect tells little or nothing; sense, passion and imagination are the avenues by which such mines attain to truth." মনে পড়ল, সমাজে নারী সমস্যা, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যা আলোচনা হ'লো কোনো সমস্যাটিকেই তর্কের আকারে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি বিচার করলেন না। সহজবোধ, হৃদয়াবেগ এবং কল্পনা দিয়ে তিনি যা উপলব্ধি করেচেন তাই আবেগের সঙ্গে বললেন। মনে হ'লো, কথাবার্তার সময় তিনি খুব ভেবেচিন্তে কথা বলেন না—

কথা এত তাড়াতাড়ি আবেগের সঙ্গে অনর্গল আপন খেয়ালে বলেন যে মনে হয় যেন কথাটা বলে ফেললেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনে এই বৈশিষ্ট্য যাঁদের চোখে পড়েনি, তাঁরাই ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন, তিনি একজন ভয়ঙ্কর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কিংবা এই ধারণা অতি আধুনিক সাহিত্য-বিচারকের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় শরৎ-সাহিত্যে সমস্যার সমাধান নেই।

প্রথম সাক্ষাতের পর শরৎচন্দ্রের কাছে আরো অনেকবার গেছি। প্রতিবারেই প্রথমবারের ধারণা দৃঢ় হয়েছে মাত্র। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বিষয়ে দুটি জিনিস খুব চোখে পড়ত। তাঁর ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য ছিলো না—প্রথমদিকে যে মানুষটিকে দেখেছিলুম, অন্যান্য দিনে কম বেশি সেই একই মানুষকে দেখেচি। তাঁর ধারণা, মনের স্বাভাবিক আগ্রহ তাঁর প্রিয়বস্তু ও বিষয় কি কি—এসব বিষয়ে প্রথম দিনে কোনোদিকে যা ধারণা হয়েছিলো—ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণাই অপরিবর্তিত আছে, থাকে—কেবল তা আরো নিবিড় হয়েছে মাত্র। শরৎচন্দ্রের মধ্যে নিত্য নূতনত্ব ছিলো না। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে চমকপ্রদ কিছু পাওয়া যেতো না। তা মানুষকে কাছে টানত—আপন মহিমায় অভিভূত করে দিতো না। তাঁর শক্তির ঝলকানি মনে তীব্র অনুভূতি সঞ্চারিত করে আমাদের ধাঁধিয়ে দিতো না। মনে হয়, তাঁর প্রতিভার মধ্যে গভীরতা ছিলো—সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতি ছিলো না।

রসচক্রের ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্রকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মানুষ হিসাবে তাঁর অনেক গুণ ছিলো। সে সব কথা অন্যত্র বলেছি, সুতরাং এখানে তাঁর আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। আজ কেবল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার ফলে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ভিতরকার যে একটি গোপন কথা জানতে পেরেছি তারই সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবো।

শরৎচন্দ্র রসচক্রে এলেই আমরা তাঁকে ঘিরে বসতাম. আর তিনি তাঁর বিচিত্র জীবনের ছোটখাটো নানা ঘটনার কথা আমাদের শোনাতেন। সে সব কথা শুনে আমরা সত্যই অবাক হয়ে যেতাম; আর মনে মনে ভাবতাম, কত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের নরনারীর সঙ্গে তিনি মিশেছেন। তাদের সমাজ, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ধ্যানধারণা, বাসনা-কামনার সঙ্গে কী ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর পরিচয় হয়েছে! এইখানেই শরৎ-প্রতিভার ভিত্তিমূল।

শরৎচন্দ্র আধুনিক যুগের কথাশিল্পী। সুতরাং নিছক গল্প শুনে তিনি ক্ষান্ত হতে পারেননি। সেই সঙ্গে মানব-মনের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন রহস্য, আমাদের সমাজ জীবনের বহু জটিল সমস্যা, আমাদের নীতিবোধের চিরাচরিত গতানুগতিক আদর্শ সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসাবাদের তিনি অবতারণা করেছেন। এ ব্যাপার আজকালকার যুগে কিছু নতুন নয়।—প্রত্যেক সভ্যজাতির আধুনিক কথা-সাহিত্য এই পথেই চলেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই জটিল আঁকাবাঁকা পথে চলতে গিয়ে বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্য কতকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।—সে তার আসল গন্তব্য পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছে। তার ফলে আজকাল যে সকল সমস্যামূলক মনস্তত্ত্বমূলক কথা-সাহিত্যের

সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে কোন জিনিসেরই অভাব নেই, অভাব যা কেবল আসল জিনিসের অর্থাৎ গল্পের। শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে কিন্তু এ দুর্ঘটনা ঘটতে বড় একটা দেখা যায়নি। তিনি যত সমস্যাই তুলুন না কেন, যত নতুন জিজ্ঞাসার অবতারণাই করুন না কেন, তাঁর কথা-সাহিত্যে গল্পের অভাব হয়েছে একথা তাঁর অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না। আমরা অবশ্য তাঁর শেষ জীবনের লেখা দু-একটি গ্রন্থকে বাদ দিয়েই একথা বলছি।

তাঁর অতি বড় সমস্যামূলক উপন্যাসগুলিও যে গল্পের দিক থেকে আমাদের এতটুকু বঞ্চিত করেনি একথা তাঁর অতি বড় তার্কিক পাঠকও স্বীকার করবে। এই জন্যেই দেখা যায়, যাঁরা তাঁর নতুন নৈতিক ধারণাগুলিকে আদৌ সমর্থন করেন না অথবা নতুন বা পুরাতন কোন নৈতিক আদর্শ নিয়েই যাঁরা মাথা ঘামাতে চান না কিংবা অত শত বিচার-তর্ক করে উপন্যাস পড়বার মত শিক্ষাদীক্ষাও যাঁদের নেই— তাঁরাও তাঁর লেখা পড়ে প্রচুর আনন্দলাভ করেছেন। বলা বাহুল্য, সে আনন্দ নিছক গল্প পড়ার আনন্দ।

এ জিনিসটি শরৎচন্দ্রের লেখায় হয় কেন এবং আর পাঁচজনের লেখাতেই বা হয় না কেন, সেইটেই এখন খুঁজে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক যুগের আর পাঁচজন কথা-শিল্পীর মনের ধাতটারই একটু তফাৎ আছে। আর পাঁচজন কথা-শিল্পী যুগধর্মের প্রভাবেই হোক বা বর্তমান শিক্ষাদীক্ষার ফলেই হোক, অথবা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ পড়েই হোক—আধুনিক যুগের এই সকল নতুন সমস্যা মনের মধ্যে বাইরে থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। এ জিনিসগুলো তাঁদের কাছে শরীরী হয়ে আসেনি, এসেছে অশরীরী চিন্তারূপে। তারপর এই অশরীরী চিন্তাগুলোকে তাঁরা রূপ দিতে চেয়েছেন গল্পের সাজানো ঘটনার ভিতর দিয়ে। আর শরৎচন্দ্রের মনে মানুষের বিচিত্র জীবন তার বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন

স্তর, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এসে সেখানে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং সেই আলোড়নের ফলে তাঁর চিত্তে জেগে উঠেছে নানা চিন্তা, নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা। আর পাঁচজন লেখক তাঁদের নতুন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নগুলিকে রূপ দিতে গিয়ে মানুষের জীবনকে আশ্রয় করেছেন, আর শরৎচন্দ্র মানুষের জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফোটাতে গিয়ে বহু প্রশ্ন, বহু জিজ্ঞাসা আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন। তাই আর পাঁচজনের লেখায় জীবন অপেক্ষা সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে, আর শরৎচন্দ্রের লেখায় সমস্যা অপেক্ষা জীবন অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই আর পাঁচজনের লেখায় গল্পের এত অভাব, আর শরৎচন্দ্রের লেখায় গল্পের এত প্রাচুর্য।

শরৎচন্দ্র শুধু আমার আত্মীয়ই (ভাগিনেয়) ছিলেন না, তিনি আমার আবাল্য সুহৃদ্ ছিলেন। সম্পর্কের হিসাবে আমি তাঁর গুরুজন ছিলাম, বয়সের হিসাবে তিনি আমার চেয়ে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন ; এই উভয় হিসাবের মধ্যবর্তিতায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছিলো। এ'কথা ঠিক একইভাবে আমার খুল্লতাত দাদা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর পরলোকগত অনুজ গিরীন্দ্রনাথ ভায়ার বিষয়েও খাটে।

শুধু তাই নয় আমাদের সাহিত্য-জীবনের তরুণ অবস্থায় শরৎচন্দ্র আমাদের এই তিন ভাইয়ের সাহিত্য বিষয়ে গুরু স্বরূপ ছিলেন। একথা শরৎচন্দ্র নিজেও অনুভব এবং স্বীকার করতেন। রেঙ্গুনে বাস-কালে ১৯১৩ সালের ১০ই মে তিনি আমাকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তাঁর পাণ্ডুলিপি 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে বলেছিলেন, "***তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই, যে-লোক ইচ্ছে করিয়া একটা 'মেসের ঝি'কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম।"

আজ আমি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে কাহিনী লিখতে উদ্যত হয়েছি তা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিনের কথা। বোধকরি সেদিন তাঁর সাহিত্য-জীবন একটি প্রবল গতিবেগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলো। সে আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের কথা, হয়তো ইংরাজী ১৯১২ সালের কথাই হবে। আমি তখন কলিকাতা ভবানীপুরে ৮৫নং কাঁসারীপাড়ায় বাস করি। এই বাড়ি থেকেই কিছুকাল পূর্বে শরৎচন্দ্র ৮।৯ মাস বাস করবার পর রেঙ্গুন গমন করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরে দেখি আমার অনুপস্থিতিকালে শরৎচন্দ্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এসে একটি চিঠি লিখে ফিরে গেছেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি, একজন ভৃত্যের হাতে লিখে দিয়ে গেছেন: "প্রিয় উপেন, আমি কয়েকদিন হ'ল বর্মা থেকে কলকাতায় এসেছি। তোমার সহিত দেখা করতে এসে দেখা পেলাম না। আর একদিন আসব। ইতি, তোমার শরৎ।"

চিঠি পড়ে আনন্দিতও যেমন হলাম, দুঃখিত এবং বিরক্তও তেমনি হলাম। শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হবে সেজন্য আনন্দিত হলাম, কিন্তু কেমন করে যে হবে সে কথার দুশ্চিন্তায় দুঃখিত এবং বিরক্ত হলাম। চিঠিতে না আছে ঠিকানা না আছে পুনরায় আগমনের দিন এবং সময়ের নির্দেশ। অনুসন্ধানের ফলে অবগত হলাম আর কাহারো সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেননি। যা হোক, ভৃত্যদের এবং আত্মীয়-স্বজনকে বলে রাখলাম এবার আমার অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র আগমন করলে যেন তাঁর কলকাতার ঠিকানা জেনে রাখা হয়। কিন্তু এ নির্দেশেও ফল পাওয়া গেল না। আর একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ঠিক পূর্বের মতো আর একখানি শরৎচন্দ্রের চিঠি পেলাম। বাড়ির একটি ছোট ছেলের হাতে লিখে দিয়ে ফিরে গেছেন। চিঠিটা এইরূপ: "প্রিয় উপেন, আজও আসিয়া তোমার দেখা পাইলাম না। শীঘ্রই বর্মায় ফিরিয়া যাইব। বোধ করি এ যাত্রায় আর দেখা হইল না। ইতি, তোমার শরৎ।"

এবার বিরক্তি সপ্তমে উঠল। আশ্চর্য লোক যা হোক! এই খেয়ালী অন্যমনস্ক মানুষটির চিরদিনই কি একরূপে কাটল! দেখা তো হ'লো না, কিন্তু দেখা হবার সুযোগ না দিলে দেখা হয় কেমন করে? চিঠিতে কলকাতার ঠিকানাটা উল্লেখ করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো? কিন্তু শরৎ কলকাতায় এসেছেন অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, একথা কল্পনাই করতে পারিনে। কি উপায় করা যায় তাই চিন্তা করতে বসলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল শরতের মেজ ভাই প্রভাসের কথা। সে তখন স্বামী বেদানন্দ, বেলুড় মঠে বাস করে। পরদিনই গেলাম তার কাছে। বললাম, "শরৎ কলকাতায় এসেছে জানিস তো প্রভাস?" প্রভাস বললে, "তা তো জানি, কিন্তু দাদা দু'দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা পাননি।" আমি বললাম, "তোমার দাদার যা বুদ্ধি, দেখা পাবে কেমন করে? না লিখে আসে দেখা করতে যাবার দিন আর সময়,—না লিখে আসে তার ঠিকানা। তুই জানিস তো তার ঠিকানা আমাকে দে।"

প্রভাসের কাছ থেকে শরতের ঠিকানা এবং বাসার অবস্থিতি বুঝে নিয়ে আমি পরদিন হাওড়ায় খুরুট্ রোডের নিকটবর্তী একটি গৃহে উপস্থিত হলাম। শরৎচন্দ্র তখন ক্ষুদ্র একটি কক্ষে বসে নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখছিলেন। চতুর্দিকে কতকগুলি খাতা-পত্র এলোমেলোভাবে ছড়ানো এবং কয়েকটি ফাউন্টেন্‌পেন্ মোটা মাঝারি সরু, বেগুনে এবং কালো কালির, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আমাকে সহসা সেখানে দেখে শরৎচন্দ্র একেবারে চমকে উঠলেন। বললেন, "একি! তুমি কেমন করে এখানে এলে?

আমি বললাম, "কেমন করে এলাম তা পরে বলছি, কিন্তু 'আর একদিন আসবো' লিখে আস অথচ কবে আসবে, কখন আসবে তা লিখে আস না, 'এ যাত্রায় দেখা হল না' লিখে আস অথচ ঠিকানা দিয়ে আস না, এ তোমার কেমন ব্যবহার?"

বলা বাহুল্য, এই বিবাদের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি অবিলম্বেই হয়ে গেলো। দেখলাম, শরৎচন্দ্র সে সময় চরিত্রহীনের অষ্টম কি নবম পরিচ্ছেদ লিখছিলেন। ঘণ্টা দুই কাল কথোপকথনে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় ভবানীপুরে ফিরলাম। উঠবার সময় চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি (প্রথম পরিচ্ছেদ হতে যে পর্যন্ত লেখা হয়েছিল) হস্তগত করে বললাম, 'পরশু দুপুরে এসো, বাড়ি থাকবো। শরৎচন্দ্র বললেন, "আসবো।" বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে আমাকে হাওড়ার ট্রামে তুলে দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

বাড়ি ফিরে তখনি চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিখানি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। খুশীতে মন ভরে উঠল। কিন্তু অদ্ভুত লেখা, কী অপূর্ব প্রকাশ-ভঙ্গি! শরৎচন্দ্র তখনও বাঙালী পাঠক-সমাজে অপরিচিতই। এর পূর্বে তাঁর লেখা "বড়দিদি" ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যিক-মণ্ডলীতে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল বটে কিন্তু দীর্ঘকালের অন্তরাল হেতু সেকথাও অনেকে ভুলে গিয়েছিল। পরদিন সকালেই চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে শ্যামপুকুরে রামধন মিত্রের গলিতে "সাহিত্য পত্রিকা"র সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলাম। সমাজপতি মহাশয় তখনকার দিনে একজন খ্যাতনামা সাহিত্য-জহুরী, এবং তদ্বিষয়ে নির্ভীক এবং অনেক সময়েই তীক্ষ্ণ কটুভাষী সমালোচক। তাঁর প্রশংসাবাণীর প্রত্যাশায় এবং নিন্দা-ভৎর্সনার আতঙ্কে তখনকার লেখকদের মন নিরন্তর চকিত হয়ে থাকত। মনে করলাম, সুরেশবাবুকে দিয়ে যাচাই করে নিলে শরতের লেখার মূল্য বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

উদ্বিগ্ন চিত্তে সমাজপতির হস্তে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বললাম, "এটা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা নতুন আরম্ভ-করা বইয়ের পাণ্ডুলিপি। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, আপনি একবার পড়ে দেখবেন?"

সমাজপতি মহাশয় বললেন, "কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?"

"বড়দিদি"র লেখকের কথা উল্লেখ করলাম। তাঁরও মনে পড়ল। আগ্রহ সহকারে বললেন, "আচ্ছা রেখে যাও, কাল কোনো সময় এসো।"

পরদিন সকালে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, "অদ্ভুত প্রতিভাবান লেখক এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অদ্ভুত লেখা এই চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি! কিন্তু এ গল্প সাহিত্যে প্রকাশিত করতে লোভ যেমন হয় ভয়ও তেমনি হয়। যা হোক, তুমি একে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো।"

সেই দিনই বৈকালে নিয়ে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে প্রত্যাগমন করলাম।

দ্বি-প্রহরে শরৎ আসতেই বললাম, "সমাজপতি মহাশয় তোমাকে ডেকেছেন। চল এখনি বেরিয়ে পড়ি।"

শুনে শরৎচন্দ্রের মুখ আতঙ্কে একেবারে শুকিয়ে গেল; বললেন, "কেন? আমার লেখা সমাজপতিকে দেখিয়েছ না কি?"

বললাম, "দেখিয়েছি।"

মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে শরৎচন্দ্র বললেন, "ভালো করনি উপীন, ভারি ঠোঁটকাটা লোক, কতকগুলো কটুকাটব্য করবে।"

প্রকৃত কথাটা গোপন রেখে আমি বললাম, "দেখাই যাক না, কি তিনি বলেন। আবার যখন লিখতে আরম্ভ করলে তখন নিন্দা প্রশংসার জন্যে প্রস্তুত তো হতেই হবে।"

কোনও প্রকারে শরৎচন্দ্রকে রাজী করে উভয়ে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সমাজপতি কান মলেই দেবেন, না বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়েই দেবেন, শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে তখন এইরকম একটা ভয়। একজন শঙ্কাব্যাকুল মনে, আর একজন কৌতুক-প্রফুল্লচিত্তে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করলাম।

তারপর যে ব্যাপারটা হ'লো সে-কথা মনে করে আজও আমার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রশংসার অজস্র অমৃতবর্ষণে সুরেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের কান এবং প্রাণ পরিপূর্ণ করে দিলেন। সেই অপরিমিত এবং বোধ করি কতকটা অপ্রত্যাশিত প্রশংসার তাড়নায় বিস্ময়ে এবং আনন্দে শরৎচন্দ্রের মুখ একটা অপূর্ব শোভা ধারণ করলে! আমারও মনের মধ্যে আনন্দের পরিসীমা ছিল না। কিছুক্ষণ সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করে নানাপ্রকার কথাবার্তার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

শ্যামপুকুর স্ট্রীট দিয়ে আমরা উভয়ে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে ট্রামের রাস্তায় উপনীত হলাম। সেদিনটা ছিল ভারী বিশ্রী মেঘলা বাদলা

দুর্যোগের দিন। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, হু হু করে হাওয়া বইছে, পথ জলে এবং কাদায় মলিন। আমরা কিন্তু স্বপ্ন-ভঙ্গ হবার আশঙ্কায় জনসঙ্কুল ট্রামে উঠলাম না। একটি ছাতায় কোনও রকমে দু'জনে মাথা গুঁজে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপর দিয়ে উভয়েই ধীর পদক্ষেপে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম। আনন্দের নেশায় মন বুঁদ্ হ'য়ে রয়েছে—কথাবার্তাও সেইজন্য বেশী কিছু হচ্ছিল না।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার কথা, শরৎ যাবেন হাওড়ায়, আমি ভবানীপুরে। কিন্তু কখন যে আমরা অজ্ঞাতসাবে হ্যারিসন রোডেব মোড় পেরিয়ে গেছি তা জানি না, যখন খেয়াল হ'লো দেখলাম, বহুবাজারের মোড়ে এসে উপস্থিত হয়েছি।

শরৎ বললেন, "দেখো উপীন, তোমাদের কথা শুনে, সমাজপতির প্রশংসা শুনে, মনে হচ্ছে আর যদি পাঁচটা বছরও বাঁচতাম তা হলে হয়তো বাঙলাদেশকে কিছু দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু রেঙ্গুনের ডাক্তার বলেছে আমার হার্টের না লাংসের দুরারোগ্য রোগ হয়েছে, আমি বেশী দিন বাঁচবো না। রেঙ্গুন ছেড়ে আমাকে চলে আসতে বলেছে।" আমি বললাম, "তোমার কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি হয়নি. কিন্তু রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এস।"

শরৎচন্দ্র বললেন "সেখানে একশ টাকা মাইনের সরকারী চাকরি করছি, এক রকম চলে যায়। ছেড়ে এলে খাব কি?"

আমি বললাম. "আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে।"

শরৎচন্দ্রকে চাকরি ছাড়িয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসার গৌরব গুরুদাস লাইব্রেরির শ্রদ্ধেয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য।

আমাদের ভবানীপুরের বাড়ির সম্মুখে তখন "যমুনা" কার্যালয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল যমুনার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। আমরা তাঁর কয়েকজন বন্ধু সে সময় যমুনার উন্নতি বিধানে বিশেষরূপে যত্নশীল হয়েছি। যমুনা-চক্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে বেঁধে ফেললাম।

ফণীবাবু তাঁর শ্রদ্ধা, সহৃদয়তা এবং সৌজন্যের গুণে শরৎচন্দ্রকে বশীভূত করলেন। শরৎচন্দ্র যমুনাকে নিয়মিত সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্মায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

তারপর কিরূপে মাসের পর মাস বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হয়ে বর্মা থেকে বঙ্গদেশে রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নারীর মূল্য প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আসতে লাগল, তার ইতিহাস সকলেই জানেন, সুতরাং সে-কথা বিস্তারিতভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজপতি মহাশয়ের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম দর্শনের দিনটি বাঙলা-সাহিত্যের পক্ষে একটি বিশেষ শুভদিন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এত স্থান থাকিতে শরৎচন্দ্র বাজেশিবপুরে কেন আসিলেন, সে কথা তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই। নিকটেই তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ি; বোধ হয় সেই আকর্ষণেই আসিয়া থাকিবেন। মাথায় এক-বাশ চুল, চিবুকে অনতিদীর্ঘ দাড়ি—আসিযাই যখন মুদী শরৎচন্দ্র শীটের দোকানে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি কোনও মুসলমান খরিদ্দার মনে করিয়া সে বলিল—"কি চান?"

"সরু চাল আছে?"

"দাধখানি?"

"না, অন্য দেশী সরু চাল হইলেই চলিবে।"

"মহাশযের নাম?"

"শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

"প্রণাম, বসুন। তামাক খান কি?"

"খুব।"

সেই একদিনেই শরতের সহিত তাঁহার এমন আলাপ জমিয়াছিল যে, রাত্রিকালে দোকানে তাসের আড্ডাতে যোগ দিতেন। শরৎ শীট এখন গর্ব করিয়া বলেন, বাজেশিবপুরে শরৎবাবুর প্রথম পরিচিতগণের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম না হইলেও তাঁহাদিগের একজন।

শরৎচন্দ্র শীটের বা শেটের প্রতি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ শরৎবাবু তাহাকে "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির" হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) একখানি উপহার দিয়াছিলেন। শরৎ তাহা বাঁধাইয়া সযত্নে রক্ষণ করিতেছেন। তাহাতে ইংরেজীতে শরৎবাবুর নামের স্বাক্ষর আছে, যথা—

Sarat Chandra Chatterjee

Calcutta

August, 1914

শরৎ বলেন—"শরৎবাবুর তাস খেলিবার এমন ঝোঁক ছিল যে, কোনো-কোনোদিন অপরাহ্নকালে আসিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাস খেলিতেন। আমরা নিবৃত্ত হইতে চাহিলেও তিনি চাহিতেন না। তিনি মুহুর্মুহু তামাক খাইতেন। বলিতেন—আফিং, চা ও তামাক না খাইলে আমার মাথা খোলে না। এখানে নূতন আসিয়াছি, কাহারও সহিত পরিচয় নাই। কোথায় বসিব, তাই তোমার দোকানেই আসি।" কিন্তু আশ্চর্য এই, একজন মুদীর সঙ্গে যাঁহার আলাপ অত শীঘ্র ও সহজে জমিয়াছিল, পাড়ার লোকের সঙ্গেও তত শীঘ্র ও সহজে তাঁহার আলাপ হয় নাই। শরৎচন্দ্রের চরিত্রে লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি ছিলেন কতকটা shy, লাজুক। অনেক সময় চোখে-চোখে কথা কহিতে পারিতেন না, প্রায়ই মুখ নীচু করিতেন বা অন্যদিকে চাহিয়া কথা কহিতেন। বাজেশিবপুরের গা হইতে পল্লীগ্রামের গন্ধ তখনও যায় নাই, এখনও যে একেবারে গিয়াছে তাহা নহে। কাজেই "নামগোত্রহীন" এই ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাসকারী লোকটির সহিত মিশিবার আগ্রহ পাড়ার লোকের ততটা ছিলো না। তাঁহার উপর তাঁহার সম্বন্ধে পাড়ায় কত গল্প-গুজবের সৃষ্টি হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রকে কোনো বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু কোথাও আহার করিতেন না। শহরের লোকের হয়তো এই প্রথা হইতে পারে, কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকেরা ইহা পছন্দ করিত না।

শরৎচন্দ্র যে বাসায় থাকিতেন, তাহার বৈঠকখানা ঘরটি ছোট, বাহিরের উঠানও খুব বড় নহে। প্রতিবেশী স্বর্গীয় হরিচরণ বা ভূতনাথ মিত্র মহাশয়ের বাহিরের বৈঠকখানার দালানটিতে তিনি প্রায়ই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। ঐ বাড়িতে পরিবার ছিল খুব কম এবং বাড়িটিও ছিল নির্জন, ফাঁকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেই বৈঠকখানার দালানে একখানি বেঞ্চে বসিয়া বা অর্ধশায়িত হইয়া শরৎচন্দ্র গড়গড়া-মুখে কখনও বই পড়িতেন, কখনও বা বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ

করিতেন। অনেক সাহিত্যিকের সহিত হরিচরণবাবুর পরিচয় ছিলো, শরৎবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া সেই পরিচয়ের পরিধি আরও বাড়িয়া যায়। অনেক আধুনিক Continental নভেলও তাঁহার সংগ্রহ ছিল। এই সমস্ত কারণে উভয়ের মধ্যে প্রীতির ভাব জমিয়া উঠিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে শরৎচন্দ্রের বাড়িটি সাহিত্যিকগণের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। বোধ হয় 'বসুমতী'র সতীশবাবুকে পথনির্দেশ করিবার সূত্রে শরৎবাবুর বৈঠকখানায় আমার প্রথম প্রবেশ ঘটিয়াছিল। দেখিলাম, তক্তপোশে অনেক বই এলোমেলো অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পর তাঁহার বাড়িতে অতি অল্পই গিয়াছি, কিন্তু হরিচরণবাবুর বৈঠকখানায় অনেকবার তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। সেখানে সাহিত্যিকের দল খুব বেশী যাইতেন না। আমি নিজেও অপরের সঙ্গে সহজে আলাপ পরিচয় করিতে পারি না, অত বড় সাহিত্যিকদের মজলিশে যাইতে একান্ত কুণ্ঠা বোধ করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে একা পাইলে অনেক কথাবার্তা হইত।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, আমাদের রাস্তার মোড়ে তাঁহার সহিত দেখা হইল। কথাটার আরম্ভ কিরূপে হইয়াছিল মনে নাই। কিন্তু যখন আমাদের বাড়ির সম্মুখে আসিলাম, তখন কথাটা এই দাঁড়াইয়াছে—লোকের বাহির দেখিয়া ভিতরের বিচার করা উচিত নয়।

আমি বললাম—"দেখুন, বাহিরে হয়তো লোক আমাকে ভালো বলিবে, কিন্তু লোকের মনের চিত্রটা যদি বাহির করিয়া দেখাইবার কোন যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে হয়তো আমাকে বিষধর সর্প মনে করিয়া লোক আমার নিকট হইতে দূরে পলাইত।"

শরৎবাবু সে-কথায় সায় দিলেন, বলিলেন—"আমি কী সঙ্গ যে করি নাই, তাহা বলিতে পারি না। সেই সমস্ত সঙ্গের ফলে আমি যে এখনও দাঁড়াইয়া আছি (আমি তাঁহার নিজের কথা কয়টি নরম করিয়া বলিলাম) ইহাই আশ্চর্য!"

আমি তাঁহার অন্তরঙ্গ না হইলেও, তিনি যে এমন বিস্রব্ধভাবে তাঁহার অতীত জীবনের কথা আমাকে বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, লোকটি খাঁটি এবং বোধ হয়, তাঁহার বিশাল হৃদয়ের এক কোণে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি তাঁহার একটু অন্তরের টান আছে।

আর-একদিনের কথা মনে পড়ে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন কমিশনার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে এই ব্যাপার লইয়া শরৎচন্দ্র আলোচনা করিতেছিলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি উল্লিখিত কমিশনারদিগের একজনের সম্বন্ধে এমন একটি অনুদার কথা বলিলেন যে, কি জানি কেন হঠাৎ আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে কয়েকটি কথা শুনাইয়া দিলাম। শরৎবাবু মাথা নীচু করিয়া মৃদুভাবেই উত্তর দিলেন। বাড়িতে আসিয়া বড়ই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলাম। আবার দেখা হইলে কি বলিব ভাবিয়া লজ্জাবোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার পর তাঁহার সহিত যখন আবার দেখা হইল, তখন শরৎচন্দ্রের আচরণে কোনোপ্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। ক্ষণিকের মেঘ যেন কোথায় উবিয়া গিয়াছে : তখন বুঝিলাম, লোকটি কত বড়!

ইহার পর স্থানীয় এক সংঘের উদ্যোগে এক সাহিত্যিক সভার আয়োজন হয়। আমার উপর প্রবন্ধ পড়িবার ভার ছিলো। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, শরৎবাবু সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি প্রায়ই এ কার্যে সম্মত হইতেন না। শরৎবাবুর নামের আকর্ষণে কলিকাতা হইতে অনেক সাহিত্যিক সে সভায় আসিয়াছিলেন। আমার প্রবন্ধটির নাম ছিলো—'নীরব সাহিত্যিকের আত্মকথা।" আধুনিক অনেক লেখকের সম্বন্ধে আমি অনুদার মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভাষা স্থানে স্থানে কঠোর হইয়াছিলো। শরৎচন্দ্র বড় বেশী কথা বলিলেন না ; আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়াও গেলেন না।

সভা-ভঙ্গের পর আমাকে নিভৃতে বলিলেন—"সত্য কথা বলিতেও অত ঝাঁঝ ভালো নয়।'

তাহার পর তাঁহার 'অরক্ষণীয়া'র ভূমিকা লিখি। তখনও তাঁহার বড় গ্রন্থগুলি—যাহা লইয়া কত মতামতের সৃষ্টি হইয়াছে—বাহির হয় নাই। কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার লেখার আমি অনুরক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের সমাজে অনেক গলদ প্রবেশ করিয়াছে। কিরূপে সে সব দূর করা যায়, ইহা লইয়া রক্ষণশীল ও সংস্কারক দলের কলহ এখনও চলিতেছে। সংস্কার প্রায়ই সংহারের নামান্তর হইয়া পড়ে। দেখিলাম, শরৎচন্দ্র সে শ্রেণীর সংস্কারক নহেন। তিনি গায়ে পড়িয়া সংস্কারও করিতে যান নাই। তিনি ছিলেন শিল্পী—চিত্রই আঁকিয়াছেন। যে সমাজে কৈলাস খুড়ো ও বিশ্বেশ্বরী আছেন, সে সমাজের সবই খারাপ নহে। তাহার ভিতরটা খাঁটি আবর্জনার স্তূপ বাহিরে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, এ বিশ্বাস আমারও ছিলো। তাই শরৎচন্দ্রের লেখা আমার ভালো লাগিয়াছিলো। অতি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় যথাশক্তি এই কথা বলিয়াছিলাম। ফলে, শরৎচন্দ্রের ধন্যবাদ লাভ করিয়াছিলাম। এই কথাই 'স্নেহের শাসন' নামে আমার এক উপন্যাসে আলোচনা করিয়াছিলাম।

একদিন শরৎচন্দ্র বলিলেন—"রক্ষণশীল দল বলেন, এখন আমাদের কর্মবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, বাহিরের কিছু যেন ভিতরে প্রবেশ না করে। ইহা কি ঠিক ?"

আমি বলিলাম—"কখনই না। খরগোসের মতো চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কুকুরের হাত এড়ানো যাইবে ?"

তিনি বলিলেন—"আমাদের সমাজের এত অবনতি হইল কেন ?"

আমি বলিলাম—"সে কথা আমিও ভাবি, কিন্তু উত্তর ভাবিয়া পাই না। সমস্যা বড়ই জটিল। বোধহয়, কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে অতি প্রাচীন হইলে স্বতঃই ঘুণ ধরে। কিন্তু এ-কথা তো মানিতেই হইবে যে, হাজার হাজার বৎসরের নির্যাতন, বিপ্লব

অতিক্রম করিয়াও হিন্দুসমাজ এখনও টিকিয়া আছে। বরং মনে হয়, মহাযুদ্ধের পর হিন্দুর culture যেন পাশ্চাত্ত্য দেশে ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছে।"

শরৎচন্দ্র কোনো উত্তর দিলেন না, একমনে ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম নিজের সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদ কত! তিনি উচ্ছৃঙ্খল বালকের মতো দুই হাতে কাদা লইয়া সমাজের গায়ে ছুঁড়িতেন না। তিনি সমাজকে শক্তি-সৌন্দর্যে বিভূষিত দেখিতে চাহিতেন; তাই তিনি ভাবিতেন—সমাজের অবনতি হইল কেন?

শরৎবাবু যত লিখিতেন, তাহার তুলনায় অনেক অধিক ভাবিতেন। একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "লোক বলে, আমার লেখার কাটাকুটি নাই। কথাটা ঠিক নয়, আমি অনেক কাটকুট করি।"

অথচ এ-কথাও সত্য যে, তাঁহার লেখার জন্য লোক বসিয়া থাকিত, যেমন লেখা শেষ হইত, অমনই লইয়া যাইত। তবে কাটিতেন কখন? খুব তাগিদে লেখা না হইলে, হয়তো অনেক কাটাকুটি করিতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি মনে মনে অনেক ভাঙচুর করিতেন। একদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়াছি; দেখি তাঁহার তক্তপোষের উপর 'Damaged Goods' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া আছে। বইগুলি পড়িবার জন্য লইয়া আসিলাম।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—"আজকাল Eugenics-এর অনেক বই পড়ছি।" বোধহয় তাহার পরেই 'শ্রীকান্ত' বাহির হইল। অভয়ার চরিত্র পাঠ করিলে তাঁহার Eugenics পড়ার উদ্দেশ্য বুঝা যায়।

শরৎচন্দ্রের সাধনা এইরূপ ছিলো। তিনি মগের মুলুক হইতে হঠাৎ আসিয়া বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র একদিনে দখল করেন নাই। তিনি নির্জনে অনেক সাধনা করিতেছিলেন। শরৎচন্দ্রের ভাষার মতো এমন অনাবিল, ভাবানুগত ভাষা দেখা যায় না। কি অল্প কথায় কত বড় ভাবের প্রকাশ! কোথায়ও এতটুকু প্রহেলিকা নাই; সাধুভাষার আড়ম্বর নাই; চলতি ভাষা, অথচ অতি-বড় বৈয়াকরণও কোথাও

এতটুকু ব্যাকরণ-দোষ পাইবেন না। কিন্তু এই ভাষাও তিনি অনেক লাভ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে একটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শব্দটি ঠিক মনে নাই তাহার অর্থ বৃষ। আমি বলিতে পারিলাম না, তিনি বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে আছে। এমন শব্দ-সম্পদ আর কোথাও দেখি নাই। বাংলা শিখতে হলে এই বইখানি পড়া খুব দরকার।'

অথচ সাধুভাষার কয়টি শব্দ তাঁহার গ্রন্থে আছে? সাধু-অসাধু সমস্ত সমস্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি এক অপূর্ব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। তিনি ভাষার ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সচ্ছল ও সচ্ছন্দ এই দুই পদের বানান কি?" ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার কান বড় সজাগ ছিলো। কে তাঁহার 'বিন্দুর ছেলে'র ইংরেজী অনুবাদে লিখিয়াছিলেন—Jadab and Madhab were not uternine brothers. তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এ কি ইংরেজী?'

বিলাতের 'টাইমস' সংবাদপত্রের Literary supplement-এ তাঁহার গ্রন্থের সুখ্যাতি বাহির হইয়াছে। তাহার পর তাঁহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সেই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একদিন কথা হইতেছিল।

আমি বলিলাম—"বাঙলা গল্প উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ সাহেব পাঠকের প্রীতিকর হইবে কি না সন্দেহ আছে। ভাবের সার্বজনীনতা সকল দেশের লোককেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু সেই ভাব যদি দেশ-কাল-পাত্র, সামাজিক আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদের অন্তরালে লুকায়িত থাকে, তাহা হইলে অনুবাদে তাহা বিদেশীদের হৃদয়ঙ্গম করান বড কঠিন। বাহিরের আচরণটাই বিদেশীর এমনই অপ্রীতিকর হইবে যে, সে তাহা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিবে না।

ধরুন, আপনার 'অরক্ষণীয়া'র যদি ইংরেজী অনুবাদ হয়, তাহা হইলে 'পোড়া কাঠে'র রূপ ও গোবর-ঘাঁটার গন্ধেই ইংরেজ পাঠক গ্রন্থ ছাড়িয়া পলাইবেন।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—'তা বটে, তবে এণ্ডাস'ন অনুবাদ করিবেন বলিতেছেন, দেখি কি হয়।"

শরৎচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁহার অনুভূতি। তাহাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের কোঠায় উঠিয়াছিলো। তিনি ছিলেন "গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া" ছেলে। গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হইলে সকলেই মানুষ হয় কি না জানি না, কিন্তু শরৎচন্দ্র হইয়াছিলেন। কি শুভক্ষণেই যে দরিদ্রের গৃহে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং কি শুভক্ষণেই যে দর্শনীর টাকা কয়টির অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদাররা তাঁহার মন্দির প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। শিক্ষার পথ সকলের একপ্রকার নহে। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রের শিক্ষার পথ ছিলো না। তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো আরও বিপুল—বিশাল। তথায় তিনি অস্থি-মাংস-মেদ মজ্জা-রক্তে গঠিত সজীব গ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কেহ get up ও প্রচ্ছদপটের সৌন্দর্যে চিত্ত আকৃষ্ট করে, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য; কেহ বাহ্য সৌন্দর্যে পোড়া কাঠ, গায়ে গোবরের গন্ধ কিন্তু ভিতরে শতদলের শোভায় ও সুগন্ধে পরিপূর্ণ; কেহ অশুচিতার ছোয়াচ লাগার ভয়ে সাবধানে সন্তর্পণে জাত বাঁচাইয়া চলে, আবার কেহ বহ্নিমুখবিবক্ষু পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কেহ বার দুই-তিন আইন ফেল করিয়া ব্যবসায়ে বড়দা'র টাকা লোকসান করিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে দেশ-উদ্ধারে রত হয়, আবার কেহ দেশমাতৃকার সেবায় সব্যসাচী হইয়া বসে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি যে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন সে জ্ঞান কেবল জ্ঞানের কোঠাতেই ছিলো, তাহা বিজ্ঞানে অনুভূতিতে পরিণত হইয়াছিল। কয়জনের তাহা হয়?

হয় না বলিয়াই এত কালি-কলমের অপব্যয় হইতেছে। শরৎচন্দ্র electric fan-এর নীচে বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বাঙলাদেশের দুঃখ দৈন্যের কথা লিখেন নাই, বাঙলার দুঃখ দৈন্যের গ্লানি—গ্লানির যে অগ্নিময়ী জ্বালা কত বর্ষ ধরিয়া তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ফুলিয়া কাঁপিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছিলো, তাহাই তাঁহার হৃদয় ছাপাইয়া বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, কোন কুলী-রমণীর প্রতি মর্মন্তুদ অত্যাচারের কাহিনী শুনিতে শুনিতে শরৎচন্দ্র দুই হাতে বুক চাপিয়া অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া বক্তাকে বলিলেন—"থামুন। থামুন। আর শুনতে পারছি না।"

আমরা তো এই সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী কতে পড়ি, কতো শুনি, কিন্তু কয়জনের কানের ভিতর দিয়া তাহা মর্মে প্রবেশ করে? এমন অনুভূতিসম্পন্ন লেখক বাঙলাভাষায় অতি অল্পই আছেন। শরৎচন্দ্র মুসলমান সমাজের চিত্র আঁকিবেন বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন, উর্দু সাহিত্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে হাত দেন নাই। তিনি মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেই যাহা লিখিতেন, তাহা কেতাবী জ্ঞান লইয়াই লিখিতেন, সে সম্বন্ধে অনুভূতি তাঁহার ছিল না—থাকা সম্ভব নহে। তাহার নামগুলি বাদ দিলে হিন্দুসমাজেরই চিত্র হইত। চরিত্রগুণেও মুসলমান নামধারী হিন্দু হইত। প্রমাণ—শ্রীকান্তে গহর-চরিত্র।

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোক অভিযোগ করেন যে, তাঁহার গ্রন্থে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। কালস্রোতে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সেই পরিবর্তনের স্রোতে হাবুডুবু খাইয়াও চোখ বুজিয়া বলেন—কৈ কোথা? সনাতন ধর্মসমাজের পরিবর্তন কি হইতে পারে? উপরের যেটুকু পরিবর্তন, সে কেবল কলিকালের অধর্ম। এই বলিয়া ঝাঁটা দিয়া তাঁহার সেই দুর্নিবার স্রোত ফিরাইয়া দিতে চাহেন।

শরৎচন্দ্র দেখিয়াছিলেন—অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কতকগুলি বিষম সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমাজে যে যুগে বলা হইত, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" সে যুগে, ভালোর জন্যই হউক, আর মন্দের জন্যই হউক—চলিয়া গিয়াছে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দৃষ্টিকোণ বদলাইয়া গিয়াছে। ইহার অনিবার্য ফলে জীবন-মরণ সমস্যার ন্যায় যেসব গুরু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের মীমাংসা না হইলে সমাজ টিকিতে পারিবে না। শরৎচন্দ্র সেই সমস্যাগুলির প্রকট নগ্নমূর্তি সমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন, কোথাও কোথাও সমস্যা-সমাধানের একটু আভাস ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু তিনি সংস্কারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার কথা তিনি কাহাকেও মানিয়া লইতে বলেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন—যাঁহার শক্তি আছে, তিনি এই কার্যে হাত দিন, চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হয়তো কোনো কোনো স্থলে দুই একটা কথা কঠোর হইয়াছে। কিন্তু তাহা না যাইয়া পারে না। সমাজের নিশ্চেষ্টতা, ঔদাসীন্য, অজ্ঞতার ভান দেখিয়া তাঁহার মত অনুভূতিসম্পন্ন লোক একটু চঞ্চল হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? সমাজের প্রতি যে তাঁহার বড়ই মমতা, বড়ই দরদ ছিলো।

তিনি দেখাইয়াছেন, সংসারে মনোরমাও আছে, পার্বতীও আছে, সুরবালাও আছে, কিরণময়ীও আছে। কাহারও পছন্দও নাই অপছন্দও নাই, তাই কেনো কষ্টও ভোগ করিতে হয় না; আবার কাহাকেও তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা চতুর্দিকে ঘিরিয়া দিবারাত্রি পাহারা দিয়া আছেন। ইহাদের জন্য ভাবনা নাই, ইহারা কোনও সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু যে প্রশ্ন করে—"কানা খানায় পড়লে লোক ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়; তার জন্য দুঃখ করে, যার যেমন সাধ্য তার ভালোর চেষ্টা করে, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে যখন গর্ত্তে পড়ে, কেউ তো তুলে ধরতে ছুটে আসে না। বরং আরও তার হাত-পা ভেঙে দিয়ে সেই গর্তে মাটি চাপা দিতে চায়।

যে সত্য মানুষ নিজের প্রচার করে. প্রয়োজনের সময় সে সত্যের কোনো মর্যাদাই রাখে না।" তাহার প্রশ্নের উত্তর কি, শরৎচন্দ্র তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি কাহাকেও ভালবাসার অন্ধ হইতে বলেন নাই। কিন্তু মন দিয়া ভালবাসিতেও বলেন নাই। কিন্তু যাহারা অন্ধ হয়, মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাহাদিগের উপায় কি? ইহাই তো সমস্যা। আমাদিগের প্রেম, প্রীতি, দেশভক্তি সবই ভাসা-ভাসা। তাই বুঝি মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসার কথা শুনিলে আমাদিগের বিস্ময়, ঘৃণা বা ক্রোধের অন্ত থাকে না, ইহাও কি আবার কথা!

সকল সমাজেই একটা convention বা চিরাচরিত প্রথা আছে, ভালর সন্ধান করিতে হইলেই একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিতে হয়। তদ্ভিন্ন অন্যত্র যে ভালো থাকা সম্ভব, তাহা লোক স্বীকার করিতে চাহে না; বরং সেদিকে কাহাকেও যাইতে বা চোখ ফিরাইতে দেখিলে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে। পূর্বেই বলিয়াছি, শরৎচন্দ্র সমাজের সকল স্তরেই মিশিয়াছেন, পদ্মবনেই ভ্রমণ করিয়াছেন, আবার পূতিগন্ধ পঙ্কেও আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াছেন। তাহার ফলে তিনি দেখিয়াছেন, পাঁকেও রত্ন আছে এবং সে রত্ন তুলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেও দোষ নাই। চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী—ইহাদিগের কোথাও অসংযমের একটুও চিহ্ন নাই—বরং ইহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অপার শক্তি পাইয়াছে সাহস পাইয়াছে, চরিত্র রক্ষণ করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতনাংসি ত এক ধীরাঃ।" কী ভীষণ প্রলোভনের মধ্যে ইহারা আত্মরক্ষা করিয়াছে! এক কালে পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহও সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের নিজের দোষ নহে। তাহার পর তাহারা আপনার সঙ্গে কী সংগ্রামই করিয়াছে! সে সংগ্রামের সংবাদ কে জানে? শরৎচন্দ্র জানিতেন, এই সংগ্রামের প্রত্যেকটি ক্ষতচিহ্ন সর্বান্তর্যামীর চরণতলে রক্তপদ্মরূপে ফুটিয়া থাকে। চন্দ্রমুখী ঠিকই বলিয়াছেন—"চঞ্চলঃ এবং অস্থিরচিত্ত

বলিয়া স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়।” শরৎচন্দ্র এ-কথা বিশ্বাস করিতেন। তাই তিনি নারী-পূজক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার গ্রন্থে স্ত্রী-চরিত্র যেমন ফুটিয়াছে, পুরুষ-চরিত্র তেমন নহে। তিনি স্ত্রীজাতির পূজক, তিনি কখন অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে পারেন না তবে নারীজাতির মর্যাদা যে জানে না, সে যেন শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সবগুলিই না পড়ে।

শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তাহার স্থান ও সময় এ নহে। আমি তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহাই বলিলাম।

একদিন সকালে শরৎদা স-গড়গড়া আমাকে খুব সকালে এসে ডাকতে লাগলেন। আমি দোতলা থেকেই বললুম, "এত ব্যস্ততা কিসের?" বললেন, "নেবে এসো বলছি।" গেঞ্জিটা গায়ে দিয়েই নীচে এসে তাঁর সঙ্গে চললুম তাঁর বাড়িতে। পথে যেতে যেতে বললেন, "কবিতা লিখেছি। বললুম "এমন দুঃসাহস কেন করলেন? যাই হোক পরেই দেখতুম।" উত্তর হ'লো, "কবিতা লিখেছি কিন্তু মেলাতে পারিনি তাই তোমাকে দরকার।"

এই রকম কৌতুক করেই তিনি কথা কইতেন মনের সারল্যে, খোলা প্রাণে। কবিদেব প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। কবিতা তিনি খুব পড়তেন তবে রবীন্দ্রনাথের এবং আরও দু-তিনজনের। নাম করবার বাধা আছে। বলতেন, "ত্যাখো যারা মিল করতে পারে তাদের প্রতি আমার ভারি শ্রদ্ধা, কেননা ঐ মিল করা ব্যাপারটা বড়ো শক্ত হে।" একবার খুরুটের এক ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় শরৎদা সভানেতৃত্ব করতে যান। আমরাও ক'জন তাঁর সঙ্গে যাই। প্রতিযোগিতায় বিচার করবার ভার পড়লো শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু, শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা দেবী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও আমার উপর। পুষ্পমালা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কইতে শরৎদা লোকপূর্ণ সভার মাঝখানেই তাঁকে বললেন, "পুষ্প, আমাদেরও একটু ভালবাসা উচিত।" আমি জোর করে বলতে পারি কোনো জনবহুল সভায় উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ্যে এমন কথা আর কেউ বলতে পারবেন না, কারণ এতে হৃদয়ের যে নির্মল সরলতা ও উদার মাধুর্য সূচিত হচ্ছে, তা জগতে দুর্লভ। আর অন্তরের এই সরলতা ও মাধুর্যের গুণেই সকল মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট

হ'তো। কোনো মাসিক পত্রের তাগিদে একদিন বসে গল্প লিখছিলুম। হঠাৎ শরৎদা এসেই প্রশ্ন করলেন "কি লিখছ?" বললুম, "একটা গল্প। তখুনি প্রত্যুত্তরে বললেন, "তোমরা গল্প লিখবে কেন?" আমি ফিরে তার উত্তর দিয়েছিলুম তা অপ্রকাশিত রইলো। কিছুক্ষণ পরে বললেন, "তোমার গল্পের ভাষা যে ভালো হবে, তা আমি জানি। এবং আমার দিক থেকে এই মন্তব্যের কোনো কারণ জিজ্ঞাসিত না হতেই নিজে আবার বললেন, "আমি দেখেছি কবিদের গদ্যের ভাষা হয় খুব চমৎকার।" বাংলার কবিরা এতে গর্ব বোধ করতে পারেন। কবিদের সম্বন্ধে এমন বড়ো ধারণা ছিল তাঁর।

রচনা সম্বন্ধে তাঁর কি আলস্য ছিল তা অনেক সভা-সমিতিতে জলধরদা'র মুখে সকলেই শুনেছেন। তারকেশ্বরে হত্যা দেবার মতো করে জলধরদা শয্যা নিতেন শরৎদার শিবপুরী বাড়ির বৈঠকখানা-ঘরে লেখা আদায় করবার জন্যে। সে ব্যাপার বহুদিন আমার চোখের সামনে আর আমার উপস্থিতিতেই ঘটেছে। সবদিন যে জলধরদার সাধ্য-সাধনা সফল হ'তো, তা নয়। 'গৃহদাহের' শেষ কিস্তির পাণ্ডুলিপি আমিই পৌঁছে দিই "ভারতবর্ষ" কার্যালয়ে। জলধরদা শিবপুরে গিয়েছিলেন তা আদায় করতে, কিন্তু আমাকে দিয়ে কপি পাঠিয়ে দেবেন তাঁকে এই কথা দেন, লেখা নয়। সে কথা তিনি রেখেছিলেন।

সকাল বেলা চা খেতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কতদিন তাঁকে গান গাইতে শুনেছি—বেশ মিষ্টি গলা ছিল তাঁর। "এই করেছ নিঠুর, এই করেছ ভালো," "পথের পথিক করেছ আমারে" রবীন্দ্রনাথের এই গান দুটি বৈষ্ণব পদাবলীর "বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে" নিধুবাবুর "ভালবাসবে বলে" আর গোপাল উড়ের কয়েকটি গান তাঁকে প্রায়ই গাইতে শুনেছি। কীর্তন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। প্রাণ ছিল তাঁর এমনি সরল বৈষ্ণবের মতো। ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখেননি, ছিলেন তবুও তিনি কবি। দরদী ছিলেন তিনি খুব। কত

দীন-দুঃস্থ, অসহায় যে তাঁর আনুকূল্য পাবার জন্যে শিবপুরের বাড়িতে আসতো আর ব্যর্থকাম হয়ে ফিরতো না। কোনোদিন তা জানি এবং নিজের চক্ষে দেখেছি। চোখের জল পড়তে দেখেছি তাঁর মানুষের যন্ত্রণায় আর বিয়োগব্যথায়।

শরৎদার পড়ার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য ছাড়া—হার্বার্ট স্পেন্সারের বই আর হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসার বই। শেষোক্ত দুই বিষয়ে তাঁর খুব অনুশীলন ছিলো। তিনি চিকিৎসা করতেনও ভালো। আমাকে একবার পেটের অসুখে ভুগতে দেখে হাসতে হাসতে প্রথমে ব্যবস্থা দিলেন, "আফিং ধর গিরিজা।" আমি বললুম, "রাজী আছি, যদি তার ফলে 'শ্রীকান্ত' 'চরিত্রহীনের' মতো বই লিখতে পারি।" তারপর যোগ্য ঔষধ দিয়ে আমাকে নিরাময় করলেন। বন্ধুপ্রীতি তাঁর ছিল অসীম, স্নেহাস্পদের মর্যাদা তিনি রাখতেন। একবার কোনো বিশিষ্ট বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা তাঁর বাড়িতে আসে, তাঁকে সভাপতিত্ব করবার নিবেদন জানাতে। শরৎদা তখন কাশীতে—শিবপুরে ছিলেন না। শরৎদার অনুজপ্রতিম কোনো স্নেহাস্পদ বন্ধু সেই সময়ে শরৎদার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'শরৎদা যাবেন ভাববেন না। শরৎদা কাশী থেকে ফিরে আসতে সেই বন্ধুটি বললেন, "আপনাকে অমুক জায়গায় সভাপতিত্ব করতে যেতে হবে, আমি তাদের কথা দিয়েছি।" প্রথমটা শরৎদা বললেন, "তুমি কেন আমাকে বিব্রত করবার ব্যবস্থা করলে? ভারি মুশকিল।" বন্ধু বললেন "বেশ তো, এখনো দেরি আছে তিন-চার দিন তাদের উৎসবের, আপনি যেতে না চান, তাদের বলে আসবো অন্য ব্যবস্থা করতে। শরৎদা তখন বললেন, "তা হয় না, আমাকে যেতেই হবে—তুমি যখন কথা দিয়েছ, সে আমারই কথা দেওয়া হয়েছে। "এমনই মহৎ ছিলেন তিনি।

একবার বড়োদিনের সময় সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় মশায় এলেন শিবপুরে ভাগলপুর থেকে, বহরমপুর থেকে এলেন পুঁটুবাবু (বিভুতি ভট্ট),

অতুল দত্ত মহাশয় শিবপুরেই বাস করেন। কী দিনরাতব্যাপী আনন্দ চললো আমাদের—সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে রাত চারটে পর্যন্ত—শুধু এক ঘণ্টা বাদ খাবার-দাবার জন্যে। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, সাহিত্য এই নিয়ে চলতো দৈনিক আলোচনা—সাহিত্য নিয়ে প্রধানতঃ। কত বড়ো ভক্ত ছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের, বোঝা যেত শরৎদার সব আলোচনায়—সুরেন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র, পুঁটুবাবু ওঁরাও সকলে ছিলেন একই গুরুর ভক্ত—সুতরাং আমাদের আলোচনায় কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা বাক্‌যুদ্ধ হ'তো না। আলোচনা চলতে চলতে শরৎদা বলতেন, "গিরিজা বলাকা থেকে অমুক কবিতাটি পড়ো তো।" আমি খানিকটা পড়তে না পড়তেই শরৎদা বিহ্বল হয়ে আমার হাত থেকে বই টেনে নিয়ে বলতেন, "দাও, আমি নিজে পড়ি। অবশ্য চেঁচিয়েই পড়তেন—কী সুন্দর বাচনভঙ্গী ছিল তাঁর!"

জনগণআতঙ্কাধার ভোলা আমাকে কিছু বলতো না—প্রথম প্রথম অবশ্য সে আমাকে আক্রমণ করবার ও বিভীষিকা দেখাবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন সে দেখলে যে আমি অষ্টপ্রহরই যাতায়াত করি, দিদি, বৌদি, শরৎদা সকলেরই আমি স্নেহসিক্ত, তখন আমাকে সে ঐ পরিবারভুক্ত স্বরূপেই তার ভয়ঙ্কর মনোযোগ থেকে রেহাই দিলে।

খুব মজার ব্যাপার ঘটেছিল একখানা বই নিয়ে। শরৎদা একদিন বললেন, "গিরিজা, স্যালোমে বইখানা পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বইটির খুব ভালো সংস্করণ আছে জেনে একদিন সন্ধ্যের সময় আমরা দু'জনে গিয়ে গুরুদেবের কাছ থেকে বইখানি চেয়ে আনি। রাত দশটায় বাড়ি ফিরি বলে, সে রাত্রে আর বইটি পড়া হয়নি। পরদিন সকালে বই পড়তে গিয়ে দু'জনে দেখি যে, বইটি ফরাসী ভাষায় লেখা। শরৎদাকে বললুম, "বইটি গুরুদেবকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো।" শরৎদা বললেন, সে বড়ো লজ্জার কথা হবে।" তাঁর পরামর্শমতো বইটি বোঝবার জন্যে সেইদিন দুপুরে নিউম্যান কোম্পানীর দোকান

থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে ফ্রেঞ্চ ইংলিশ ডিক্সনারি কিনে আনলুম। কিন্তু প্রত্যেক কথার জন্যে ডিক্সনারি দেখে কি কোনো বই পড়া চলে! অতি কষ্টে একদিনে দু'পৃষ্ঠা মাত্র আমরা পড়লুম। তারপর অতিশয় লজ্জান্বিত হয়ে গুরুদেবকে আমি বইটি ফিরিয়ে দিয়ে এলুম—তাঁব সঙ্গে এ বিষয়ে যা কথা প্রতিকথা হ'লো তা পাঁচজনকে শোনাবার মতো নয়।

তেরো বছর দিবারাত্র তাঁর সঙ্গে থেকেছি, কত কথা আর কতো ঘটনাই বা জানাবো। আমি যেটুকু বলেছি তাতে তাঁর হৃদয়ের সরসতা, মহত্ত্ব, দরদ, বন্ধু-বাৎসল্য ও দৃঢ়তা যদি ফুটিয়ে তুলতে পেরে থাকি তো আমি ধন্য।

সেদিনের কথা আজও বেশ মনে পড়ে। স্কুলের ছুটির পর আমরা "মার্বেল" খেলিতেছিলাম, এমন সময় একটি শীর্ণকায় ভদ্রলোক আমাদিগের খেলা দেখিতে দেখিতে বলিলেন—'কি রে, ফস্কে গেলি, চেয়ে দেখ, আমার কত টিপ!" সেদিন কয়েকটি বালকের সহিত মার্বেল খেলায় যে কৃতিত্ব তিনি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন—আহা, যদি আমাদের এমনই 'টিপ' থাকিত।

ইহাই পরিচয়ের সূত্রপাত। পরে শুনিলাম, ভদ্রলোকটি আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়াটে আসিয়াছেন। সাদাসিধা ধরনের মানুষ, আড়ম্বরহীন বেশভূষা। প্রত্যহই তাহাকে আমাদের খেলার দর্শক হিসাবে, অথবা তাঁহার গল্পের শ্রোতা হইয়া কাছে পাইয়াছি। গল্প শুনিতে শুনিতে আমরা তন্ময় হইয়া যাইতাম। সেদিনের কথা বেশ মনে পড়ে—যেদিন তিনি আমাদের কাছে "মহাশ্মশানের" গল্প বলিয়াছিলেন। বড় হইয়া সে গল্পটি হুবহু শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে পাঠ করিবার পর অনেক প্রশ্নই উদিত হইয়াছিল।

একদিন কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, 'তবে যে সেদিন বললেন, আপনাদের মধ্যে তর্ক হওয়ায় আপনি নিজে বন্দুক নিয়ে মহাশ্মশানে গেছলেন, শকুন-শিশুরা কচি ছেলের মতো কাঁদে, কিন্তু বই লিখলেন অন্য নাম দিয়ে?'

শরৎচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'কি শুনতে চাস, শ্রীকান্ত আমি কি না, এই তো? কিন্তু এর উত্তর আজ না পাস, একদিন হয়তো পাবি।'

তাহার পর অনেক দিনই তাঁহাকে কাছে পাইয়াছি; তাঁহারই ইঙ্গিতে ভাগলপুরে যাইয়া দেখিয়াছি, গঙ্গার খাড়া কাঁকরের পাড়;

মাথার উপরে বহু প্রাচীন অশ্বথবৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মতো নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নিম্নে সূচিভেদ্য অন্ধকার-তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত আহত হইয়া আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে।

শুনিয়াছিলাম, তাহার পরপারে অনেক জেলের বাস, মক্কাক্ষেত - এমনই কত কি সন্ধান পাইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্রের নিকট তাহা গল্পও করিয়াছিলাম। সেদিন তাঁহার নিকট হইতে কোনো সোজা জবাব না পাইলেও মনে মনে বুঝিয়াছিলাম, ভাগলপুরের ফুটবল খেলার মাঠে শরৎচন্দ্রের পিঠের উপর গোটা-তিনেক আস্ত-ছাতির বাঁট নিশ্চয়ই ভাঙিয়াছিল। ভাগলপুরের মণি মজুমদার মহাশয়ও বোধহয় আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন। শরৎচন্দ্রের পরিচয়পত্র দেখিয়াই মণিবাবুর সহিত আমার আলাপ হয়।

সে যাহাই হউক, তাঁহার বাড়িতে আমাদের যাওয়া-আসার কোনো বাধা কোনোদিনই ছিল না, বরং না যাইলে কাছে ডাকিয়া বলিতেন—'ক'দিন আসিসনি যে?'

একদিন বলিয়াছিলাম—'আপনার ভেলি যা তেড়ে আসে। বাড়ি ঢুকবো কি করে!'

তিনি তাঁহার আদরের কুকুরটির মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন—'না রে না, ভেলু আমার সেরকম নয়, ও মানুষের মত সব বুঝতে পারে—নয় রে ভেলু?' পরে মৃদু হাসিয়া বলেন, 'কিন্তু আমাকে কামড়াতে ছাড়েনি, এমনই দুষ্টু! এমনই নেমকহারাম!'

শরৎবাবুর বাড়িতে আমরা দুইটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাইতাম—খাবার ও বই। বিশেষ ছেলেদের খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। যখন তাঁহার বাড়ি যাইতাম, দেখিতাম হয় তিনি ভেলুর তত্ত্বাবধান করিতেছেন, না হয় লেখাপড়া লইয়া আছেন। পড়িবার সময় কিংবা লিখিবার সময় তাঁহার যে তন্ময়তা দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। তখন ঘরে কে আসিল না-আসিল, তাহা তাঁহার চোখেই পড়িত না।

কতদিন দেখিয়াছি, জলধরবাবু বাহিরের দালানটিতে বসিয়া চুরুট খাইতেছেন, আর শরৎচন্দ্র ঘরের ভিতর বসিয়া অনবরত লিখিয়াই চলিয়াছেন। তিনি কী ক্ষিপ্রতার সহিত লিখিতেই পারিতেন! অথচ কি সুন্দরই তাঁহার হস্তাক্ষর—যেন মুক্তা বিছাইয়া দিতেছেন!

তখন কী জানিতাম যে, শরৎচন্দ্রের হাতে 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী' প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছে!

আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহার লাইব্রেরি ঘাঁটিতাম, অসমাপ্ত কিছু লেখার একটা পাণ্ডুলিপি পড়িতাম, না হয় তাঁহার গল্প শুনিতাম। তিনি ডিকেন্সের ভক্ত শিষ্য ছিলেন। যখনই পড়িতেন, তাঁহার পুস্তক পড়িতেন।

তিনি বলিতেন—'ডিকেন্স আমার বড় আদরের জিনিস রে; কতবার তো পড়িলাম, তবু যতবার পড়ি ততবার নতুন বলিয়াই মনে হয়।'

তাঁহার ডিকেন্সের বইগুলি এই উক্তির সাক্ষ্য দিবে। যে লাইন-গুলি তাঁহার ভালো লাগিত, তিনি সেগুলির নিম্নে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়া রাখিতেন ও একটি পৃথক খাতায় সেই লাইনগুলির বাঙলা অনুবাদ করিয়া রাখিতেন।

একদিনও দেখি 'ইজিচেয়ারে' শুইয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সাজাহান' কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া চয়নিকাখানি হাতে দিয়া বলিলেন—'মুখস্থ হয়েছে কি না, ধর তো।' এমনইভাবে তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমাকে বলিতেন 'বই পড়াকে যথার্থ হিসাবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখকষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়। এই দেখ না, কোথাও তো বেশী মিশি না, দিনরাত ঘরের মধ্যেই পড়ে আছি-- মাঝে মাঝে ভূতনাথবাবুদের বাড়িতে গিয়ে বসি—যদি বই পড়া ও লেখার অভ্যাস আমার না থাকত, তাহলে সময় কি নিয়ে কাটত বল দেখি!'

শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ মনে পড়িতেছে; কিন্তু সব কথা বলিবার শক্তি বা সাহস আমার নাই। তথাপি এই খামখেয়ালী লোকটির কত খেয়ালের কথাই বলিতে ইচ্ছা করে।

রবিবার। ভূতনাথবাবুর বাড়ি রবিবারের বৈঠকে বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। আমি, টুনটুন প্রভৃতি ছেলের দলও এইরূপ বৈঠকে আসন পাইতাম।

শরৎচন্দ্র হঠাৎ মুখ হইতে গুড়গুড়ির নল নাবাইয়া আমাকে বলিলেন—'তোরা আমার যে কোনো বই থেকে একটা লাইন পড়, আমি বলে দেবো সেটা আমার কোন বইএ আছে।'

শরৎচন্দ্রকে পরাস্ত করিবার জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম —ভূতনাথবাবুরও উৎসাহের সীমা ছিল না। কিন্তু এক-একটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়ায় আমাদিগের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কী অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিই তাঁহার ছিল!

বাড়িতে বৈষ্ণব-ভিখারীর আদর ছিল; তাহারা একতারা বাজাইয়া গাহিত, শরৎচন্দ্র তন্ময় হইয়া শুনিতেন। কিন্তু অন্য ভিখারী দেখিলে তিনি চটিয়া উঠিতেন। আবার কত যে দুঃস্থ পরিবারকে তিনি সাহায্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই ভিখারী "বিদায়" লইয়া তাঁহার প্রিয় উড়িয়া চাকর 'ভোলা' কতই না মার খাইয়াছে—কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনিবের নিকট হইতে ২।১ টাকা বকশিশ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছে—'মনিব তো নয়, মোর বাপ আছে।'

তাঁহার মাথার চুলগুলি সাদা করিবার ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল—এইজন্য তিনি প্রায়ই তেল মাখিতেন না। কথায় কথায় বলিতেন—'৫২ বৎসরের পর একদিনও বাঁচবো না, দেখিস তোরা! আমাদের বংশে কেউ বাহান্নর কোঠা পেরোয়নি। আর দোষই বা কি দেবো বল; এই যে দেহযন্ত্র দিনের পর দিন সামনে টাইম ধরে কাজ করে চলছে, সে বেচারী যদি একদিন ধর্মঘট করে বসে—তাহলে কি তার দোষ দিতে পারি?'

বোধহয় ১৩৩২ সালের মাঝামাঝি তিনি বাজেশিবপুর ছাড়িয়া পাণিত্রাসে বাস করিতেছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি প্রায়ই বলিতেন—'শহরে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই, বলাই, এখানে যেন প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে! কিন্তু তোদের ছেড়ে যেতেও মায়া হয়—বাজেশিবপুরের উপর আমার যেন কেমন মায়া পড়ে গেছে। যেখানেই যাই, আমায় যেন তোরা ভুলে যাসনি।'

তিনি সত্যই আমাদের ভুলেন নাই। কতবার যে তিনি আমাকে পাণিত্রাসে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার ঠিক নাই।

সন ১৩৪৫ সালের ১৯শে ভাদ্র তারিখের কথা। আদালতের তলবী নথির মতো যথাসময়ে পাণিত্রাসে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই এর খবর, ওর খবর, মায় তাঁর 'ভেলু'র গোরটি কেমন আছে, সব জিজ্ঞাসা করিয়া তবে আমায় ছুটি দিলেন। আমিও চাএর সন্ধানে ছুট দিলাম। একটু পরে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তিনি পূজায় বসিয়াছেন। একটু সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, পূর্বে তো তাঁহাকে কখনও পূজা করিতে এমন কি গায়ত্রী জপ করিতে দেখি নাই। আপনাকে জোর করিয়া নাস্তিক প্রমাণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবলই ছিল।

গুটি গুটি দোতলায় উঠিলাম। একখানি ঘরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে শরৎচন্দ্রকে ধ্যানস্থ দেখিলাম। পূজার উপকরণ নাই, অর্থাৎ ফুল নাই, গঙ্গাজল নাই, কোষাকুষি নাই—আছেন মাত্র পূজারী শরৎচন্দ্র ও তাঁহার দেবতা—বিগ্রহের মূর্তি ধরিয়া।

পরে শুনিয়াছিলাম, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শরৎচন্দ্রের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের ধ্যানরত মূর্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিয়াছিলাম, কী কঠোর তপস্যা, কী একাগ্রতা, ও কী একনিষ্ঠতা! সেদিন বুঝিয়াছিলাম, শরৎচন্দ্র কত বড় আস্তিক ; নাস্তিকতা তাঁর স্বেচ্ছাবরণ, তাহার আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেন।

বোধহয় আধ ঘণ্টার পর তাঁহার ধ্যান ভাঙিল। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'বেলা হ'ল, চল্ খেতে বসি।'

আমি খাইতে খাইতে বলিলাম—'পূজা করা ধরলেন কবে থেকে? নাস্তিক হবার ইচ্ছা আর নেই তো?

শরৎচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—'দেশবন্ধু যখন ভারটা আমার কাঁধেই চাপিয়ে দিলেন, তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে তো।'

আমি বলিলাম—'চেষ্টার বহর নিজের চোখে দেখেছি, আজ আর ঠকাতে পারবেন না। নিজেকে কেন যে লুকোতে চান, তা আমি ভেবেই পাই না।'

উত্তর নাই, গুড়গুড়ির ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন; হঠাৎ চাহিয়া বলিলেন—'তোর Autograph-খানা পড়ে আছে অমনি, কিছু লেখাও হয়নি, ঘরের ভিতর টেবিলের ওপর আছে, নিয়ে আয়, আর কলমটাও নিয়ে আসিস।'

সেখানি হাতে দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে লিখিলেন—"অবাঞ্ছিত বস্তুকে সহিবার জন্য যে সহিষ্ণুতা তাহার অর্জনেই মানুষের কল্যাণ।"

বইখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'নির্মল দেবও একখানি বই দিয়ে গেছে, তাতেও আজ লিখে দিই তুই সেখানা নির্মলকে দিয়ে আসিস।'

শরৎচন্দ্র নির্মলবাবুর খাতাখানিতে লিখিলেন—"যাকে চাই না, সে যদি আমার না চাওয়াকে পরাস্ত করে আনে তাকে যেন নিতে পারি।"

গাড়ির সময় হ'ল। তিনি নিজেই বলিলেন—'আর দেরি করিসনি, বেরিয়ে পড়।'

প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইতে, বলিলেন—'তোর বাপকে আমার নমস্কার জানাস, পাড়ার সকলকে বলবি, যেন তারা আমায় একেবারে না ভুলে যায়। বাজেশিবপুরকে কোনোদিনই

আমি ভুলতে পারব না, বিশেষ করে সরোজবাবু, ভূতনাথবাবু, নগেনবাবু, রজনীবাবুদের।"

এখন বুঝিতে পারি, শরৎচন্দ্র যে কত বড়, তাহা তখন তাঁহার কাছে কাছে থাকিয়া বুঝিতে পারি নাই। নিজের চোখে তাঁহাকে গোখুরা সাপ ধরিতে দেখিয়া ইন্দ্রনাথের সাপ খেলাইবার কথা মনে পড়িয়াছে, তাঁহার সযত্নরক্ষিত শঙ্কর মাছের চাবুকটি পল্লীর কয়েকটি দুষ্টের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়া দশাপ্রাপ্তি দেখিয়াছি, তাঁহার 'ভেলুর' মৃত্যুতে শোকার্ত শরৎচন্দ্রের কাতরতা দেখিয়াছি, তাঁহার বাড়িতে কতদিন তাঁহাকে গুন্‌গুন্ করিয়া কীর্তন গাহিতে শুনিয়াছি। আজ সেসব শেষ হইয়াছে।

টুকরো কথা　　　　　　　　　　　　　　　　হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকের ধারণা—শরৎচন্দ্রের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শরৎবাবু মৌখিক নাস্তিক ছিলেন কিন্তু অন্তরে পরম দেব ভক্ত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহাকে যে "রাধাকৃষ্ণ" বিগ্রহ দিয়াছিলেন, সেই রাধাকৃষ্ণের পূজা তিনি স্বয়ং প্রত্যহ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ভ্রাতা দেবানন্দ স্বামীর মৃত্যুদিবসে প্রতি বৎসর তিনি হরি-সংকীর্তন করাইতেন। তিনি নিজেও কীর্তন গান করিতে পারিতেন।

তিনি দেবতাকে যেমন ভক্তি করিতেন, গুরুজনদিগকেও বোধ হয় তাহার অধিক ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন।

একদিন বাড়িতে ঝি আসে নাই, পাচক ঘরে ঘুমাইতেছে, দিদি বাসন মাজিতেছেন। শরৎবাবু তাই দেখিয়া কিছু না বলিয়া পাচকের ঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর, দিদি কোথায় ?"

—"তিনি বোধহয়, বাসন মাজছেন।"

—"তোমার ঘরের তাকের উপর ও কি ?"

—"শালগ্রামশিলা।"

—"ওখানে তুলে রেখেছ কেন ?"

—"আমি পূজা করি, ভক্তি করি।"

—"দিদি আমার কে জান ? আমার ঠাকুর—আমার পূজনীয়া।"

ঠাকুর আর কোনো কথা না বলিয়া কাজ করিতে গেল।

তাঁহার রচনায় তাঁহার অন্তরের কথা প্রকাশ পাইয়াছে—

"যিনি অন্তর্যামী, যিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে বসে কথা কন, তাঁকে অস্বীকার ক'রো না, তাঁর অমান্য ক'রো না।"

২

শরৎবাবুর বই বাল্যকালে পড়িবার উপায় ছিল না। একদিন লুকাইয়া আমি তাঁহার 'চন্দ্রনাথ' পড়ি, পড়িয়া মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমি একদিন তাঁহার সঙ্গে পাণিত্রাসের বাড়িতে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তখন তাঁহার প্রায়ই জ্বর হয়। তিনি সদর দালানে বসিয়া Progress of Science পড়িতেছিলেন। আমি যাইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেই তিনি বলিলেন—"কখন এলি?"—আমি বলিলাম—'এই মাত্র আসছি।" তাহার পর নানা কথা হইল। কথা-প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার নিশ্চয়ই কোনো ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি আছে, তা না হলে এত অল্প কথায় অল্প সময়ের ভিতর কি করে লেখেন?" তিনি বলিলেন --"না রে বাপু, এমন সময়ও আসে যে, এক ছত্র লিখতেই হু'দিন কেটে যায়।"

এমন সময় এক ভদ্রলোক একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চান?"

—"দেখুন, একটা গল্প লিখেছি, যদি সেটা kindly correct করে দেন।"

—"আপনি কি করেন?"

—"বি এস-সি. পড়ি।"

—"আচ্ছা—আপনি ব্যাকরণ কৌমুদী পড়া কতদিন ছেড়েছেন?"

—'বছর চারেক।"

"দেখুন, কৌমুদীর সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত আর কৃত-প্রত্যয়গুলো বেশ ভালো করে পড়ে তারপর আমার কাছে আসবেন, আমি সাধ্যমতো দেখে দেবো।"

ভদ্রলোক মুখ চুন করিয়া ফিরিয়া যাইলেন।

এই ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হইয়া যাইলাম। আমি বলিলাম— "ভদ্রলোককে কি ঐরূপভাবে অপমান করে? আচ্ছা, আপনি তো

তাঁকে তদ্ধিত-প্রত্যয় খুব ভালো করে পড়ে আসতে বললেন, আপনি কি সব নিয়ম মানেন ?"

তিনি বলিলেন—"নিশ্চয়ই। সাধ্যমতো যতটা পারি মানি বই কি ! আর 'মনে করা'র কথা—ওরা আমাকে সবাই চেনে মনে কিছুই করে না।"

শরৎবাবু জীবনে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যহ তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করিতেন, তিনি বিজ্ঞানের চর্চাও করিতেন।

৩

শরৎবাবু তাঁহার অধিকাংশ কাজই নিজের হাতে করিতেন। তিনি বহু জীবজন্তু পালন করিয়াছিলেন। নিজেই সে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। বাড়িতে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান ছিল তাঁর। তিনি নিজহাতে বাগান করিয়াছিলেন। নার্সিংহোমে মৃত্যুশয্যায় পর্যন্ত তিনি দেশের বাগানের ফুল কোনটা কত বড় হইয়াছে, সে সন্ধান রাখিতেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সাধনায় যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সঙ্গীত-সাধনাতেও তিনি সেরূপ সিদ্ধকণ্ঠ ছিলেন, একথা রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীগণ ভিন্ন আর কেহ জানে না। কারণ বর্মা হইতে শরৎচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করিয়া একেবারে কণ্ঠরোধ করিয়া শুধু লেখনী চালনাই করিয়াছিলেন। তিনি একধারে কথাশিল্পী ও সুর-শিল্পী ছিলেন বলিলে কেহ বিশ্বাস করিত না। বাঙলা-সাহিত্যে তিনি সাহিত্য-সম্রাট, অপরাজেয় কথাশিল্পী, নির্যাতিতের ও লাঞ্ছিতের দরদী বন্ধু, মনস্তত্ত্ববিদ্, সমাজ-সংস্কারক, নব্য বাঙলার স্বাধীনচিন্তা-প্রবর্তক ও স্বদেশসেবক প্রভৃতি অনেক উপনামে ভূষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার "রেঙ্গুনরত্ন" এই উপনামটি বঙ্গের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এ-কথা বোধহয় শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই গোপন রাখিয়াছিলেন। বোধহয়, পাছে বন্ধুবান্ধবগণ এই উপাধির ইতিবৃত্ত শুনিয়া তাঁহাকে গান গাহিতে অনুরোধ করেন ও তাঁহার নীরব-সাহিত্য-চর্চায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাই এই নীরবতা।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যৌবনের প্রারম্ভে শরৎচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় রেঙ্গুন শহরে আসিয়া প্রথমে তাঁহার আত্মীয় হালিশহর-নিবাসী রেঙ্গুনের উদীয়মান উকিল স্বর্গীয় অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই অঘোরবাবু নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করায় শরৎচন্দ্র আবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহায়-সম্বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বা অর্থবল কিছুই ছিল না। সম্বল ছিল মাত্র ভাবপ্রবণ দরদী হৃদয়খানি ও সুমধুর

কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর প্রথম আকৃষ্ট করে আমাকে। রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে আমিই তাঁরার প্রথম বন্ধু। শরৎচন্দ্রের আত্মীয় অঘোরবাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরিবারবর্গ নিকটে না থাকায় তাঁহার মৃত্যুশয্যায় সেবা-শুশ্রূষার ভার শরৎচন্দ্র ও আমি লইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং রাত্রিজাগরণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সাহায্য করিতাম। তিনি অধিকাংশ সময় রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যূষে আপন মনে কত কি আবৃত্তি করিতেন এবং ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন। ঐ আবৃত্তি ও গানের অধিকাংশই ছিল কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে। কয়েকদিন শরৎচন্দ্রের সাহচর্যে থাকিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, শরৎচন্দ্র একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। কখন কখন তিনি সহজ লোকের মতো আচার-ব্যবহার করিলেও অধিকাংশ সময় পাগলের মতো আপনার খেয়ালে আপনি মত্ত থাকিতেন। কোনো প্রকার নিয়ম বা বাঁধাবাধির ধার ধারিতেন না। তাঁহার আচরণে বা কথাবার্তায় কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার কার্য-কলাপ পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি একজন মহাভাবুক লোক, সর্বদা আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। মাসাধিককাল একত্র বাস ও একত্র রাত্রিজাগরণের ফলে আমি শরৎচন্দ্রের মধুর স্বভাব ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাই। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে ও আমি তাঁহাকে 'শরৎদা' বলিয়া ডাকিতে থাকি।

শরৎচন্দ্র সংসারচক্রের ভীষণ আবর্তনে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এ-কথা তিনি গোপন করিতেন না এবং প্রথম জীবনে প্রণয়ঘটিত নৈরাশ্যের একটি আঁচ তাঁহার হৃদয়ে লাগিয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ আভাসও দিতেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্রকে লইয়া রেঙ্গুন শহরে প্রথম উপস্থিত হইলেন। রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালী-সম্প্রদায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়ার সঙ্কল্প করেন। তখন রেঙ্গুন শহরে পঞ্চাশ সহস্র বাঙালী অধিবাসীর মধ্যে সহস্রাধিক শিক্ষিত লোক থাকা সত্ত্বেও সুসাহিত্যিক বা সুগায়ক একজনও ছিল না। শরৎচন্দ্র তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতবাস করিতেন এবং তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল কি না, তাহা কেহই জানিত না। অতি কষ্টে একখানি অভিনন্দপত্র লেখা হইল বটে, কিন্তু অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিবার লোক মোটেই পাওয়া গেল না। কবিবর নবীনচন্দ্রের স্বদেশবাসী বন্ধু, রেঙ্গুনের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ও ব্রহ্মদেশের এড্‌মিনিস্ট্রেটর জেনারেল মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন কবিবরের অভ্যর্থনার সমস্ত ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর শরৎচন্দ্রের সন্ধান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-রসিকতার সহিত কথা চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "তোমাদের কবিবরের হঠাৎ এ দুর্বুদ্ধি হ'ল কেন? তিনি এ সাগর-পারে পাণ্ডববর্জিত দেশে এলেন কেন?" আমি বলিলাম, "যেজন্যই তিনি আসুন, শরৎদা, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সম্বর্ধনা করা প্রবাসী বাঙালীদিগের অবশ্য কর্তব্য নয় কি? আর কবিবরের আদর-অভ্যর্থনা তাঁর পদমর্যাদানুযায়ী ও সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া উচিত ভেবে আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি। তুমি যদি দয়া করে একখানি গান না কর, তাহলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে।"

তখন শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন শহরে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও লোক-সমাজে মিশিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক বলিয়া প্রথমে বিশেষ আপত্তি করিলেন। অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয় ও পীড়াপীড়ির পর এই শর্তে রাজী হইলেন যে, অভ্যর্থনা-হলের একপার্শ্বে পর্দার ভিতর তাঁহার জন্য

একটি স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিতে হইবে। তিনি ঐ স্থানে আত্মগোপন করিয়া গান গাহিবেন।

'রেঙ্গুন বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব' গৃহের অভ্যর্থনা-হলে শরৎচন্দ্রের ইচ্ছামতো একটি স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট হইল। নির্দিষ্ট দিনে কবি-দর্শন-অভিলাষী বিপুল জনতার মধ্যে শরৎচন্দ্র তদ্‌গতচিত্তে ভাবাকুলতার সহিত মধুর কণ্ঠে এই অভ্যর্থনা-সঙ্গীতটি গাহিলেন :

এস কবিবর এস হে !
ধন্য কর ব্রহ্মদেশ হে !
সমবেত যত স্বদেশী,
তব দর্শন-অভিলাষী
লয়ে পুণ্য প্রতিভারাশি
এস কাব্য-আকাশ-শশী হে।
এস সুন্দর, এস শোভন,
এস বঙ্গহৃদয়-ভূষণ,
এস হে প্রিয়দর্শন,
প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লহ হে॥

সঙ্গীত শেষ হইবামাত্রই শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক আশ্চর্য সাড়া পড়িয়া গেল। গায়ক শরৎচন্দ্রকে দেখিবার অদম্য কৌতূহল জনতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ব্রহ্ম-প্রবাসে কে এই অজ্ঞাত সুধা-কণ্ঠ গায়ক আজ কবি সম্বর্ধনা করিয়া প্রবাসী বাঙালীর মুখ রক্ষা করিলেন ? স্বয়ং কবিবর বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া ধন্যবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শরৎচন্দ্র সঙ্গীত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দার মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাওয়া গেল না। কবিবর নবীনচন্দ্র ক্ষুণ্ণমনে ফিরিবার সময়ে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গেলেন, যেন একদিন শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া হয়। আর-একদিন তিনি তাঁহার

গান শুনিবেন। এমন মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত তিনি বহু দিন শোনেন নাই। সুরশিল্পী শরৎচন্দ্রের সুধাকণ্ঠ ও গানের অপূর্ব শক্তি তাঁহাকে এক রাত্রিতেই প্রবাসী বাঙালীদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিল বটে, কিন্তু এই পল্লবান্তরালের কোকিলের মতো অদৃশ্য গায়কটির প্রকৃত স্বরূপটি বহু দিবস পর্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচর ছিল। তাহার পর কবিবর নবীনচন্দ্র বহু দিন শরৎচন্দ্রের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উপলক্ষে একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিয়া স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত শরৎচন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই। কিছুদিন পরে কবিবরের আগ্রহাতিশয্যে আমি একদিন অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া শরৎচন্দ্রকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলাম। উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া সম্মুখে ড্রয়িংরুমে কবিবরের সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতা রেঙ্গুন হাইকোর্টে জজ মিঃ সতীশরঞ্জন দাশকে বসিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শরৎচন্দ্র হঠাৎ এরূপ জোরে দৌড় দিলেন যে, তাঁহার পায়ের এক পাটি জুতা খুলিয়া পড়িয়া গেল। কাঠের সিঁড়িতে ভীষণ শব্দ হওয়ায় কেহ পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, শরৎচন্দ্র এক পাটি জুতা পরিয়া ছুটিয়া পলাইতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কবিবর কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু আমি পাগল শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে বিস্মিত না হইলেও বিশেষ লজ্জিত হইলাম। শরৎচন্দ্র তখন এরূপ লাজুক ছিলেন যে, কোনো গণ্যমান্য পদস্থ লোকের সম্মুখে কিছুতেই বাহির হইতে পারিতেন না।

ইংরেজী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতির উদ্যোগে যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের মান্দ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ)

রেঙ্গুন শহরে আসিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর-দিগের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে ভক্ত হনুমান মনে করিত। তাঁহার ন্যায় বৈদান্তিক পণ্ডিত ও ত্যাগী যোগী পুরুষের ব্রহ্মদেশে এই প্রথম পদার্পণ। তিনি বৌদ্ধপ্লাবিত ব্রহ্মদেশে সর্বপ্রথম ঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়া যান। ইহার ফলে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন শহরে স্বামী শ্যামানন্দ মহারাজের উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে দেড় শত রোগী থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারে, এইরূপ একটি বিরাট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও সম্প্রতি একটি বৃহৎ রামকৃষ্ণ-মঠের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে। সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণানন্দের নৈষ্ঠিকী ভক্তির জীবন্ত সৌম্য মূর্তিখানি দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া যে কয়দিন স্বামীজী রেঙ্গুনে ছিলেন, প্রতিদিন সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া শরৎচন্দ্র নির্জনে আত্মকাহিনী জ্ঞাপন করিতেন ও তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেন।

স্বামীজী কয়েকদিন বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সাধারণ সভায় ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেন না। শুধু ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্মমতের সার সত্যটুকু নিজ সাধনার দ্বারা যেরূপ উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ওজস্বিনী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার ভাষায় ও ভাবে কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকায় উহা সকল সম্প্রদায়ের শ্রোতার উপর মন্ত্রশক্তির মতো কার্য করিত। যেদিন সাধারণ সভায় বক্তৃতা থাকিত না, সেদিন স্বামীজী নিজ নির্দিষ্ট বাসায় বসিয়া সন্ধ্যাকালে সমবেত ভক্তবৃন্দকে ধর্ম-উপদেশ দিতেন। অনেক মান্দ্রাজী ভক্ত এই সান্ধ্য-সম্মেলনীতে যোগদান করিতেন। শরৎচন্দ্র এ সময় উপস্থিত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে

রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিতে অনুরোধ করিতেন। শরৎচন্দ্র সহজে কোথাও গান গাহিবার পাত্র ছিলেন না ; কিন্তু এক্ষেত্রে সাধুসঙ্গের পুণ্যময় প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই-একখানি রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতেন। একদিন শরৎচন্দ্র গাহিলেন :

এস সবে মিলে গাই কুতূহলে রামকৃষ্ণ-গুণগান।
রামকৃষ্ণ-নামামৃত প্রেমানন্দে আজি করিব পান॥
সত্যনিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ, পরমহংস রামকৃষ্ণ,
ভাবিলে যাঁহারে ভবের কষ্ট মুহূর্তে হয় অবসান॥
কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্তি, সর্বধর্মে যাঁর সমভক্তি,
সর্বজীবে সমপ্রীতি দীনজনের ভগবান॥
সমাধিমগ্ন মূরতি চারু, ধর্মোপদেষ্টা জগৎ-গুরু,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হও মম হৃদে অধিষ্ঠান॥

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সর্বদাই রামকৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন, রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনো কথা তাঁহার ভালো লাগিত না ; রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। রামকৃষ্ণই তাঁহার সবস্ব ধন, রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ। যে কেহ রামকৃষ্ণ নাম করিত বা রামকৃষ্ণের গান গাহিত, সেই তাঁহার পরম আত্মীয় হইয়া যাইত। কণ্ঠ-সঙ্গীতে শরৎচন্দ্র সকলকেই বশীভূত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই প্রাণ-মাতানো রামকৃষ্ণ সঙ্গীতগুলি শুনিয়া স্বামীজী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং শরৎচন্দ্রের অনেক অন্যায় আব্দার সহ্য করিতেন।

শরৎচন্দ্রের হিন্দু-দর্শনশাস্ত্র কিছু পড়া ছিল কি না জানি না, কিন্তু দেখিয়াছি, রেঙ্গুনের Bernand Free Library হইতে অনেক ইংরেজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, হার্বার্ট স্পেনসার, আগস্ট কোমত প্রভৃতির মতামত লইয়া অনেক কূট প্রশ্নের অবতারণা করিয়া স্বামীজীর সহিত তর্ক ও বাদানুবাদ করিতেন। স্বামীজী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের

জীবন ও বাণী অবলম্বনে ঐ সকল সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়া দিলে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হইয়া শ্রদ্ধাবিস্ফারিত-নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিতেন।

যেদিন রেঙ্গুন শহরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভ্যর্থনা হয়, ঐ অভ্যর্থনা-সভায় বহু সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তির সহিত স্বয়ং কবিবর নবীনচন্দ্র আসিয়াছিলেন শুনিয়া স্বামীজী কবিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি স্বামীজী ও শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে কবিবরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কবিবর অকস্মাৎ স্বামীজীর সহিত শরৎচন্দ্রের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত আমাদের বসাইয়া স্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর প্রতি কবিবরের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম এবং কবিবরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িয়া গেল। ইহার পূর্বে অজ্ঞাতবশতঃ আমরা কেহই স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি নাই ভাবিয়া মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও প্রচারকার্যের আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার পর শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কবিবর বলিলেন—"আপনার গান শোনবার আশায় আমি তৃষিত চাতকের মতো লালায়িত হয়ে আছি।" উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিলেন "আজ আমি গান শোনাতে আসিনি, আপনার পুত্র সুকণ্ঠ নিমলচন্দ্রের গান শুনতে এসেছি।" কবিবর বলিলেন—"শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলচন্দ্রের তুলনা হতে পারে না।" স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন—"আজ এখানে একত্রে নবীনচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উদয় হয়েছে বটে, কিন্তু আমি শরৎ-সুধাই পান করতে চাই।" কবিবরের আদেশে প্রথমে নির্মলচন্দ্র একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলেন। ইহার পর আর বলিতে হইল না, শরৎচন্দ্র অর্গানের

সম্মুখে বসিয়া আপন মনে প্রাণের আবেগে ভাব-বিভোর হইয়া গাহিলেন :

আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা! বাকি কিছু নাই।
ও দাও বাঁচিবার মতো তার বেশী নাহি চাই॥
তুমি ঘুচায়েছ আমার যা ছিল পুঁজি।
(তাই) দু'হাত তুলে শূন্যপানে তোমারে খুঁজি॥
ভাবি তুমিই দিয়েছ, তুমিই নিয়েছ, তুমিই দিবে তা ফিরে।
আবার তুমিই আসিবে সুধা লয়ে হাতে রিক্ত আমারি তরে॥

আমি সেই পথ চাহি সময় নিরখি
যেন দাঁড়ায়ে থাকিতে পারি।
(শুধু তোমারই আশায়)
শেষে অজানা সময় নিকটে আসিলে
যেন তোমারি চরণ পাই॥

এই স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধ্বনি স্বামীজীকে ভাবে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল এবং কবিবরের হৃদয়তন্ত্রীর অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিবামাত্র তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই সঙ্গীতের রস-মাধুর্য আস্বাদন করিয়া বলিলেন— "আপনার গানের ভাব উদ্দীপনায় সেই চিরসুন্দরকে মনে করাইয়া দেয়, রেঙ্গুন শহরে এমন রত্ন লুকান ছিল জানতাম না, আমি আজ আপনাকে 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধি দিলাম।"

শরৎচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীতে যেরূপ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার গানের মধ্যেও সেইরূপ অসাধারণ মাধুর্য ছিল। গানে প্রাণ দিয়া ভাব ফুটাইয়া তুলিতে শরৎচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, শরৎচন্দ্রের একটি মাত্র গানে কবিবর এত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এরূপভাবে সম্মানিত করিবেন। আমার বিশ্বাস, শরৎচন্দ্রের মুখে এই গানটি যিনি শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

কর্মজীবনের অবসান যোগেশচন্দ্র মজুমদার

একবার শীতকালে (সম্ভবতঃ ১৯২০ খ্রীঃ) যখন তিনি [শরৎচন্দ্র] তাঁহার মাতুলালয়ে কিছুদিনের জন্য বায়ু-পরিবর্তনের উপলক্ষে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে আমিও কর্মস্থল সিমলা হইতে ছুটি লইয়া ভাগলপুরে আসি। বহুদিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হওয়ায় উভয়েই খুব আনন্দিত হই এবং তাঁহার বর্মাপ্রবাস সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হয়। কথায় কথায় তাঁহার চাকুরিত্যাগের কথা উঠে। মধ্যবিত্ত বাঙালীদের পক্ষে ভবিষ্যতের কোনও রূপ চিন্তা না করিয়া হঠাৎ কর্ম পরিত্যাগ করা যে খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল, সে কথার উল্লেখ করি। কি উপলক্ষে তিনি কর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে, তিনি কর্মত্যাগের যে সরস বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া পরম কৌতুক অনুভব করি।

তিনি বলিলেন যে, অফিসে প্রবেশ করিয়া কিছুদিনের মধ্যে কার্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু এই সুনামের যে কি ভয়ানক পরিণাম হইতে পারে, তিনি তাহা প্রথমে কিছুই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। দেখা গেল, যে বিভাগে তিনি কাজ করিতেন, তাহার কঠিন কাজগুলি, তাঁহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িত। কার্যে তাঁহার অবহেলা অবশ্য ছিল না, বরং যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্যগুলি সম্পন্ন করিতেন। কথায় কথায় উল্লেখ করিলেন যে, একবার চট্টগ্রাম বন্দর লইয়া বর্মা ও বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের মধ্যে বহু বৎসর হইতে মনকষাকষি চলিতেছিল, এমন কি, আমাদের রেলওয়ে বোর্ডও (আমি তখন তথায় কর্মে নিযুক্ত ছিলাম) ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া একটি প্রকাণ্ড 'কেস' গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহা যে কবে শেষ হইবে, কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিত না। এমন কি, যে ব্যক্তি সম্ভবতঃ তাহার কর্মজীবনের মধ্যভাগে ঐ

কাজটি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কার্যকাল শেষ হইয়া সে যখন অফিস হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিল, তখনও 'কেস'টি শেষ হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। পরে উহা পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত মস্তকে চক্রধারী ব্যক্তির স্থায় তাঁহার মস্তকে আসিয়া ভর করে। কার্যটি বিপুল পরিশ্রম করিয়া উহাকে তিনি শেষ সমাধানের পথে পৌঁছাইয়া দেন।

সুকঠিন কার্যটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি অবশ্য তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই, বরং একদিন অফিসে পৌঁছিতে সামান্য বিলম্ব হইলে এংলো-ইণ্ডিয়ান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে কয়েকটি কঠিন কথা শুনাইয়া দেয়। হয়তো তাহার মন্তব্য কিছু রূঢ় হইয়া থাকিবে, সুতরাং শরৎচন্দ্রও তাহাকে অনুরূপ মন্তব্যে অভিনন্দিত করেন। শেষে কথা ছাড়িয়া উহা হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং তাঁহার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বক্ষদেশ রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠে। উভয়ে মিলিয়া তখন বিচারের জন্য একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল-এর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের সেই নাটকীয় বেশে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল যে কিরূপ ভীত-চকিত হইয়া চেয়ার হইতে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহার একটি সরস বর্ণনা দেন। বিচারের ফলে অবশ্য যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। কর্মজীবনে বিরক্ত হইয়া নিজ টেবিলে ফিরিয়া পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া চিরকালের জন্য দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার শরীরও ভালো যাইতেছিল না। ১৯১৬ সালে তিনি শেষবারের মতো কার্যত্যাগ করেন ও বাজেশিবপুরে বাস করিতে থাকেন।

১৩১৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবী লাহোর থেকে কলকাতায় আসেন। সে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয়নি—তিনি এসেছিলেন ভারতী প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্র দীপকের অন্নপ্রাশন দেবেন বলে। আমি তখন বি. এ. পাশ করে এটর্নীর আর্টিকেল আছি এবং ল' পড়ছি।...

একদিন দীনেশচন্দ্র সেন এসে আমায় পাকড়াও করে সরলা দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বললেন—এর হাতে ভারতীর ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন।

সরলা দেবী আমার হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিলেন এবং তখন বৈশাখ মাসেব কপি তৈরির জন্য আমাকে বললেন—একটি মাঙ্গলিক কবিতা এবং একটি ছোটো গল্প লিখে দাও।

তাঁর হাতে দু'চারটি রচনা ছিল—ইংরাজি ভাষায় লেখা। সেগুলির তর্জমার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু উপন্যাস চাই।

সরলা দেবী বললেন—ভারতী রেগুলার না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কেউই ভারতীর জন্য লেখা দেবেন না। আমাকে বললেন, উপন্যাস সংগ্রহ করতে।

আমার মনে পড়লো শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র কথা। আমি বললাম, উপন্যাস নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। সে গল্পটি দু'তিন মাস চলতে পারে। অপূর্ব লেখা!

সরলা দেবী পড়তে চাইলেন। দিলুম তাঁকে পড়তে। পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—চমৎকার! এক কাজ কর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—তিন মাসে ছাপাও। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়

লেখকের নাম দিও না। সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথেব লেখা। আমাদের দেরির ত্রুটি ঘুচবে এবং গ্রাহক-গ্রাহিকা বাড়বে। আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যায় 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' লেখকের নাম ছাপবে।

তাই হ'ল। বৈশাখ সংখ্যায় 'বড়দিদি' ছাপা হওয়া মাত্র বঙ্গ-দর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গ-দর্শনের সম্পাদক পদ ত্যাগ করার পর সহ-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নেন) রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। গিয়ে অনুযোগ করে বলেন—আপনি আর উপন্যাস লিখবেন না বলেছেন, অথচ এই তো ভারতীর জন্য উপন্যাস লিখেছেন।

কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ অবাক। তিনি বৈশাখের ভারতীতে 'বড়দিদি'র যতটুকু ছাপা হয়েছিল, পড়লেন। পড়ে তিনি বলেছিলেন—আমার লেখা নয়, তবে খুব শক্তিশালী কোনো লেখকের লেখা। তারপর শৈলেশচন্দ্র আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, কার লেখা। বললুম—ধৈর্য ধরুন, লেখকের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সে বছর আষাঢ় মাসের ভারতী বেরিয়েছিল পুজোর পর এবং সে সংখ্যায় 'বড়দিদি' উপন্যাসের শেষে লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' বেশ বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। ছাপা হবার পর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ আমাকে বার বার বলে-ছিলেন—'বড়দিদি'র লেখক অসাধারণ শক্তিশালী, অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে এঁকে তোমরা সাহিত্যের আসরে টেনে আনতে পারবে না ?

* * *

১৩২২ সালে বন্ধুবর মণিলাল (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং আমি 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করি। ২০ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে (এখন কৈলাস বসু স্ট্রীট) ছিল ভারতীর কার্যালয় এবং নীচের তলায় কান্তিক প্রেস। তখন শরৎচন্দ্র প্রায় আসতেন ভারতী অফিসে এবং সকলের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তা যেমন অমায়িক, তেমনি

স্নেহশীল। সকলের প্রীতি-শ্রদ্ধা তিনি নিজের স্বভাবের গুণে পরিপূর্ণ ভোগ করতেন।

এই সময়ে আমি তাঁকে বলেছিলুম—আমি ভারতী সম্পাদনা করছি আজ। এই ভারতীতে তোমার প্রথম লেখা 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়ে তোমাকে বাঙলার সুধীসমাজে পরিচিত করিয়েছিল। তোমার উপর ভারতীর যেমন দাবি, আমারো তেমনি দাবি। ভারতীর জন্য একটা গল্প চাই, তার জন্য যত টাকা চাও, দেবো।

হেসে বলেছিলেন—না, না, তোমার কাছ থেকে তোমাদের ভারতীর জন্য টাকা নেবো কি! দেবো আমি গল্প। এবং এ-কথা তিনি রেখেছিলেন। দিন পনরো-কুড়ি পরে তিনি 'বিলাসী' গল্পটি লিখে আমার হাতে দেন। সে গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে।

তাঁর স্নেহের আর এক পরিচয়ের কথা বলি। ভারতী সম্পাদনা-কালে বারোজন লেখককে দিয়ে লিখিয়ে ভারতীতে আমরা বার করেছিলুম বারোয়ারী উপন্যাস। বারো মাসে বারোটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলাম বারোজন লেখক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, আমি এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা পরিচ্ছেদটি তিনি এমন ঘোরালো করে তুলেছিলেন, তাতে এত নতুন জটিলতা যে, সে জটিল গ্রন্থি খুলতে গেলে উপন্যাস শেষ করতে আরো পরিচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল। তাঁকে ধরে সে পরিচ্ছেদ নতুন করে লিখিয়ে নিয়েছিলাম। সাহিত্য এবং আমাদের উপর স্নেহ খুব বেশী ছিল বলেই তিনি এ কাজ করেছিলেন খুশী মনে এবং এ লেখার জন্য কোনো লেখকই ভারতী থেকে অর্থ গ্রহণ করেননি।

* * *

১৯১৯ কিংবা ১৯২০ সালের কথা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের মালিক সতীশচন্দ্র একখানি পূজা-বার্ষিকী প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুরেশ সমাজপতির উপর ভার দিয়েছিলেন নানা লেখকের কাছ থেকে গল্প সংগ্রহ করার। বার্ষিকীর নাম 'আগমনী'—সুরেশ সমাজপতির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সে বার্ষিকীতে শরৎচন্দ্র একটি গল্প লিখে দিয়েছিলেন। সেই গল্প লেখার সম্বন্ধে তিনি এই কাহিনী বলেছিলেন—সমাজপতি মশাই এসে ধরেছেন গল্প দিতে হবে পূজা-বার্ষিকীর জন্য। তাঁকে ভারি ভয় করি। রাজী হলুম এবং গল্প আসে না, তবু লিখছি নাকের জলে চোখের জলে হয়ে।

—ভয় কেন?

বললেন—তাঁর 'সাহিত্য' পত্রের 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—শরৎ চট্টোপাধ্যায় লেখকের আবির্ভাব হয়ে। এঁর মনে মায়া-মমতা বড় বেশী। তার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি লিখেছিলেন—কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এই শরৎচন্দ্র একটা নেড়ি কুত্তাকে খাওয়াবার জন্য কাটলেট কিনে তাকে খাওয়াচ্ছেন। অথচ পাশে এক গরীব ভিখারী একটা পয়সা চেয়ে কাতরাচ্ছিল, তার দিকে এই দয়ালু শরৎচন্দ্রের নজর পড়েনি। এ-কাহিনীর উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—এমনি কটু কথা যদি আবার আমার সম্বন্ধে লেখেন, তাই তাঁকে 'না' বলতে পারিনি। তাঁকে তুষ্ট করতে এত কষ্ট করেও গল্পটি লিখে দিয়েছি।

কলকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানের বাড়িতেই তখন রেডিও-লাইসেন্স ইন্সপেক্টরের অফিস ছিল। এদের মুখ্য কাজ ছিল, যাঁরা বিনা লাইসেন্সে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র ঘরে রাখেন, তাঁদের আদালতে অভিযুক্ত করা। এজন্য লাইসেন্সের একটি বৎসর-মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্মারকলিপি প্রেরণ করেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে। তখনকার দিনে যে লাইসেন্স-ইন্সপেক্টরটি ছিলেন, তাঁর নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। পূর্ণবাবু খাসা ভদ্রলোক—সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। সাহিত্য, দর্শন, গান, বাজনা—এ-সব কিছুরই ধার ধারেন না। তিনি বোঝেন তাঁর কাজ—কর্তব্য-কর্ম। স্পষ্ট কথা বলেন, স্পষ্টভাবে চলেন।

একদিন এই পূর্ণবাবু 'বেতার জগৎ'-এর অফিস-কক্ষে এসে আমাকে বললেন, "আপনাদের জন্যে মশায়, চাকরি তো থাকবেই না, মানসম্ভ্রম বজায় রাখাও দায় হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হ'লো পূর্ণবাবু?"

পূর্ণবাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "আরে মশায়, একটা লোকের রেডিওর লাইসেন্স ফুরিয়েছে তিন মাস আগে। রিমাইণ্ডার দিলে উত্তর দেয় না। শেষ পর্যন্ত নিজে গেলাম সেখানে। সে কি এখানে? পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে গিয়ে ধরলাম তাকে। সে আপনার নাম করলে আর বললে, 'তাকে আমি চিঠি দিয়ে সব ঠিক করে নেব, আমার লাইসেন্সের জন্যে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আরও অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। শুনলাম, লোকটা খবরের কাগজে লেখে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি নাম বলুন তো?"

"শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ওকে আমি আদালতে ফাইন করাবোই।

আমি তো চমকে উঠলাম, 'সেকি পূর্ণবাবু!—এই সেদিন তাঁকে আমাদের স্টুডিওতে এনে তাঁর জন্মদিনে মালা পরালাম, আর আপনি ফাইন করাবেন?"

পূর্ণবাবু বললেন, "এই দেখুন রিপোর্ট—"

"ছিঁড়ে ফেলুন, ছিঁড়ে ফেলুন।"

পূর্ণবাবুকে বুঝিয়ে বললাম, "শরৎচন্দ্র সুরসিক ব্যক্তি। আপনার ধাত বুঝতে পেরে আপনাকে একটু ল্যাজে খেলিয়েছেন। আপনি ভাববেন না। কালই হয়তো খবর পাবেন, তিনি লাইসেন্স করেছেন।"

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী

বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী জনপ্রিয় সাহিত্যিক ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি হুগলী জেলার সদর মহকুমার দেবানন্দপুর গ্রাম। এই গ্রামে তিনি ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। প্রাচীন সপ্তগ্রাম যে সাতখানি মৌজা লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই গ্রাম তাহারই মধ্যে একখানি মৌজা। ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথের বর্তমান ব্যাণ্ডেল স্টেশন হইতে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত। নদীটি যদিও মজিয়া গিয়াছে এবং গ্রামখানিও খুবই ছোট, তথাপি ইহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নবাবী আমলে এই গ্রামের হিন্দু কায়স্থ জমিদার-বংশের অনেকেই আরবি ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এখানে ফার্সি ভাষা শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। কৈশোর বয়সে বাংলার কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এই গ্রামের 'মুন্সী' আখ্যাপ্রাপ্ত জমিদারদের আশ্রয়ে পাঁচ বৎসর কাল থাকিয়া ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন ও ঐ সময়ে বাংলা ১১৩৪ সনে তাঁহার প্রথম বাঙলা কবিতা রচনা করেন। ইহার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে বাংলা ১২৮৩ সালে এই গ্রামের এক সামান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাঙলার আধুনিক যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এবং এই গ্রামে থাকাকালেই তাঁহারও সাহিত্য-সাধনার সূচনা হয়। অতএব একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বাঙলার সাহিত্যজগতে এই ক্ষুদ্র গ্রামের কিছু দান আছে।

শরৎচন্দ্রের পিতা ৺মতিলাল (ওরফে নাটু) চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান অথচ আদর্শবাদী, আত্মভোলা অথচ চঞ্চল-প্রকৃতিক লোক। মতিলালের মাতৃদেবী সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে বলিয়া বিবাহিত হইয়াও অধিকাংশ সময়েই দেবানন্দপুরে পিতৃগৃহে থাকিতেন এবং মতিলালকে তাঁহার মাতুলরাই এন্ট্রান্স

পর্যন্ত লেখাপড়া শেখান ও পরে তিনি এফ-এ পর্যন্ত পাস করিয়াছিলেন। সাহিত্যচর্চায় মতিলালের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং গল্প ও কবিতা প্রভৃতি লেখার খুবই অভ্যাস ছিল ; শরৎচন্দ্র তাঁহার সমবয়স্কদিগের নিকট তাঁহার পিতার লেখা খাতাগুলি অনেক সময়েই পড়িয়া শুনাইতেন। অস্থির প্রকৃতির জন্য মতিলাল কখনও কোনও কাজে বেশীদিন লাগিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং এজন্যই তাঁহার অর্থের অভাব ছিল খুবই বেশী ও সংসারে ছিল অনটন। যদিও চিরদিনই মতিলালকে অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার মাতৃদেবী মিতব্যয়ী ও সুগৃহিণী ছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার পত্নী শান্ত-প্রকৃতির মহিলা হওয়ায় কোনও মতে তিনি গ্রামে সংসার চালাইতেন। মতিলালের মাতুলালয়েই শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় তখনও মতিলালের নিজ বাসভবন হয় নাই। পরে মতিলাল চাকুরি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে তাঁহার মাতুলগণ তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীর সংলগ্ন আন্দাজ চারিকাঠা মোকররী মৌরসী বাগানজমি বসবাসের জন্য দেন এবং সেইস্থানে তিনি দক্ষিণদ্বারী একতলা একহারা দুই কুঠরি পাকাঘর মায় রোয়াক ও প্রাচীর নির্মাণ করেন। নানাপ্রকার অভাবের ভিতর দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত বলিয়া মতিলাল ক্রমশই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং এই গ্রামেরই শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী তাঁহার বিরুদ্ধে হুগলির প্রথম মুনসেফী আদালত হইতে এক ডিক্রী পাইয়া এই বসতবাটী ক্রোক করেন। ঐ ডিক্রীর টাকা মিটাবার জন্যই মতিলাল ২২৫ টাকা মূল্যে বসতবাটীখানি তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল ৺অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা ১৩০৩ সালের ২৩শে কার্তিক সাফ কোবালায় বিক্রয় করেন।

শরৎচন্দ্রের মাতা স্বর্গীয় ভুবনমোহিনী দেবী চব্বিশ পরগনার হালিসহর গ্রামনিবাসী ৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। কেদারবাবু ভাগলপুরে তাঁহার দুই পুত্র ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাসকে লইয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। সাংসারিক অভাবের জন্য সময়ে সময়ে শরৎচন্দ্রের মাতা পুত্র-কন্যাদের

লইয়া ভাগলপুরে পিত্রালয়ে থাকিতেন। শরৎচন্দ্রের মাতুলগণও তাঁহাদের ভগিনীকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ভুবনমোহিনীর একটি বিশেষ গুণ ছিল সেবাপরায়ণতা, এজন্য দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের আত্মীয়গণ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। যে বৎসরে শরৎচন্দ্রের পিতা দেবানন্দপুরের বাটী বিক্রয় করেন, সেই বৎসরেই ভাগলপুরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্রের জীবনী প্রসঙ্গে সকল লেখকই তাঁহার ভাগলপুরে শিক্ষা-লাভকাল হইতেই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বাল্যজীবনও যে বৈচিত্র্যময় তাহা অনেকেই জানেন না। দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার সহপাঠী ও সমবয়স্ক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ অনুসন্ধানে যাহা পাইয়াছি তাহাই লিখিতেছি। তাঁহারা বলেন— বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির। তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদেরই বাটীর নিকটবর্তী প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে; একটি প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটি বসিত এবং এখানে অনেকগুলি 'পড়ুয়া' ছাত্র-ছাত্রী ছিল; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র 'কাশীনাথ' তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্বিচারে সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্ত-পনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মাস্টারমহাশয়ের বাঙলা স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল পড়েন। এই স্কুলেই যখন তিনি বোধোদয় ও পদ্যপাঠ পড়িতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ দশ বৎসরের অধিক নহে। এই সময়ে তাঁহার পিতা বিহারে কোনও স্থানে একটি চাকুরি পান ও স্ত্রী-পুত্রগণকে ভাগলপুরে রাখিয়া দেন। এই সময়েই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের বাঙলা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের শ্রেণীতে ভর্তি হন ও পরবৎসর (ইং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে)

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মতিলালও এই সময়ে আবার কার্যত্যাগ করিয়া দেশে সপরিবারে ফিরিয়া আসেন, কাজেই শরৎচন্দ্রকে হুগলি শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য ভর্তি হইতে হইল। তিনি ভর্তি হইলেন হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান Class VII) ইং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ও গ্রাম হইতে যাতায়াত করিতেন। গ্রামের অনেকগুলি ছেলেই তখন হুগলি শহরে যাতায়াত করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িত। শরৎচন্দ্র এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন ; কিন্তু এখানে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর পড়া শেষ করার সুযোগ হইল না। এই সময়ে তাঁহার পিতার ঋণভার এরূপ বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিদ্যালয়ের বেতন যোগানও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং কিছুদিনের জন্য স্কুলে পড়াও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ইং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতা পরিবারবর্গকে পুনরায় ভাগলপুরে লইয়া গেলেন এবং পুনরায় চাকুরির সন্ধানে বাহির হইলেন। শরৎচন্দ্র তাহার পর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাতুলালয়ে থাকিয়াই তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে এন্‌ট্রান্‌স ক্লাসে ভর্তি হইলেন। সুতরাং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে যোলো বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই যোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে কাটাইয়াছিলেন। দেবানন্দপুর গ্রাম হইতে যে কয়টি ছেলে হুগলি শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত তাহাদের একটি দলের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র। পাঁচ-ছয়জনে এই দলটি গঠিত ছিল ও তাঁহারা একত্রেই স্কুলে যাইতেন ; তিন মাইল কাঁচা রাস্তা ; গ্রীষ্মকালে ধুলা ও বর্ষাকালে কাদায় রাস্তাটি পরিপূর্ণ থাকিত। শরৎচন্দ্র পথে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করিতে করিতে চলিতেন এবং পথের ধারে বাগান হইতে সুবিধামত সুস্বাদু ফলও সংগ্রহ করিয়া সদ্ব্যবহার করিতেন। পথে তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য দুই-তিনটি নির্জন স্থানও স্থির করা ছিল। গ্রাম হইতে বাহিরে আসিয়াই প্রথমে তাঁহারা মিলিত হইতেন

হুগলি-সাতগাঁও রাস্তার 'মুড়া অশ্বত্থতলায়'—'দত্তা' উপন্যাসে যাহাকে 'ন্যাড়া বটতলা' বলিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, গ্রাম হইতে শবদেহ শহরে গঙ্গাতীরে সৎকারের জন্য লইয়া যাওয়ার সময়ে এইস্থানে শবাধারটি নামান হইত; কয়েকটি পাটকাঠি জ্বালাইয়া ঐ স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইত ও নিকটবর্তী 'মুন্সীবাবুদের গলায় দ'ড়ের বাগানের' কাছে একটি ডোবায় শবের অনাবশ্যকীয় বিছানাপত্র ফেলিয়া দেওয়া হইত। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে খাঁয়েদের গলায় দ'ড়ের বাগান' বলিয়া ইহার বর্ণনা আছে। এই স্থান তখনকার ছেলেদের মনে বিশেষ ভীতির সঞ্চার করিত; দুঃসাহসী শরৎচন্দ্রের দলের ছেলেরা তাঁহার সহিত 'মুড়া অশ্বত্থতলা'য় মিলিত হইয়া এই 'গলায় দ'ড়ের বাগান' পার হইয়া যাইত। গ্রামের ভিতরেও তাঁহার দলের ছেলেদের একটি গোপনীয় আড্ডা ছিল। শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবনের অনতিদূরেই সরস্বতী নদীতে যাইবার যে সদর রাস্তা আছে (হুগলি লোক্যাল বোর্ড যে রাস্তাটি শরৎ চট্টোপাধ্যায় রোড নামে অভিহিত করিয়াছেন), তাহার পার্শ্বে 'মুন্সী' জমিদারবাবুদের হেতুয়া পুষ্করিণীর সীমানাস্থিত 'গড়ের' জঙ্গলের মধ্যে নিজহস্তে মাটি কাটিয়া শরৎচন্দ্র একটি বড় রকম গর্ত খনন করেন ও তাহার ভিতর একখানি ঘরের মতন রচনা করিয়াছিলেন; এই ঘরে গ্রামের বাগান হইতে গোপনে আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা প্রভৃতি যে সময়ের যে সুস্বাদু ফল তাহা সঞ্চয় করা হইত ও বন্ধুবান্ধবদের লইয়া ঐ সকলের গোপনেই সদ্ব্যবহার করা হইত। ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরে বা অপরাহ্ণে এবং মাঝে মাঝে স্কুল পলাইয়াও সরস্বতী নদীর তীরে বসিয়া বা গ্রামের জমিদারবাবুদের 'নূতন পুকুর' বা 'দীঘি' পুষ্করিণীর পাড়ে ঝোপের আড়ালে বসিয়া তিনি ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেন; এই ছিপ তিনি নিজেই তৈয়ারি করিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া কখনও একাকী, কখনও বা বন্ধুদের সহিত ফেরি-ঘাটে পারাপারের যে ডোঙা থাকিত তাহা খুলিয়া লইয়া বা জেলেদের নৌকা তাহাদের

অজ্ঞাতসারে লইয়া নদীবক্ষে দুই তিন মাইল দূর পর্যন্ত, হয় কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আখড়া-বাটী পর্যন্ত বা সপ্তগ্রামের পুল অবধি বেড়াইয়া আসিতেন। কৃষ্ণপুরের এই বৈষ্ণবদের আখড়া-বাটী তাঁহার একটি প্রিয় স্থান ছিল এবং বন্ধুদের লইয়া বা একাকী পদব্রজেও এই স্থানে যাইতেন। এই স্থানের বর্ণনা তাঁহার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে 'মুরারিপুরের আখড়া' নামে লিখিত হইয়াছে। আমি নিজেই দেখিয়াছি যে, যখনই তিনি দেবানন্দপুরে বেড়াইতে আসিতেন, সরস্বতী নদীতীরে কতকদূর অবধি ঘুরিয়া আসিতেন। নদীতীরে তাঁহার বাল্যের অতি প্রিয় ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল বলিয়াই বোধহয়, পরিণত বয়সে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অনুরোধে রূপনারায়ণ নদীতীরেই বসবাসের জন্য নিজবাটী নির্মাণ করান।

বাল্যজীবনে শরৎচন্দ্র দুঃসাহসীও যেমন ছিলেন, কোমল হৃদয়ও তেমনি তাঁহার ছিল। আর্ত ও পীড়িতের সেবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সর্বদাই জাগ্রত থাকিত। হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে যখন তিনি পড়িতেন, তখন আবশ্যক হইলে গভীর রাত্রিতেও একাকী একটি লণ্ঠন ও একটি লাঠি হাতে লইয়া তিন মাইল নির্জন পথ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে কোনও রোগীর জন্য ঔষধ আনিতে বা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে মোটেই সঙ্কোচ করিতেন না বা রাত্রি জাগরণ করিয়া কোনও রোগীর সেবা করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার বালকসুলভ চাপল্যের জন্য যেমন তিনি গ্রামের কতক লোকের অপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার সৎসাহস ও আর্তসেবা প্রবৃত্তির জন্য তেমনি ছিলেন অনেকের প্রিয়। স্থানীয় জমিদার ৺নবগোপাল দত্ত মুন্সী মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে অভিযোগকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। নবগোপালবাবুর পুত্র স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্রও (যিনি তখন বি-এ পড়িতেন ও পরে কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে জেলা-

ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন) শরৎচন্দ্রকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তাঁহার প্রতি অতুলচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, তাঁহাদের অন্তঃপুরেও শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল এবং মহিলাগণও তাঁহাকে বাড়ির ছেলের ন্যায়ই আদর-যত্ন করিতেন। দেবানন্দপুরের আর একটি কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনে মেলামেশা ছিল এবং এই বাটীর একটি ছেলের সহিত তিনি প্রায়ই দাবা খেলিতেন। এই ছেলেটির কনিষ্ঠা ভগিনী—শরৎচন্দ্র যে সময়ে পাঠশালায় পড়িতেন সেই সময়ে—ঐ পাঠশালারই ছাত্রী ছিলেন এবং তখন হইতেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্বদাই সঙ্গিনীর ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেন—দুইজনের ভাবও ছিল যত, ঝগড়াও হইত তত। নদীর বা পুকুরের ধারে ছিপ নিয়ে মাছ ধরা, ডোঙা বা নৌকা নিয়ে নদীবক্ষে বেড়ান, বৈঁচি ফল পেড়ে মালা গাঁথা, বাগান থেকে গোপনে ফল সংগ্রহ করা, ঘুড়ির সুতা মাজা ও ঘুড়ি তৈয়ার করা, বনজঙ্গলে বেড়ান প্রভৃতি সকল রকম বালকসুলভ চাপল্যের কাজে এই মেয়েটিই ছিল শরৎচন্দ্রের সহচারিণী। এ কারণেই বোধহয় এই শৈশব-সঙ্গিনীর প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কয়েকটি নারীচরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। গানবাজনায়ও এই বয়সেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল। গ্রামের ভিতরে গানবাজনার নিয়মিত চর্চার সুযোগ ছিল না বলিয়া একবার তিনি বাটী হইতে পলায়ন করিয়া এক যাত্রার দলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসা হয়।

এই সকল ব্যাপার হইতে এখন মনে হয় যে, শরৎচন্দ্রের ভিতর বাল্য বয়স হইতেই অসামান্য প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল ; কিন্তু গ্রামের তখন অনেকেই বুঝেন নাই যে, এই পাড়াগেঁয়ে 'ডানপিটে' ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙলা সাহিত্যে বড় কিছু দান

করিয়া যাইবেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু দুইজন বলিলেন যে, যখন শরৎচন্দ্র হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখনই তিনি 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' নামক দুইটি গল্পের আখ্যানভাগ (plot) লিখিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন—তবে কোন্ গল্পটি প্রথম লেখা তাহা তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, 'কাশীনাথ' গল্পের নায়কের নাম তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই তাঁহাদের পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয়ের পুত্রের নামানুযায়ী রাখা হয়; সুতরাং শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও ভাগলপুরের বন্ধু শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিয়াছেন ঐ গল্প দুইটি ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে পড়ার সময় লিখিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নহে; হইতে পারে ঐ সময়ে ঐ দুইটি গল্প মার্জিত আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের এই দুইটি বাল্যবন্ধু আরও বলিলেন যে, তাঁহার 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের চিত্রটিও এই গ্রামের ৺মৃত্যুঞ্জয় মজুমদারের তখনকার কাহিনী হইতে কতকাংশে গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার "পল্লীসমাজে" কেষ্টা বোষ্টম নামে যে একটি লোকের উল্লেখ আছে সেও এই গ্রামে তখন বাস করিয়া মালা, ঘুন্‌সী, আয়না ফেরি করিয়া বেড়াইত।

শরৎচন্দ্রের শেষজীবনে জন্মভূমির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসরই তিনি দুই-একদিন গ্রামে বেড়াইতে আসিতেন এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের কাহারও বাটীতে কিছু সময় কাটাইতেন ও তাহার পর একবার নদীর তীরে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক বাংলা ১৩৩৫ সালে তাঁহার জয়ন্তী দিবসে স্থাপিত "শরচ্চন্দ্র পল্লী পাঠাগারটি" পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। এই পাঠাগার স্থাপিত হওয়ার পর তিনি একটি আলমারি ও নিজ উপন্যাস ছাড়াও কতকগুলি বাঙলা পুস্তক পাঠাগারে দিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা ছিল পরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটস্থ আর একখানি ছোট বাড়ি খরিদ করিবেন এবং তাহারই

একাংশে এই পাঠাগার স্থায়িভাবেই স্থান পাইবে। তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী এই পাঠাগারটি অবৈতনিক করা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"ওরে গ্রামের লোকের আগে চোখ ফুটিয়ে দে, তবে তারা নিজেরাই বুঝবে নিজেদের ভালো মন্দ, যারা এখন দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না, তারা কি চাঁদা দিয়ে বই পড়বে? নাই বা হ'লো অনেক বই, কিছু কিছু করে ভালো বই যোগাড় কর।" তাঁহার কথাই এই পাঠাগারের পরিচালকগণ মানিয়া আসিতেছেন; শরৎচন্দ্রের ভক্ত লেখকগণ অনেকেই ইচ্ছা করিলে এই পাঠাগারটিকে সাহায্য করিতে পারেন।

যখন আমি বালীগঞ্জে শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি আমাকে দেবানন্দপুরে বাড়ি খরিদ করার ব্যাপারে অগ্রসর হইতে বলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

ভারতচন্দ্রের ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার বেদীপীঠ দেবানন্দপুর গ্রামকে আজ দুর্ভাগা দেশ বলিতেই হইবে।

স্মৃতির রেখা মোছে না কখনো। অনেক দিনের হলেও মনে পড়ছে বেশ। সেই কথাই আজ বলবো। ছুটি নিয়ে এসেছি এখানে—হাওড়ায়। শুনলুম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায় হাওড়াতেই থাকেন। সে ১৯২০ সালের কথা। হাওড়ায় যখন থাকেন, দেখা করতেই হবে। কিন্তু হাওড়ার কোথায় কি, কিছুই জানি না। নতুন এসেছি। সন্ধান করে জানলুম, থাকেন তিনি বাজেশিবপুরের এক জায়গায়। বাজেশিবপুর! এ আবার কি নাম! চললুম, বাজে-শিবপুরের খোঁজে। জিজ্ঞাসা করি, কেউ কিছুই বলতে পারে না। খুঁজেই চলেছি। শেষকালে এক ভদ্রলোক বললেন, শরৎ চাটুজ্যের কাছে যাবেন? চলুন দেখিয়ে দিই। নিয়ে সেঁধুলেন এক সরু গলির ভেতরে। বললেন, ওই শরৎবাবুর বাড়ি। যান ভেতরে। ভেতরে ঢুকে দেখি, এক মোটা কুকুর শুয়ে রয়েছে—পরে জানলুম, সেই হ'লো শরৎবাবুর ভেলু কুকুর। শরৎবাবু বাড়ি নেই। "দেখুন তো পাশের বাড়িতে—সেখানে আছেন হয়তো।" একজন চললেন সঙ্গে। দেখলুম, সরু গলির ভেতর ছোট্ট এক বাড়ির রকে বসে কথা কইছেন কয়েকজন ভদ্রলোক। চিনি না তো! লোকটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওই তো রয়েছেন। খালি গা, হুঁকো হাতে। বসলুম। এক ভদ্রলোক আপিস থেকে চা এনেছেন, তাই নিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কতো?" "বারো আনা।" "কালকের মতো তো? ভালো চা? আরো এক প্যাকেট আনবেন কিন্তু কাল।" আমার সঙ্গে পরিচয় হ'লো। বললাম, "আপনার নাম শুনেছি, তাই দেখা করতে ইচ্ছে হ'লো। আমি থাকি না এখানে।"

"এখানে থাকেন না। আলাপ করতে চান? বেশ, আসুন এক সময়; আজ বেলা হয়ে গেছে—স্নান করতে হবে।"

বাড়ি তো দেখেছি। আর একদিন সকাল সাতটায় গিয়ে হাজির। "আসুন, আসুন—বসুন!" সেটা ছিল ছুটির দিন। দেখলুম, অনেকগুলি ভদ্রলোক রয়েছেন। ভেলু পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে দরজার সামনে। ঘরখানি বেশ সাজানো-গোছানো। কার্পেট পাতা। ভেতরের ঘরে বেশ ভালো এক টেবিল। সামনে ভালো একখানি চেয়ার। লেখার সরঞ্জাম রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ঘরখানি বিলাস-বর্জিত। অথচ বেশ সাজানো পরিষ্কার। দেখলাম, বেশ মজলিসী গল্প হচ্ছে। শরৎবাবু চমৎকার কথা-কইয়ে লোক। খুব রসান দিয়ে ট্রেনে যাবার গল্প বলছেন। বললেন, ট্রেনে উঠলাম, কী ভিড়! একজন পায়ে-হাতে মোজা-দস্তানা এঁটে, পট্টুর কোট পড়ে, মাথায় পট্টি বেঁধে, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে অন্ততঃ আড়াই জনের জায়গা নিয়ে বসেছে। আমি তাকে বললুম, একটু সরে বসুন পোঁটলা-পুঁটলি সরান, আমায় একটু বসতে দিন। লোকটি ঘাড় নেড়ে বললে, পোঁটলা সরাবো?—কেন? আমি বললুম, আচ্ছা ছোটলোক তো! সরাও পোঁটলা—আমি বসি। আপনি কে মশাই, আমাকে ছোটলোক বললেন? এই বলে চোখ পাকিয়ে উঠলো। আমার সঙ্গীটি বললেন, ওহে শরৎ, থাক থাক, তর্ক করতে হবে না। এখানে এসো। পাশের জায়গায় গিয়ে বসলুম। সে লোকটি তবু ছাড়ে না। আমায় বলছে, আমায় আপনি ছোটলোক বলেচেন। আপনার নাম শরৎ। শরৎ কি? আমার সঙ্গীটি বললেন, উনি শরৎ চাটুজ্যে, ভালো লেখক, নাম শোনেননি? আর যায় কোথায়! অ্যাঁ, আপনি শরৎ চাটুজ্যে? লেখক? আপনি আমায় ছোটলোক বললেন, একথা আমি সকলকে বলবো—বলবো। কী সর্বনাশ! আরে থামুন মশাই—থামুন। থামবো কেন? বলবো আমি সকলকে। এ তো মহাবিপদে পড়া গেল। সঙ্গীকে বললুম, তুমি আমার নাম বললে কেন বলতো? এখন ওকে সামলাও। সঙ্গীটি তখন তাকে বোঝাতে লাগলো। মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে কথাটা, ঠেলাঠেলির

সময়। কিছু মনে করবেন না—মাফ করুন। এইরকম অনেক করে বোঝাতে তবে সে ঠাণ্ডা হয়। দেখুন তো মশাই কী হাঙ্গামা! কখনো এমন হয়নি। হঠাৎ হয়ে গেল সে-বার।" দেখলুম শরৎবাবু খুব মজলিসী লোক। এমন রসালো আর মধুর করে বলতে লাগলেন যে সকলে হেসেই অস্থির।

গল্পও চলছে—চা-ও চলছে, তার সঙ্গে রুটি মাখন। সেদিন আর কোনো কথা হ'লো না। বললুম "আবার কখন আসব?"

তিনি বললেন, "যখন ইচ্ছে এসো না হে!"

সেদিন রবিবার। সকালবেলায় গেলুম। গিয়ে দেখলুম, অনেক লোক জমেছেন। খুব গল্প চলছে।

বললেন, এসো হে, বসো। গল্প চলছে, কিসের গল্প? গুরুজীর জাহাজ ভক্ষণের গল্প। বলছেন, ভাসানপুরের কথা, আর এক গুরুজীর কথা।

গুরুজীর বহু শিষ্য-সেবক। সবাই থাকেন তটস্থ। গুরুজী একদিন বললেন, দেখ, গঙ্গামাঈর পূজা করতে হবে। তার ব্যবস্থা কর দেখি।

শিষ্যরা বললেন, সে আর বেশী কথা কি! কালকেই করছি। এই বলে, পূজার নৈবেদ্য, নানা উপকরণ—নানা রকমের ফুল সব হাজির করলো শিষ্যেরা। পূজার ব্যবস্থা হ'লো গঙ্গা ঘেঁষে।

গুরুজী পূজায় বসলেন। শিষ্যরাও ঘিরে বসেছে সব। এমন সময় ভীষণ গর্জন করতে করতে, জল তোলপাড় ক'রে, এক বড় জাহাজ এসে পড়লো সেই ঘাটে। রোজই আসে, আজও এলো। আর ঘাটের ধার দিয়ে যাবার সময় জল তোলপাড় করে, ভীষণ ঢেউ তুলে, গুরুজীর গঙ্গাপূজার নৈবেদ্য, উপকরণ, ফুলটুল সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। গুরুজী তো রেগেই অগ্নিমূর্তি। আস্ফালন করে বললেন, আচ্ছা! জাহাজ, কাল তুমি এসো—তোমার মুণ্ডু খাব আমি, তবে আমি গুরুজী! কাল আমি জাহাজকে জাহাজ

খেয়ে ফেলবো, তবে আমার নাম! শিষ্যরা গুরুজীর রাগ দেখে, আর জাহাজ খাওয়ার কথা শুনে ভেবেই অস্থির।

পরদিন জাহাজ আসতে লাগলো দূরে। গুরুজী তাই দেখে এক হাঁটু জলে রইলেন দাঁড়িয়ে। সে তাঁর কী রুদ্রমূর্তি! জাহাজ আসুক, এলেই খাব। তারপর ভীষণ গর্জন করতে করতে জাহাজ আসতে লাগলো। গুরুজী বিরাট এক হাঁ করে এগুতে লাগলেন। এমন সময় হ'লো কি, গুরুজীর জনকয়েক শিষ্য আর সেবিকা মহা আকুল হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে গুরুর পায়ের তলায়, সেই জলের মধ্যে লুটিয়ে পড়লো। বললো, এ কি করছেন আপনি গুরুজী? জাহাজ খাবেন? জাহাজে কত নিরীহ ছেলে-পিলে, মেয়ে-মানুষ, কত ভালো-মানুষ লোক সব আছে। তারা তো কোনো অপরাধ করেনি। জাহাজ খেতে হলে, তাদের সব খেতে হবে। তাদের কি দোষ? আপনি এত বড় গুরুজী, আপনার কি এ কাজ সাজে? ক্ষান্ত হোন। ক্রোধ সম্বরণ করুন। মাফ করে দিন জাহাজটাকে। ও জড় পদার্থ, ও কি বোঝে!

গুরুজী চোখ বড় বড় করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক বলেছিস তোরা। নিরীহদের খাব না—জাহাজটা খাব না তাহলে। যাক। তোদের কথায় ওকে ছেড়ে দিলাম। জাহাজ ততক্ষণে এসে পড়েছে। জাহাজটা ভীষণ গর্জনে ভয়ানক ভয়ানক ঢেউ তুলে গুরুজী আর শিষ্য-সেবিকাদের ভিজিয়ে দিয়ে সেখান দিয়ে চলে গেল। গুরুজী হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বললেন, "যা, যা, এ যাত্রা বেঁচে গেলি।" তাঁর মুখে এই গল্প শুনে সবাই হেসে লুটোপুটি।

শুনেছি, শরৎচন্দ্রের গলার স্বর খুব মিষ্টি, খুব সুন্দর গান করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মুখে গান শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। তবে তিনি ছিলেন গল্পের রাজা। অফুরন্ত গল্প শোনা যেতো তাঁর কাছে।

তিনি সত্যি গল্পও বলতেন, মনগড়া গল্পও বলতেন, আর সে সকল গল্প শুনতে অতি চমৎকার লাগতো।

গল্প বলাতে তাঁর এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, লোক শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতো। আর একটি গল্প। এ গল্পটি তাঁর নিজের কাছে শোনা নয়। অনেক পরে অন্যের মুখে শোনা। গল্পটি "চরিত্রহীন" থেকে একজনের চরিত্রগঠনের কথা। গল্পটি নিজের ভাষায় বলি।

শরৎচন্দ্র তখন বেনারসে গেছেন বেড়াতে। রসরাজ সুসাহিত্যিক কেদারনাথ, 'উত্তরা' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র, আরো-আরো সব সাহিত্যিক জমায়েত হন রোজ গল্পের আসরে। সাহিত্যের কত গল্প হয়, আলাপ হয়—আমোদ-আহ্লাদের মধ্য দিয়েই প্রত্যহ সময় কাটে। শরৎচন্দ্র এসে হাজির হন, সে দেশের বাহন টোঙ্গায় চড়ে। টোঙ্গাওয়ালা রাস্তায় দাঁড়িয়েই থাকে। শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যাবেন তো। তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। দেরি হচ্ছে? তা হ'লোই বা দেরি! বাবুটি খুব সমঝদার। টাকাকড়ির পরোয়া নেই ওঁর। একদিন সেখানেই হ'লো আহারের নিমন্ত্রণ। বেলা সাতটা থেকে দুপুর হয়ে গেছে। টোঙ্গাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে! তার আর কি! বাবু যখন বেরুবেন, তখন টোঙ্গায় উঠবেন। বাড়িতে গিয়ে আবার হয়তো বলবেন 'তুম্ ঠহর যাও, মৈঁ যাউঙ্গা ফির।' কিন্তু কখন যাবেন তার কি ঠিক! তা সে দাঁড়িয়েই থাকে। তার আর কি! বাবু টাকা-কড়ি যা দেন, তা আর তো কেউ দেয় না। বাবুর খুব দরাজ দিল।

একদিন কেদারনাথের আস্তানায় গেছেন। গল্প-সল্প করে আস্তানা থেকে বেরিয়ে বেলা দশটা নাগাদ টোঙ্গায় উঠতে যাবেন, এমন সময় দুটি ভদ্রমহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন। একজন বর্ষীয়সী, অপরটি নবীনা। নবীনা শরৎচন্দ্রের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। শরৎচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমাদের তো চিনতে পারছি না মা! কি দরকার বলো।

নবীনাটি ধীর নম্র স্বরে বললেন—আপনাকে খুব ভক্তি করি, মান্য করি, শ্রদ্ধা করি। তার কারণ কি জানেন ?

শরৎচন্দ্র উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

নবীনা বলতে লাগলেন—জানেন, আপনার একটি বই পড়েই আমার মুক্তি হয়েছে, আমি বিপথে যেতে-যেতে বেঁচে গেছি। আপনার বইটির এমনি প্রভাব।

শরৎচন্দ্র শুনে অবাক হলেন। বললেন—আমার বই পড়ে ? কোন্ বই পড়ে ?

—সে অনেক কথা। এখানে বলবো কি করে। আপত্তি না থাকে তো আমার বাড়িতে চলুন। সেখানে গিয়ে বসে-বসে সব শুনবেন।

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহভরে স্ত্রীলোক দুটির সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গেলেন। বাড়িটি চমৎকার। তাঁকে তারা আদর করে সুখাসনে বসালেন। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর সুমুখে ছোট টেবিলের উপর কিছু মিষ্টান্ন ও জল রেখে, নবীনা আপনার কাহিনী বলতে লাগলেন।

আমার পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, অবস্থাপন্ন। আমি তাঁর আদরিণী কন্যা। খুব বাল্যবয়সে আমার বিবাহ হ'লো, কিন্তু স্বামী গত হলেন অল্প দিনেই। বয়স অল্প, কিছুই বুঝলুম না। বিচারশক্তি তখন কোথায়! পিতার কাছেই থাকি। পিতা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। মায়ের আমি চক্ষের মণি। আদরেই থাকি। এইভাবেই দিন যায়।

অনেকদিন পরে, তখন আমার বয়স হয়েছে। এক আত্মীয় তরুণ যুবক এলো আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়িতেই তিনি মাঝে মাঝে থাকেন, আবার চলেও যান। ঘন ঘন আসেন কিন্তু। আমাদের নিকট-আত্মীয়। মেলামেশাতে বাধা নেই। কিন্তু মেলা-মেশা করতে করতে তাঁর সঙ্গে ভাব হ'লো। তাঁর দিকে প্রাণের

টান পড়লো। এইভাবে দিন যায়। ক্রমশঃ সে টান বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে হ'লো ভালবাসা—একেবারে ভালবাসা। একদিন হু'জনে মিলে স্থির করলাম, এখান থেকে চলে যেতে হবে। এ বাড়িতে থাকা হবে না। হু'জনে পালিয়ে গিয়ে এক জায়গায় থাকবো। সেই হবে বেশ। সেই হবে মনের মতো। স্থির হ'লো, রাত্রি হুটার সময় সে এসে দরজায় ঘা দিয়ে ইঙ্গিত করবে। আমি সেই ইঙ্গিতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়বো, আর তার সঙ্গে পালাবো।

নির্দিষ্ট দিন এলো। বাবা-মা আর ভাইবোনেরা সব খাওয়া-দাওয়া সেরে ন'টার পর ঘুমিয়ে পড়েন। আমি কোনো বই নিয়ে পড়ি। পড়তে পড়তে ঘুমোই। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমার ভাই এই বই এনে দিয়ে গেল আমায়। বইখানি বেশ বড় ; লেখক— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; বইখানির নাম "চরিত্রহীন"।

শরৎচন্দ্র মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে মিষ্টিগুলি এতক্ষণে শেষ করেছেন। এখন তাঁর "চরিত্রহীন"-এর নাম শুনে চমকে উঠে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মেয়েটি বলে যেতে লাগলেন, "চরিত্রহীন" পড়তে শুরু করলুম। রাত হুটো অবধি জেগে থাকতে হবে তো। জেগে থাকবার উপায় হ'লো বই পড়তে পড়তে জেগে থাকা। অন্য সবাই তো ঘুমিয়েছেন। আমি বই পড়তে লাগলুম। একেবারে নিবিষ্ট হয়ে গেলুম বইটির মধ্যে। এমন নিবিষ্ট যে, আর কোনো-কিছুরই খেয়াল রইলো না। কী চমৎকার লাগছে !

কখন একটা বেজে গেছে—খেয়াল নেই। হুটো বেজে গেছে—খেয়াল নেই। তিনটা চারটা বেজে গেছে—তবুও খেয়াল নেই। পড়েই চলেছি তন্ময় হয়ে। ভোর হ'লো—ছ'টা বাজলো—তবু পড়ে চলেছি। শেষ হচ্ছে না বই। একজন এসে কড়া নাড়লো। কে ? দরজা খুলে দেখি—মা। তাই তো! তখন হুঁশ হ'লো যে,

সকাল হয়ে গেছে। সেই আত্মীয়টি রাত ছুটোয় এসে দরজায় ঘ মেরে ইঙ্গিত করেছিল নিশ্চয়। কিন্তু তা শুনতেই আমি পাইনি। বই পড়েই চলেছিলুম।

এই বইটির শিক্ষণীয় বিষয় থেকে চমৎকার একটি শিক্ষা পেয়ে গেলুম আমি। এই শিক্ষা যে, আমার গৃহত্যাগ হতে পারে না—গৃহত্যাগ অসম্ভব। এতে অমঙ্গল, অকল্যাণ। বাবা-মার মনে কত কষ্ট। বাবা-মাকে কি ছেড়ে যাওয়া উচিত? অবশ্য' উচিত নয়। যাই নাই আমি। সঙ্কল্প আমার দৃঢ় হয়ে গেল 'চরিত্রহীন'' বই পড়ে যে, গৃহত্যাগ করা চলতে পারে না। অতএব পূর্ব-ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। আত্মীয়কে সে কথা জানিয়ে দিলাম।

তারপর? বাবা-মাকে আগের চেয়ে ভক্তি করতে লাগলাম। ভালো মেয়ে হয়ে রইলাম। বাবা-মা এখন নেই; অনেকদিন গত হয়েছেন। কিন্তু আমার এই কল্যাণময় জীবন আপনার "চরিত্রহীন"-এর কল্যাণে। এই কথা বলে মেয়েটি শরৎচন্দ্রের পায়ের উপর নত হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। শরৎচন্দ্র বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন।

''চরিত্রহীন''কে অনেকেই মন্দ বলেন। বলেন, এ বই পড়ে লোক খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু "চরিত্রহীন"-এর এই এক কল্যাণকর দৃষ্টান্ত। এটি গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

* * *

একদিন গেলুম ছুপুরের পর। সেদিন রবিবার। তাঁর লেখার কথা হ'লো। বললেন লেখেন তিনি রাত্রিবেলা। দিনের বেলা লোকজন আসেন, গল্পে সল্পেই কেটে যায়। জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কি কিছু লেখো? লেখার অভ্যেস আছে? আমি বললুম—লেখার অভ্যেস তেমন নেই। তবে মাঝে মাঝে "প্রবাসী", "মানসী", ও "মর্মবাণী" প্রভৃতিতে ছোটখাটো লেখা দেই। সমাজপতি মহাশয়ের 'বসুমতী" কাগজে অনেক আগে লেখা দিতুম।

বললেন, সমাজপতি? সমাজপতি ছিলেন বিচক্ষণ সম্পাদক। তবে দোষও ছিল ঢের। খুব রবীন্দ্র-বিদ্বেষী ছিলেন। এসব ভালো নয়। যাক। এখন কিছু লিখছ?

—ইবসনের Doll's House নিয়ে লিখছি।

কি করছো? অনুবাদ?

—অনুবাদ ঠিক নয়। বাংলার ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাতে আনতে চাই—Doll's House-এর বিষয়বস্তুটা। শুনে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—ভাব নিয়ে চেষ্টা করতে পার। তবে অনুবাদ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। অনুবাদের কাজে যেও না।

—কিন্তু অনুবাদে তো শিক্ষণীয় আছে অনেক। অরিজিনাল লেখা তো সহজ কথা নয়। অনুবাদ করতে করতে যদি কিছু হয়।

—একেবারেই কি হবে? ক্রমশঃ হবে। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন এই আমারই কথা ধর না। প্রথম প্রথম কী বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি! ক্রমশঃ সাহিত্যের দিকে ঝোঁক গেল। এ ঝোঁক আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া—অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে। তাঁর গুণাবলী সকলে জানতেন না। ছিলেন সাদাসিধে মানুষ। ছেলেবেলায় একবার তাঁর তোরঙ্ হাতড়ে তাঁর অনেক কিছু লেখা পাই, আর তাতে তাঁকে বুঝতে পারি।

এই বলে আবার খানিকক্ষণ চুপ করলেন। তারপর বললেন—প্রথম প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতুম আর ফেলে ফেলে দিতুম। অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া কই তেমন হয়েছে! বাবা মারা যাওয়াতে বিপদ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ছন্নছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

আবার চুপ করে গেলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—আমি বাপু, অত-শত জানি না! লেখাপড়াই বা কি করেছি? সাদাসিধে-ভাবে শুধু মনের কথা লিখে যাই। মনে যা অনুভব করি বা উপলব্ধি করি, তাই প্রকাশ করি আমার সোজা সাদাসিধে কথায়—।

এরপর আরো কি বলতেন জানি না, এমন সময় হঠাৎ কবি গিরিজাকুমার এসে হাজির হলেন। প্রসঙ্গটা অন্য দিকে চলে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার যে, শরৎচন্দ্র রেখে-ঢেকে কথা কইবার মানুষ ছিলেন না। তাঁর কোনো রকম ঢং বা চাল দেখিনি আদবেই। তাঁর সঙ্গে বসে কথা কইলে, তাঁকে অসাধারণ মানুষ বলে বোঝা যেতো না। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি অসাধারণই ছিলেন।

আর একদিন গেছি তাঁর বাড়িতে। বসে বসে কথা হচ্ছে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে স্ত্রীলোকের কান্না উঠলো। আমি বিস্মিত হয়ে চাইলাম। বললেন দিদি যাচ্ছেন বাড়ি। একজন মারা গেছেন, তাই কাঁদছেন।

— এখানে মারা গেছেন? জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

বললেন—এখানে নয়, গ্রামে—সামতাবেড়ে, দেউলটির কাছে।

গল্প করতে করতে বিকেল হ'লো। বললেন—চলো হে, একবার থানায় যেতে হবে। থানায় যেতে হয়—সপ্তাহে একবার দেখা দিতে হয়।

যেতে-যেতে ছোট্ট একটা পুকুর পড়লো। পাড়াগাঁয়ের মতো জায়গা। একটি মেয়ে এসেছে পুকুরে কলসী নিয়ে। শরৎবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন। আমি তো অবাক। এত দেখছেন কি? আর দেখা কি উচিত? একটু পরে বললেন—চলো যাই।

তিনি গেলেন থানার দিকে। আমি চলে এলুম।

তারপর একদিন ভোজের নেমন্তন্ন এলো। নেমন্তন্ন করতে এসেছেন কবি গিরিজাকুমার বসু। এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আগে। গিরিজাবাবু বললেন - যাবেন অবিশ্যি। জলধরদাদা, মণি গাঙ্গুলী, নরেন্দ্র দেব, আরো অনেকে আসবেন। আমারই বাড়িতে যাবেন। শরৎবাবুর ওখানে জায়গা হবে না তো।

শরৎবাবুর বাড়ির কাছেই গিরিজাবাবুর বাড়ি। বেশ সুন্দর

দোতলা বড় বাড়ি। গেলাম সেখানে। কলকাতা হতে সাহিত্যিকরা সকলেই এসেছেন। জলধর সেন, নরেন্দ্র দেব, মণি গাঙ্গুলী ইত্যাদি বহু সাহিত্যিকের সমাবেশে মজলিস খুব জমলো। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন। শরৎবাবু উপস্থিত রইলেন সর্বক্ষণ। খুব আনন্দ হ'লো।

আমার ছুটি ফুরুলো। চলে গেলুম।

এর ছ'বছর পরে দিল্লীতে হবে কংগ্রেস। দেশবন্ধু সদলে হাজির হলেন। সুভাষচন্দ্র, ভূপতি মজুমদার, দিলীপকুমার, কুমুদশঙ্কর প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত-বিখ্যাত সবাই আছেন সঙ্গে। Forward-এর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি কংগ্রেসের প্রত্যেক ক্যাম্পে। একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার। একজন এসে বললেন—ওহে, শরৎবাবু এসেছেন। তোমার খোঁজ করছিলেন।

—তাই নাকি।

—কংগ্রেস ক্যাম্পে তিনি ওঠেননি। রেলওয়ে ওভারসিয়র গাঙ্গুলীমশাইয়ের বাসায় উঠেছেন।

গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখলাম গাঙ্গুলীমশায়ের বাড়িখানি আছে, কিন্তু তিনি নেই— কেউই নেই। গেছেন ছুটিতে, দেশে। শরৎবাবু দেখলুম, এখানে দিব্যি সেজে বসে গেছেন। ঢুকেই দেখলাম বারান্দার একধারে অন্ততঃ দশ-বারো জোড়া রকমারী ধরনের জুতো সার দিয়ে সাজানো রয়েছে। নজর পড়ে প্রথমেই। আমারও নজর পড়লো। শরৎবাবু বললেন—আমারই হে সবগুলো। তাঁর চাকর ছিল সামনে দাঁড়িয়ে। এই কথা বলে, চাকরের দিকে চেয়ে হাসলেন। তারপর আমায় বললেন—এসো। এ বাড়ি তো খালি। কেউ নেই। যাক, চাকর আছে, আমার চলে যাবে এক রকম। কংগ্রেস-ক্যাম্পে গেলুম না। এখানেই থাকা যাক। কি বলো?

আমি আর কি বলবো। বললুম—কংগ্রেসে থাকেন না?

তিনি বললেন—না। 'আজ' কংগ্রেস 'নেই'। থাকলেও যেতাম না।

আমি এলাম শুধু দলে পড়ে—বেড়াতে। তা এখানটাতে বেশ লাগছে।

দেখলুম খুব বড় বড় দু'জোড়া আঙ্গুর একটা থালার উপর রাখা রয়েছে। খানিক পরে ভূপতি মজুমদার মশায় এলেন। এসে বসলেন। কথা কইতে কইতে বললেন—ভাইতো, এ যে দেখছি বড় বড় আঙ্গুর! এ কোন দেশে এলাম! আমাদের দেশে ছোট বাক্সের ভেতর আঙ্গুর আসে, বাড়িতে অসুখ করলে। তার ভেতর আটটা ভালো—শুকনো-শুকনো; ছোট ছোট; আর চারটা পচা। এ কোন্ দেশে এলাম মশাই।

তারপর কংগ্রেসের কথা উঠলো। তিনি বললেন—আমি হলুম সেক্রেটারি আর আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট হলেন একজন আই. সি. এস. (অর্থাৎ সুভাষবাবু)। বেশ আছি। দেখুন কি দাঁড়ায়।

একটু পরে দিলীপকুমার রায় এসে হাজির। তাঁর চেহারাটি শুকনো-শুকনো। বেলা হয়ে গেছে। তিনি বললেন—মুশকিলে পড়ে গেছি। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকেরা তাঁদের বাড়িতে আমায় ধরে নিয়ে যান গান শোনাতে। মজলিস হয়, গান করি। কিন্তু গানের শেষে খেতে দেয় গোটাকয়েক রসগোল্লা। দিয়ে বলেন—এই দেখ তোমাদের রসগোল্লা। আমার রসগোল্লা খেয়ে-খেয়েই দু'দিন কেটেছে। ভাত খাইনি আদবেই।

শরৎবাবু বললেন ভালো কথাই তো, তুমি তাদের গান শোনাও মিষ্টি, তারাও তোমায় খেতে দেয় মিষ্টি। তা বেশ হয়েছে। আচ্ছা, আমার এখানেই খাও।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কংগ্রেস-ক্যাম্পে হিন্দু কলেজে বিরাট এক গানের মজলিস হ'লো। দিলীপকুমার তাঁর পুলকিত মধুর কণ্ঠে অপূর্ব-অপূর্ব গান শুনিয়ে সকলকে মাতিয়ে দিলেন। সকল বাঙালী ভদ্রলোকই প্রায় এসেছিলেন। শরৎবাবু অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের বাড়িতে

সকলের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ হ'লো। কুমুদশঙ্কর রায় হলেন অধ্যক্ষ মহাশয়ের আত্মীয়। সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কুমুদশঙ্কর প্রভৃতি আরো আরো অনেকেই উপস্থিত। সম্মানিত অতিথিদের নিমন্ত্রণ। বিপুল ঘটা হয়েছে -খুব আয়োজন। সকলে খেতে বসলেন। খাওয়ার সময় গল্প হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রের পাশেই বসেছেন শরৎবাবু। সুভাষ-চন্দ্রের খদ্দরের বেশ—খদ্দরের জামা, খদ্দরের ধুতি ; খুব মোটা-সোটা, তা হোক। শরৎবাবু দেখছেন আর বলছেন ধীরে ধীরে অল্প কথায়। —খদ্দর না হলে সুভাষকে মানাবে কেন ? একটু মোটা হয়েছে, তা মানিয়েছে কিন্তু বেশ। খাঁটি জিনিস একটু মোটা হয়ই। সুতো হবে চরকায় করে হাতে কাটা, তারপর তা হবে হাতে বোনা। সেই তো আসল, সেই-ই তো খাঁটি। খাঁটি জিনিস মোটা হয়— তা না হয় হ'লোই। ওহে ভূপতি! নজর রেখো তোমরা। খুব মোটা হবে ? হ'লোই বা। ছোট হবে একটু ? তা না হয় একটু হ'লোই। কিন্তু খাঁটি খদ্দর না হলে কি সুভাষের চলে ?—তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে সকলের কী হাসি! খাওয়া চললো, গল্পও চললো শেষ পর্যন্ত।

একদিন খুব সকালে গেলুম তাঁর কাছে। বললেন - এসো। তারপর পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের তাজমহল' থেকে খানিকটা। তারপর বললেন—দেখ, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই আমার মুখস্থ। কত শ্রদ্ধা করি কবিকে। লোকেরা কিন্তু রটায় অন্যরকম। লোকেরা বলে তো তার কি করা যাবে! দেখ, আমি পাস করিনি তেমন কিছু। কিন্তু পড়েছি যে ঢের, দেখেছিও ঢের।

আমি বললুম —আপনার দৃষ্টিশক্তি খুব চমৎকার। এমন নিখুঁত দৃষ্টি [illegible] তো দেখা যায় না।

বললেন—দৃষ্টি কি অমনি হয়েছে ? অনেক কিছু করতে হয়েছে। রেঙ্গুনে থাকতুম। সন্ধ্যের পর আড্ডা জমেছে বিরাট। পঁচিশ-ত্রিশজন

হবে। সবাই বাঙালী। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এলো একজনের নামে। কিন্তু মজা এই, সেখানকার কোনো লোকটারই টেলিগ্রাম পড়বার মতো বা বোঝাবার মতো বিদ্যে নেই। আরো মজা এই, আমি যে টেলিগ্রাম পড়তে পারি সেকথাটা তাদের ভেতর কেউই জানে না। এমনিভাবে মিশেছি, তবে তো সব পেয়েছি।

তাঁর কথায় আমি খুব অবাক হলুম। এই ধরনের আরো কত কথা তিনি বললেন সেদিন। তারপর আমি বললুম—আমাদের এখানকার লাইব্রেরিতে একবার আজ সন্ধ্যেবেলায় চলুন না। সবাই আপনাকে দেখতে চান, আলাপ করতে চান।

একটু ভেবে তিনি বললেন—আচ্ছা বেশ, যাবো। তবে আমাকে বলতে-টলতে কিছু ব'লো না। তা হলে যাবো না।

বললুম—আপনাকে বলতে হবে না কিছু। শুধু বেড়াতে যাবেন। গল্প-সল্প করবেন শুধু। কোনো ঝঞ্ঝাট হবে না আপনার।

—আচ্ছা, আচ্ছা—যাবো। ঠিক যাবো। কিন্তু আমার ছবি টাঙাবে তো?

—বাঃ, সেকি কথা! আপনার ছবি নেই মনে করেন আমাদের লাইব্রেরিতে? আমাদের লাইব্রেরি খুব ভালো, খুব বড়, বিশিষ্ট লোকেরা তার সভ্য।

শরৎবাবু বললেন—আচ্ছা যাবো।

সন্ধ্যেবেলায়, বিশিষ্ট সভ্যেরা সবাই একে একে উপস্থিত হয়েছেন লাইব্রেরিতে। শরৎবাবুর আসবার অপেক্ষা।—কই তিনি? হঠাৎ এসে পড়লেন। এসে হাসতে হাসতে বললেন -দেখলে তো এসে পড়েছি। কিন্তু তিনি এসেছেন কি বেশে? এক মোটা খদ্দরের ফতুয়াগোছের জামা, খদ্দরের ধুতি, আর পায়ে চপ্পল। আর সভ্যরা অনেকেই এসেছেন সিল্কের জামা-উড়ুনি গায়ে দিয়ে। যাক, সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হ'লো। কত গল্প, কত কথা। কিন্তু তিনি লাইব্রেরিতে গিয়ে আর বাঙালী সভ্যদের সঙ্গে মিশে খুশী হচ্ছে-

পারলেন বলে মনে হ'লো না। তিনি কথা কইছেন, এমন সময় জে. এন. রায় মহাশয়ের ছেলে এসে বললেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। পরিচয় হ'লো। ছেলেটি বললে—বাবার অসুখ, আসতে পারলেন না। আমায় পাঠালেন। কাল আমাদের বাংলোতে দিলীপ-কুমার গান করবেন। আপনি যদি যান দয়া করে, বাবা আর আমরা সবাই খুব আনন্দিত হবো।

শরৎবাবু একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা যাবো।

নিয়ে যাবার ভার পড়লো আমার উপর।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় গান হচ্ছে রায়মহাশয়ের বাড়িতে। শরৎবাবু এসেছেন। দিলীপকুমারের গান বেশ জমেছে। দু'তিনখানি গান হবার পর শরৎবাবু বললেন—ওহে দিলীপ, তোমার বাবার সেই গানটি গাও তো।—'ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়'—

দিলীপকুমার গান ধরলেন :

'ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ও কে পথে পথে চলে মুখে হরি বলে
পড়ে চলে চলে পাগলেরি প্রায়······

এই অপূর্ব গানখানি শ্রোতাদের মনে এক অদ্ভুত ভাব জাগিয়ে তুললো। গান ফুরুলো, সকলে চুপ করে রইলেন। তারপর আসর ভেঙে গেল।

পরের দিন শরৎবাবু চলে গেলেন বৃন্দাবনের পথে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, তাহা এক অর্থে বস্তুতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টিতে একটা আদর্শের প্রাণোন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সে যুগের স্রষ্টা। তিনি ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—যাহা হইবে এবং যাহা হওয়াই বিহিত তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কালের যবনিকা তুলিয়া সেই আদর্শের অনুসরণে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রসসৃষ্টিতে সমাজে তখনও যাহা ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু যাহা ফোটা সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এবং যাহা ফোটা অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, তাহাই আমরা দেখিয়াছিলাম। এইজন্যই তাঁহাকে যুগস্রষ্টা বলি। শরৎচন্দ্র যুগস্রষ্টা নহেন, কিন্তু যুগ-প্রকাশক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা যাহা দেখিতে পায় নাই তাহাই আঁকিয়াছিলেন। সেই অদৃষ্ট আদর্শকে চিত্তলুব্ধকর বর্ণবিন্যাসের দ্বারা সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। এইরূপেই তিনি বাঙলা সাহিত্যে এবং শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমের রসসৃষ্টিতে সমাজে যাহা ছিল, ঠিক তাহা ততটা দেখিতে পাই নাই, যতটা সমাজের গতি কোন দিকে চলিয়াছে, কোন পরিণামকে অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য করিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজ ছুটিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন ছিল—বাহিরের সমাজের বিধিব্যবস্থা তত নহে, যত সেকালের লোকের অন্তরে আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির উপাদান, যাহা হইবে বা হইতে পারে তাহা নহে, কিন্তু যাহা আছে তাহাই। এইজন্য শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা

দেখিতে পাই যাহা এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রেও দেখিতে পাই নাই। বঙ্কিমযুগে কেবল একখানি মাত্র উপন্যাস ছিল সমাজচিত্র হিসাবে যাহা বাস্তবিক বস্তুতন্ত্র ছিল। সেখানি স্বর্গীয় তারকনাথ গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা"। কিন্তু স্বর্ণলতা প্রকৃতপক্ষে সমাজের একটা বিশেষ চিত্রকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সে চিত্র বাঙালী হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবারের তখনকার চিত্র। এ ছাড়া এ অর্থে সে যুগে আর একখানিও বস্তুতন্ত্র বাঙলা উপন্যাস ছিল না বলিলেও হয়।

শরৎচন্দ্রের আমি যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি বাঙলার বর্তমান সমাজচিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁহার "পল্লীসমাজ"-এ ইহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁকে চিত্রকর বলিতেছি, ফটোগ্রাফার নহে। ফটোগ্রাফ উঠে কলে; ফটোগ্রাফারের দক্ষতা যন্ত্র ব্যবহারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপরে বাহিরে আলোকপাতের নিপুণতায়। কিন্তু চিত্র করে উঠে না, চিত্রকরের মনে ফোটে। চিত্রকর চোখে যাহা দেখেন, তাহার উপর রসের আলোক ফেলিয়া, দৃষ্টের সঙ্গে অদৃষ্টের মাখামাখি করাইয়া চিত্র সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস এই জন্য ফটোগ্রাফ নহে, চিত্র। আমি যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে শরৎচন্দ্রের বড় সৃষ্টি আমার মনে হয়, "শ্রীকান্ত" এবং শ্রীকান্তের সখা, গুরু, সুহৃদয় ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বাঙলার নবযৌবন মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। বহু শতাব্দীব্যাপী বন্ধনের বেদনায় নিষ্পিষ্ট বাঙলার যৌবন আজ সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া কাটিয়া অদম্য বেগে আপনার অন্তরের উল্লাসে অজ্ঞাত পথে ছুটিয়াছে। ছোট বড় কোনো বন্ধন সে মানে না, মানিতে চাহে না। কোনো ভয়ের ধার সে ধারে না; কোনো ফলাফল চিন্তা সে করে না। আপনার যৌবনকে পরিপূর্ণরূপে সার্থক করিবার জন্য চারিদিকে সে ছটফট করিতেছে; ইন্দ্রনাথের মধ্যে শরৎচন্দ্র সমাজের আধার ও আবেষ্টনের ভিতর দিয়া বাঙলার নবযুগের বিদ্রোহী যৌবনকে মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। এ চিত্র বাঙালী ধুতি-চাদরে সজ্জিত

বটে কিন্তু বিশ্বজনীন যৌবনের চিত্র। গ্রীকশিল্পী যেমন পাথরে এপোলো ভেলভেডিয়ারের (Apollo Velvedere) ছবি খুদিয়া বিশ্ব-যৌবনের দেহকে চিরদিনের জন্ম রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের শরৎচন্দ্র সেইরূপ বিশ্ব-যৌবনের মনকে বাঙলা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমার মনে হয় ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু; তাঁহার সকল বই পড়ি নাই, কিন্তু একটু-আধটু উপরে উপরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় এই উদ্দাম যৌবনই তাঁহার প্রথম সৃষ্টি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্রের এই উদ্দাম যৌবনচিত্রে অসংযত যৌবনপ্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-লালসা ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আদিরসের প্রকট মূর্তি দেখিতে পাই নাই; আনন্দমঠেও যেটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে শান্তি ও জীবানন্দের হুড়োহুড়ি জড়াজড়িতে—ততটুকু পর্যন্তও —আমি যতটুকু শরৎচন্দ্রের রসসৃষ্টি দেখিয়াছি—ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে শরৎচন্দ্রের নারীচিত্র অপূর্ব বস্তু; শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নিজেরা অতিশয় সংযমী। আপনার প্রকৃতিতে রমণী সর্বত্রই সংযমী; যে মা হইয়া মনুষ্যের সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিবে, বিধাতা তাহাকে সংযমী করিয়াই গড়িয়াছেন। আর শরৎচন্দ্র নারীপ্রকৃতির এই বিশ্বজনীন ধর্মকে তাঁহার নায়িকাদিগের মধ্যে ফুটাইয়া কি গৃহে, কি সমাজে, কি তাঁহার "পথের দাবী"তে বিদ্রোহী বিপ্লবপন্থীদিগের দলে, সর্বত্র পুরুষদিগের উপরে নারীর অসাধারণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আদিরস যে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বহুদিন হইতে বাঙালী রসসৃষ্টি করিতে যাইয়া যে আদিরসের "হোলি" খেলিয়াছে, শরৎচন্দ্র—আমি যতটুকু দেখিয়াছি—তাহা করেন নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে কাম অপেক্ষা প্রেম বেশী ফুটিয়াছে; "পথের দাবী"তে এই প্রেম শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুমিত্রা এবং ভারতীর চিত্র এ বিষয়ে অপূর্ব সৃষ্টি ;

শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" শুনিয়াছি এত বিক্রি হইয়াছিল, যাহা নাকি তাঁহার বা অন্য কোনো বাঙলা ঔপন্যাসিকের বই এত অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। "আনন্দমঠ" এবং "পথের দাবী" একদিক দিয়া দেখিলে হঠাৎ একই জাতীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। "আনন্দমঠ" একটা উচ্চ আদর্শ দিয়াছে। সে আদর্শ বিদ্রোহ নহে, সে আদর্শ বিপ্লব নহে, সে আদর্শ অরাজকতা নহে। বিদ্রোহ জাগাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে কহিয়াছেন—"বিদ্রোহী আত্মঘাতী"; "আনন্দমঠ" মুসলমানের অরাজকতাকে নষ্ট করিবার জন্য নামাবশিষ্টমাত্র রাজ-শক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু অরাজকতাকে লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করে নাই। "আনন্দমঠ" স্বদেশপূজার শাস্ত্র, কিন্তু যে স্বদেশ-প্রীতি পরাজিত বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত, তাহাকে হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সকল কারণেই "আনন্দমঠ" প্রকৃতপক্ষে মুমুক্ষুর তীব্র বন্ধন-বেদনাপ্রসূত সান্নিপাতবিকারের চিহ্নমাত্র। 'পথের দাবী" পথের মাঝখানেই শেষ হইয়াছে; গন্তব্যে কেবল পৌঁছায় নাই তাহা নহে, গন্তব্যের সঙ্কেত পর্যন্ত দেয় নাই। শরৎচন্দ্র যদি একটা ফ্যান্সি চিত্র আঁকিতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই "পথের দাবী"কে ঠেলিয়া নিয়া আপনার লক্ষ্যস্থলে তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা অন্যদিকে যতই মনোহর বা সমীচীন হউক না কেন, যে কালের ও সমাজের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে বস্তুতন্ত্র হইত না। আর এইজন্যই আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুগস্রষ্টা, শরৎচন্দ্র হইয়াছেন যুগ-প্রকাশক।

শরৎচন্দ্র ও 'চরিত্রহীন'

সুধীরচন্দ্র সরকার

'চরিত্রহীন' প্রকাশ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে—সে-বিষয়ে এখানে কিছু বলা দরকার মনে করি। ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে চৈত্র ও ১৩২১ বঙ্গাব্দে যমুনায় আংশিকভাবে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়। পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে ১১ই নভেম্বর ১৯১৭ (কার্তিক ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) আমরা প্রকাশ করি। যে পর্যন্ত 'যমুনা'তে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়েছিল, সে পর্যন্ত মুদ্রণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়নি। তারপর শেষটুকু আদায় করতে আমার খুব বেগ পেতে হয়েছিল। সেই সময় শরৎবাবু থাকতেন হাওড়ায়। প্রায় প্রতি রবিবার 'চরিত্রহীনে'র কপি আদায় করতে আমায় যেতে হ'তো। প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকতেন আমার সাহিত্যিক বন্ধু প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এই সময় একদিন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল।

সেদিন আমি একলাই গেছি হাওড়ায় শরৎবাবুর কাছ থেকে 'কপি' আনতে। আমাকে দেখে শরৎবাবুর প্রিয় কুকুর ভেলু এমন তেড়ে এল যে, আমি প্রাণভয়ে চেয়ারটাকে তক্তাপোশের উপর তুলে হাত-পা গুটিয়ে চেয়ারের উপর বসে আছি। এদিকে চৌকির নীচে ভেলু প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে চলেছে। খালি মনে হচ্ছে—এই বুঝি কামড়ালো। ভেলু যে পরিমাণ চিৎকার করছে, আমি তার থেকেও গলাটা আরও একটু চড়িয়ে শরৎবাবুকে ডেকে চলেছি। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ভেলুকে নিরস্ত করে আমায় আশ্বস্ত করলেন।

লেখা সম্বন্ধে যাঁরাই শরৎবাবুর নিকটস্থ হয়েছেন, তাঁরাই জানেন, তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করা কি রকম দুষ্কর ছিল। শরৎবাবুর

তাড়াতাড়ি লেখার অভ্যাস ছিল না, বেশ সময় নিয়েই তিনি লিখতেন। আমরা কোনো কোনো রবিবার মাত্র একটি স্লিপ নিয়ে চলে এসেছি। এইভাবে প্রায় দু'বছর ধরে 'চরিত্রহীনে'র লেখা শেষ হলে বই প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে আর একটা কথাও এখানে লেখার দরকার মনে করি। 'চরিত্রহীন' ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বই-এর কী দাম হবে তাই নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্কাতর্কি হ'তো। তর্কটা এমন কিছুই নয়—বই-এর দাম তিন টাকা হবে, না সাড়ে তিন টাকা হবে। শেষ পর্যন্ত তিন টাকাই ধার্য হ'লো। আজকের দিনে অবশ্য বাংলা বই-এর দাম তুলনামূলকভাবে বিচার করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন তো বাংলা উপন্যাসের দাম বারো টাকা থেকে ওঠা-নামা করছে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সামান্য আট আনা বাড়ানো-কমানো নিয়ে কী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, তা এখনকার পাঠক-পাঠিকা ও প্রকাশকদের বোঝা সম্ভবপর নয়।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 'চরিত্রহীনে'র পঞ্চম সংস্করণে শরৎচন্দ্র নিজে লিখেছিলেন :

"চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্পবয়সে। তারপর ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হ'লো বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেচে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না—ঐভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।"

'চরিত্রহীনে'র প্রথম পাণ্ডুলিপি সবটাই আগুনে পুড়ে যায়। রেঙ্গুন থেকে ২২শে মার্চ ১৯১২ তারিখে শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন,

"আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরি এবং চরিত্রহীন

উপন্যাসের manuscript…। আবার শুরু করিব। এখন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।"

'চরিত্রহীন' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে শরৎচন্দ্র উপন্যাসটি নূতন করে লিখেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। 'যমুনা'য় যখন 'চরিত্রহীন' প্রকাশ শুরু হয়, তখন শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ধারবাহিকভাবে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না পেয়ে মুদ্রণ শুরু করায় অসুবিধায় পড়ি। কপির অভাবে ছাপা প্রায়ই স্থগিত রাখতে হ'তো। যতদূর মনে পড়ে, তখন 'চরিত্রহীন' ছাপা হয়েছিল কুন্তলীন প্রেসে। আমি শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখলে তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উত্তরে জানান:

"কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তার প্রায় অধিকাংশই নতুন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু-এক মাস দেরি হয় বরং সে ভালো, কিন্তু পাছে এমন করিয়া শুরু করিয়া খারাপ হইয়া যায়, সেই আমার ভয়…।"

১৩২৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর 'চরিত্রহীনে'র যে কত চাহিদা, তা প্রথমদিনই প্রকাশ পায়। প্রথম দিনই সাড়ে চারশো কপি বই বিক্রি হয়ে যায়—এ-কথা স্বর্গত সুসাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার অন্যত্র লিখেছিলেন। হেমেন্দ্রবাবু আরও লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মৃত্যুর পূর্বে 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হওয়ার সময় শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'ই নিয়মিত লেখকরূপে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য দ্বিজেন্দ্রলালকে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। অশ্লীলতার জন্য তিনি 'ভারতবর্ষে' 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। 'চরিত্রহীন' বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে 'যমুনা'য় বেরুতে আরম্ভ করে।

শরৎচন্দ্রের যুগে অনেক নীতিবাগীশের দল তাঁর লেখাকে অশ্লীল বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এ-লেখা সকলকে পড়তে নিষেধ করতেন। অথচ তুলনা করলে বোঝা যাবে এই অশ্লীলতা বাংলা-সাহিত্যে আজকাল কোথায় গিয়ে ঠেকেছে!

শরৎচন্দ্রের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখলে মনে হ'তো যে, লেখা খুব কষ্টকল্পিত, সহজ ও সরল নয়। কারণ, যদিও হাতের লেখা খুব সুস্পষ্ট এবং সুন্দর ছিল, তবু লেখায় ভীষণ কাটাকুটি এবং অদল-বদল থাকতো। কিন্তু পাঠোদ্ধার করা যেতো অনায়াসেই। শরৎচন্দ্র খুব শৌখিন লেখক ছিলেন বলে কাগজ ও কলম সব সময় প্রথম শ্রেণীর ব্যবহার করতেন।

ফণীবাবু* ১০ই মে ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"'চরিত্রহীন' যাতে 'যমুনা'য় বার হয়, তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন। তবে শুনিতেছি ওটাতে মেসের ঝি থাকাতে রুচি নিয়ে হয়তো একটু খিটিমিটি বাধবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত বেশী নিন্দা করবে, তারা তত বেশী পড়বে। ওটা ভালো হোক, মন্দ হোক, একবার পড়তে আরম্ভ করলে পড়তেই হবে। যারা বোঝে না, যারা আর্ট-এর ধার ধারে না, তারা হয়তো নিন্দা করবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভালো তাতে সন্দেহই নেই। এবং ওটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।"

শরৎচন্দ্র একখানি চিঠিতে প্রমথনাথকে লেখেন যে, সুরেন্দ্রমামা ও জনৈক প্রকাশক এ-বইটি immoral—এটি নাকি কোনো পত্রিকাই প্রকাশ করতে পারে না।

* 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল।

শরৎচন্দ্র এক জায়গায় (শরৎ-সাহিত্য-সম্ভার ১১শ খণ্ড) লিখেছেন : "এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মঞ্চে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে—তাছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে।"

হায়। মেসের ঝি সাবিত্রী। আজকালকার দিনে তোমার স্থান অনেক উচ্চঘরের নারীরাই নিয়েছে। আমাদের দোকান থেকে চরিত্রহীন প্রকাশের পর থেকে আমরা অশ্লীল প্রকাশক বলে খ্যাতি-লাভ করলাম। আরও কয়েকটি অশ্লীল বই সেই সময়ে আমাদের দোকান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন পঙ্ক-তিলক, প্রাচীর ও প্রান্তর, বেদে, শুভা প্রভৃতি। সেই সময় এই সকল বই সাধারণ কলেজ ও স্কুল পাঠাগারে রাখা হ'তো না। আর আজকালকার দিনে? আমরা শরৎবাবুর প্রথম যে ছয়খানি বই প্রকাশ করেছিলাম তার শেষ বই হ'লো 'নারীর মূল্য'। এই বইখানি প্রকাশে অসম্ভব দেরি হয়েছিল। শেষে শরৎবাবু নিজেই এই দেরির জন্য কৈফিয়ত দিয়ে আমার নাম দিয়ে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রকাশকগণ এমন চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন যে, তাঁরা ধরতেই পারলেন না যে, ভূমিকাটি শরৎবাবুর নিজের লেখা—আমার নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে মাত্র। আমার কলম দিয়ে এই রকম লেখা বেরোতেই পারে না। ফলে পরবর্তী একাধিক সংস্করণে এই ভূমিকাটি প্রকাশকরা বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

ভূমিকাটি ছিল এই—পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হ'লো :

"১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিক পত্রে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে তিনিই জানেন, তবে

তাঁহার ইচ্ছা ছিল এমনি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তারপরে এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোনো মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার 'দ্বাদশ মূল্য' আপনারই থাক, পারেন তো আগামী জন্মে লিখিবেন, কি যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি। তিনি বলেন, না হে, থাক, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল, অথচ তাঁহার মনের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাও নয়। আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইহাদের দাবি-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্যি নাও হইতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক যে, এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভালো করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহা পাঠক বলিতে পারেন। আমাদের তো মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

'নারীর মূল্য' পুস্তকাকারে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় এবং লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নিজের নামই থাকে। পূর্বে 'যমুনা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় তাঁর ভগিনী অনিলা দেবীর নাম ছিল এই রচনাগুলির লেখিকা হিসাবে। 'যমুনা'য় 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয় বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়।

আমাদের প্রকাশিত ছয়খানি বই*-এর যখন যেটির প্রথম সংস্করণ ফুরোতে লাগল, তখনই অন্য প্রকাশক সে বই-এর নতুন সংস্করণ

* চন্দ্রনাথ, পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল, চরিত্রহীন ও নারীর মূল্য।

প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর সব বই আমাদের প্রকাশনার আওতার বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগটাও ক্ষীণ হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আবার ফিরে এল তাঁর মৃত্যুর সময়।

আমি তখন দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বাড়ি করে বাস করতে শুরু করেছি। শরৎবাবুর বাড়িও আমার বাড়ির কাছেই—প্রায় আধ মাইলের মধ্যে। তিনি বাড়ি তৈরি করেছিলেন অশ্বিনী দত্ত রোডে। শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দু'দিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন আমাকে শরৎবাবুর কাছে নিয়ে যাবার জন্য। এই দু'দিনই আমি বাড়িতে না থাকায় তিনি ফিরে যান। তৃতীয় দিন আমাকে আমার বাড়িতে এসে পাকড়াও করেন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার সময়। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করায় তিনি তখন কিছু বললেন না, শুধু বললেন: চল না, তোমাকে একবার ডেকেছে।

দীর্ঘদিন পরে দেখা। তাঁর চেহারাটি দেখা মাত্রই আঁতকে উঠলাম। বললাম: আপনার চেহারাটা তো ভালো দেখাচ্ছে না—কী চেহারা হয়েছে আপনার!

এমন সময় পিছন দিক থেকে আমার পিঠের উপর একটি বেশ ভারী কিল পড়ল। চমকে ফিরে দেখি সেটি শরৎবাবুর মাতুলের ইঙ্গিত। অর্থাৎ আমি যেন ওঁর সামনে ওঁর শরীরের বিষয় কিছু না বলি, তাহলে উনি বেশী মাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়বেন।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, তাঁর চেহারায় আগের মতো সে দীপ্তি বা জ্যোতি নেই—কি রকম যেন বিবর্ণ, ম্লান দেখাচ্ছে। বেশ মনে হয় মৃত্যুর ছায়া যেন তাঁকে ঘিরে রয়েছে। ম্লান হেসে তিনি আমাকে মামুলি দু'এক কথার পর প্রস্তাব করলেন হাজারখানেক টাকা তাঁকে দিতে হবে। কারণ তিনি জানালেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় কোন এক নার্সিং হোমে তাঁর অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন এবং

অস্ত্রোপচার করবেন বিখ্যাত সার্জন ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই টাকাটি তাঁর বিশেষ প্রয়োজন এই চিকিৎসার জন্য। শরৎবাবু নিজে আমায় বললেন যে, সুস্থ হয়ে ফিরে এসে একখানি উপন্যাস লিখে তিনি আমার এ টাকা শোধ করে দেবেন।

তাঁর এ অবস্থায় আমি আর কোনো রকম চিন্তা না করে দু'এক-দিনের মধ্যে তাঁকে এ টাকাটা হাতে দিয়ে এলাম। এই টাকা দেওয়ার সময় নরেন্দ্র দেব আমার সঙ্গে ছিলেন। এর কয়েকদিন পরে তাঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দিন কুড়ি পরে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হয়। এই অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর রোগনিরাময় হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল এবং একদিন তিনি এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অমৃতলোকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ তাঁর বাড়িতে আনা হলে আমরা সকলে দেখতে গেলাম এবং কেওড়াতলার শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় যে শোকযাত্রা হয়, আমরা সে শবানুগমনে যোগদান করে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। এই শোকযাত্রায় কিন্তু শরৎবাবুর মতো সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানানোর পক্ষে আশানুরূপ লোক হয়নি ব'লে আমার মনে হয়।

তাঁর মৃত্যুর পরই যেন সারা দেশ সচেতন হয়ে উঠল যে, কত বড় সাহিত্যিককে তারা হারিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ হ'লো তা নয়, বরং তাঁর সাহিত্য প্রচারের ব্যাপারে এক নতুন ভূমিকা গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এই হাজার টাকার বিনিময়ে বেশ কিছুদিন পরে শরৎবাবুর ছেলেবেলার গল্পগুলি ছাপাবার ব্যবস্থা করি। ছোটদের জন্য তিনি যে কতকগুলি গল্প লিখেছিলেন এই পুস্তকটি সেই গল্পগুলিরই সংগ্রহ। এই ব্যাপারে নরেন্দ্র দেব আমায় সব সময় সহায়তা করেছিলেন।...তাঁর 'পথের দাবী' প্রকাশ করার কথা ছিল প্রথমে আমাদেরই, কিন্তু

তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ার ভয়ে আমরা তা প্রকাশ করিনি। 'পথের দাবী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়। দীর্ঘদিন পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের রোষমুক্তি হবার পর আমরাই তা পুনরায় প্রকাশ করি এবং বর্তমানে কয়েকটি সংস্করণও হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের আধুনিক কালের তেরো খণ্ডে সম্পূর্ণ শোভন সংস্করণ গ্রন্থাবলী আমরাই প্রচার করে আসছি।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই যেন তাঁর গ্রন্থের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর জীবিতকালে পুস্তকের যে আয় তিনি দেখে গেছেন মৃত্যুর পরে তা এত স্ফীত হবে এ তিনি কল্পনাও করেননি। শুনেছি, তাঁর একটি গল্পের হিন্দী চিত্রস্বত্বের জন্য কিছুদিন আগে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর জীবিতকালে এই চিত্রস্বত্ব চার-পাঁচশো টাকায় পাওয়া যেত।

শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রথম শিকারের কাহিনীটি ভারি মজার।

বালক শরৎচন্দ্র এসেছেন মামার বাড়িতে লেখাপড়া করতে। এসেই কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই ডানপিটে ছেলেটি এখানকার সমবয়সী ছেলেদের দলপতি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দলপতি হয়ে দলের ওপর নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে নিত্য নতুন চমক লাগানো উদ্ভাবনে দলটিকে মাতিয়ে রাখা দরকার। এ বিদ্যায় আমাদের এই দলপতিটি বিলক্ষণ পটু ছিলেন।

একদিন তিনি ঘোষণা করলেন—আর ভাবনা নেই, এবার তিনি বন্দুক তৈরি করবেন; শুনে চমকে যাবার মতো কথা!

—বন্দুক? বন্দুক তৈরি করবে তুমি?

—হ্যাঁ, বাঁশের বন্দুক—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন দলপতি।

বাঁশের বন্দুক শুনে মন কেমন যেন একটু মুষড়ে যায়।

—বাঁশের বন্দুক? কাক মারবে বুঝি?

একথায় দলপতির আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগা অস্বাভাবিক নয়; তিনি বললেন—তোর কিচ্ছু জ্ঞান নেই।

—তবে? বাঘ?—ছেলেটি সামলে নিয়ে বললে।

খুশী হলেন দলপতি, বললেন—বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, গণ্ডার, বুনো শুয়োর···সব···

শুনে ছেলেদের নীচের ঠোঁট লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল।

—কিন্তু বাঁশ চাই, ভালো পাকা বাঁশ—বললেন দলপতি।

অতএব, মহা উৎসাহে বাঁশের সন্ধানে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল—এবং অবিলম্বে তা যোগাড়ও হয়ে গেল।

তারপর অসীম ধৈর্য, চেষ্টা ও পরিশ্রমে বন্দুক তৈরি হ'লো।

কিন্তু বন্দুক তৈরি করলেই তো হ'লো না, কেমন হ'লো সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তার জন্যে চাই শিকার।

মুশকিল এই যে—বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, গণ্ডার যখন-তখন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না—মাথা খুঁড়ে মরলেও না। বুনো শুয়োর মাঝে মাঝে এ শহরে এসে উৎপাত করে বটে, কিন্তু সে-ও আবার বর্ষাকালে। গঙ্গার জল বেড়ে ওপারের ক্ষেত সব ডুবিয়ে দেয়—সেই সময়ে আশ্রয়হীন বুনো শুয়োর সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে অনেক সময়ে এপারে এসে ওঠে ও সামনে যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে। বুনো শুয়োর পেতে হলে তাহলে সেইদিনের জন্যে বসে থাকতে হয়। চিন্তায় পড়ে গেল সকলে।—শিকার পাওয়া যাচ্ছে না, বন্দুকের পরীক্ষা হয় কি করে?

একজন হঠাৎ বললে—কুকুর মারলে হয় না? ঐ যে ওখানে একটা শুয়ে রয়েছে। ঐ কুকুরটাই সেদিন আমাকে কামড়াতে এসেছিল।

সকলে অমনি বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, কুকুরই মারা হোক।

দলপতি কিন্তু এ-কথায় সায় দিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—না, কুকুর মারা হবে না, তোকে কামড়ায়ও যদি, তবুও না।

—তবে বেড়াল মারা হোক? বললে একজন।

এটি দলপতির মনের মতো কথা। তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন—ঠিক বলেছিস, বেড়ালই মারব। ধরে আন একটা বেড়াল।

তাঁর একটি পোষা শালিক ছিল। আদর করে তার পায়ে তিনি ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছিলেন। সে উঠানে নেচে নেচে বেড়াত—আর তার পায়ের ঘুঙুর বাজত ঝুন ঝুন করে। একদিন এক হুলো বেড়াল তাকে ধরে খেয়ে ফেলে—সেই থেকে সমস্ত বেড়াল-জাতটার ওপরেই তাঁর আক্রোশ। অতএব বেড়াল মারতে তাঁর আপত্তি নেই।

অনতিবিলম্বে এক বেড়াল বন্দী হয়ে তাঁর সামনে নীত হ'লো। দলপতি বললেন—ঠিক, একেই মারব। দেবিন, তুই ওর গলায় দড়ি বেঁধে ওকে ঝুলিয়ে নিয়ে দাঁড়া—আমি গুলি করি।

দেবিন ইতস্তত করে বললে—গুলি যদি আমায় লাগে ?

তাকে অভয় দিয়ে দলপতি বললেন—না, তোকে লাগবে না—আমার 'এম্‌' অত খারাপ নয়—দাঁড়া।

দেবিনের ভয় তবুও গেল না ; কিন্তু কি আর করে বেচারী—দলপতির হুকুম না শুনলেও বিপদ। অতএব, বেড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যে কাঠ হয়ে দাঁড়াল—আর ঝুলন্ত বেড়াল ছাড়া পাবার জন্যে শূন্যে পা ছুঁড়তে লাগল।

আর সকলে বাঁশের বন্দুকের কেরামতি দেখবার জন্যে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

দলপতি লক্ষ্য স্থির করে বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন।

ভীষণ জোরে একটা আওয়াজ হ'ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বারুদের গন্ধে আর ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে গেল।

ধোঁয়ার ভেতর অস্পষ্ট দেখা গেল—এদিকে দলপতি আর ওদিকে দেবিন চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন—আর বেড়াল উধাও হয়ে গেছে।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করার অভ্যাস শরৎচন্দ্রের ছিল। ঘুম ভেঙে গেলেও তিনি বেলা পর্যন্ত বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকতেন ; চাকর তামাক সেজে এনে মশারির ভেতর তাঁর হাতে গড়গড়ার নল ধরিয়ে দিত—তিনি শুয়ে শুয়ে পরম আরামে তামাক টানতেন। রাত্তিরে শুতেন তিনি অনেক দেরি করে—পড়তে পড়তে বা লিখতে লিখতে রাত দেড়টা-দুটো বেজে যেত। দুপুরে তিনি কোনোদিন ঘুমোতেন না।

ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্র সকাল বেলায় ছোট ঘরটিতে তাঁর অভ্যাসমতো চোখ বুজে বিছানায় পড়ে আছেন—তামাক টানছেন শুয়ে শুয়ে ; পাশের বড় ঘরে তখন কীর্তনের আসর বসেছে—গাঙ্গুলী পরিবারের নিত্য সকালের কীর্তন। এটির প্রবর্তন করেন

সুরেন্দ্রনাথ—তাঁর অগ্রজ মণীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে। আসরে মূল গায়েন হতেন রাসবিহারী দাস, সুরেন্দ্রনাথ বেহালা ও শচীন্দ্রনাথ হারমোনিয়ম বাজাতেন, বাড়ির অন্য ছেলে-মেয়েরা কেউ খোল, কেউ করতাল বাজাত—ও সকলে মিলে মূল গায়েনের দোহারকি করত।

রাসবিহারী দাস গাইছেন :

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে
ছিল প্রাণ তাই দেখা হল
নইলে দেখা হ'ত না

* * *

অধিক উল্লাসে কহে চণ্ডীদাসে
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে।

এ-ঘর ও ঘরের মাঝের দরজা খোলাই আছে—শরৎচন্দ্র বিছানায় শুয়ে শুয়ে কীর্তন শুনছেন। গানটি শেষ হতে তিনি ও-ঘর থেকে বললেন—রাসবেহারী, 'ও কুব্জার বন্ধু'টি গাও।

গানটি শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু এ গান তিনি শেষ পর্যন্ত শুনতে পারতেন না—তার আগেই কেঁদে ভাসাতেন, আর সেখান থেকে উঠে পালিয়ে যেতেন ; অথচ শোনাও চাই তাঁর গানটি।

রাসবিহারী জানতেন যে, শরৎচন্দ্র গানটি শুনতে ভালবাসেন ; অতএব, ও-ঘর থেকে ফরমাশ আসতেই তিনি মাধুর্য রসে গলা ভিজিয়ে গাইতে শুরু করলেন :

বলি, ও কুব্জার বন্ধু
তোমায় রাধানাথ আর বলব না হে
ও কুব্জার বন্ধু
বলি, কেমন করে
পাসরিলে রাই মুখ ইন্দু

অমন সোনার মুখ কি মনে পড়ে না
কেমন করে
* * *
বলি, দেখাও মোতির মালা
ওগো দুদিনের রাজা
দেখাও মোতির মালা
অমন মোতির মালা
ব্রজে কত পড়ে আছে ধূলায়।

গানটি কিছুক্ষণ গাওয়ার পর খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল—মশারির ভেতর শরৎচন্দ্র ছটফট করছেন। একটু পরেই তিনি উঠে পড়লেন এবং এ-ঘরে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। ছেলেরা দেখছে—মাঝে মাঝে তিনি চট করে হাত দিয়ে চোখ মুছে ফেলছেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ এ-ঘরে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না—চলে গেলেন তিনি বারান্দায়। অবশেষে, গান যখন শেষ করলেন রাসবিহারী—শরৎচন্দ্র তখন সরে এলেন। ভালো করে চোখমুখ ধুয়ে এসেছেন তিনি জল দিয়ে—তবু তাঁর চোখ দু'টি তখনও লাল হয়ে আছে।

—গানটি রাসবিহারী গায় ভালো—না?—বললেন তিনি সরে এসে।

—তুমি আর শুনলে কৈ—পালিয়ে পালিয়েই তো বেড়ালে—বললেন সুরেন্দ্রনাথ।

—না না, শুনেছি বৈকি! বেশ লাগল। আচ্ছা রাসবেহারী, তোমার গলায় ঐ তুলসীর মালা পেলে কোথায় বল তো?

—তৈরি করেছি শরৎদা। বললেন রাসবিহারী।

—নিজে করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিজেই করেছি।

—বাঃ, বেশ হয়েছে তো। তুমি তো দেখছি একজন ওস্তাদ কারিগর।

পাশের বাড়ির অনাদিনাথ ঘোষ বসেছিলেন, তিনি রহস্য করে বললেন—রাসবেহারী 'বলতে নেই' থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারে।

হাসতে হাসতে শরৎচন্দ্র বললেন—আমায় একটা মালা তৈরি করে দিতে পার রাসবেহারী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি বৈকি। আপনি পরবেন ?

—হ্যাঁ। দিও তো করে।

—এবার কণ্ঠিধারণ করবে নাকি তুমি ?—হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন সুরেন্দ্রনাথ।

মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—সত্যি, ভারি ইচ্ছে হয় গলায় তুলসীর মালা পরি। কবে করে দেবে রাসবেহারী ?

রাসবিহারী বললেন—তাঁর আর তর সইছে না। আজই তৈরি করব।

সেদিন সারাদিন পরিশ্রম করে রাসবিহারী তুলসীর মালা তৈরি করলেন এবং পরদিন সকালে সেটি এনে শরৎচন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিলেন।

ভারি খুশী হলেন শরৎচন্দ্র কণ্ঠিধারণ করে।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—বাঃ, বেশ মানিয়েছে তোমায় শরৎ। ফোঁটা-তিলক আর বাকি থাকে কেন—ওটাও কেটে দাও না রাসবেহারী, শরতের কপালে।

শরৎ লজ্জিত হয়ে বললেন—না না, সুরেন, ওটা থাক।

জগদ্ধাত্রী পুজোর পরের দিন সকাল থেকে বাইরের বাড়ির উঠোনে স্টেজ বাঁধার ধুম পড়ে যেত। সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জনের পর রাত্তিরে ঐ স্টেজে থিয়েটার হ'ত, অভিনয় করত বাড়ির ও পাড়ার ছেলেরা। রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব, ডাকঘর, বিসর্জন, রাজা, রাজা ও রানী কয়েকবারই অভিনয় করেছে এই ছেলেরা। অভিনয় দেখতে

এত লোকের সমাগম হ'ত যে, উঠোনে জায়গা হ'ত না, অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা (অভিনয়) ও গান শুনতেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ একবার ভাগলপুরে এসে এই ছেলেদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি দেখেন। অভিনয় তাঁর এতই ভালো লেগেছিল যে, তিনি বলেছিলেন—শান্তিনিকেতনের বাইরে গুরুদেবের নাটকের যে এত ভালো অভিনয় হতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। ফিরে গিয়ে গুরুদেবকে এ খবরটি দিতে হবে।

অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করার ভার পড়ত শচীন্দ্রনাথের ওপর। নিজে তিনি ভালো অভিনয় করতেন এবং গানও গাইতেন চমৎকার—ছেলেদের অভিনয় শিক্ষা দেওয়া, গান শেখানো ইত্যাদি সবকিছু তিনি একাই করতেন এবং করতেনও যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে। অভিনয়ে এতটা সাফল্য যে তাঁর শিক্ষার গুণেই সম্ভব হ'ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

* * *

শরৎচন্দ্র একবার জগদ্ধাত্রী পুজোর তিন-চারদিন আগে ভাগলপুরে এসে পোঁছোলেন।

শচীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তাঁদের হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা 'মালতী' এবং তাঁদের দেখাদেখি তাঁদের ছোটদের হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা 'মালা' তখন নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত। 'মালতী ও মালা'র সম্পাদকদ্বয় শরৎচন্দ্রকে তাঁদের পত্রিকা দেখতে দিয়ে তাঁর মন্তব্য শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র পত্রিকাগুলি উল্টে-পাল্টে দেখলেন, তারপর তাঁদের নিজেদের ছোটবেলার হাতে-লেখা পত্রিকা 'ছায়া'র কথা তুললেন। 'ছায়া'র কয়েক সংখ্যা তখনও এ-বাড়িতে ছিল; সেগুলি এনে তাঁর হাতে দেওয়া হ'ল। 'ছায়া'য় থাকত গিরীন্দ্রনাথের হাতের লেখা। শরৎচন্দ্র এক সংখ্যা 'ছায়া'র পাতা খুলে বললেন—কী সুন্দর লেখা দেখেছিস গিরীনের! ছায়ার

গল্প কবিতা—প্রবন্ধও নেহাত মন্দ হ'ত না। তোরাও চেষ্টা করে যা—ভালো লিখতে শিখবি। খাটতে হয়, না খাটলে কিছু হয় না।

কথায় কথায় থিয়েটারের প্রসঙ্গ এল ; শরৎচন্দ্র জিগ্যেস করলেন—এবার তোরা কি প্লে করছিস রে ?

—শারদোৎসব।—বললেন শচীন্দ্রনাথ।

—ও তো ছোটরা করবে ; তোরা বড়রা একটা কিছু কর না।

—কি করব, বলুন।

—ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে একটা সিন্ কর। ও গিরীন, গিরীন—

—কি বলছ, শরৎ ?—গিরীন্দ্রনাথ এলেন সেখানে।

—'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে একটা সিন্ কর না তোমরা ; তুমি আছ প্রফুল্ল রয়েছে, শচী আছে—সেই ভিক্ষুকের সিন্‌টা কর—তিনজনে হয়ে যাবে।

—সময় কোথায়, শরৎ ?

—অনেক সময় আছে। আজই রিহার্সাল শুরু করে দাও। তুমি চাণক্য, প্রফুল্ল কাত্যায়ন, আর শচী ভিক্ষুক—ও গান গাইবে। দেবিন কোথায় ? দেবিন প্রম্‌টার হবে।

মহা উৎসাহে সেইদিন রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল।

অভিনয়ের রাত্তিরে উঠোনে আর লোক ধরে না—এত ভিড়। শরৎচন্দ্র বসেছেন বারান্দার ওপর—স্টেজের সামনাসামনি, তাঁর চারপাশে বাড়ির ও পাড়ার বড়রা বসেছেন।

প্রথমে শুরু হ'ল শারদোৎসব, ভালোই অভিনয় করলে ছেলেরা। দর্শকের কাছে বাহবা-ও পেলে যথেষ্ট।

তারপর শুরু হ'ল বড়দের অভিনয়—'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে চাণক্য, কাত্যায়ন ও অন্ধ-ভিক্ষুকের দৃশ্য। অন্ধ-ভিক্ষুকের ভূমিকায় শচীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে ও গান শুনে শরৎচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না ; অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ধরা-গলায় কয়েকবার 'আহা, 'আহা' বলে তিনি

উঠে নিজের ঘরে পালিয়ে গেলেন—বারান্দায় বসে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। খানিক পরে, চোখ-মুখ ভালো করে মুছে তিনি ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলেন—কিন্তু আর আলোয় বসলেন না—অন্ধকারে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে লাগলেন।

অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর তিনি শচীন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন—তুই এত ভালো অভিনয় করিস, শচী? চল তুই আমার সঙ্গে কলকাতায়—আমি তোকে শিশিরের (শিশিরকুমার ভাদুড়ী) দলে ঢুকিয়ে দেবো। শিশির আমাকে প্রায় বলে—দাদা, ভালো গান গায় আবার ভালো অভিনয় করে—এমন লোক আমি পাই না। তোর চেহারা ভালো, অভিনয় ভালো করিস. গানও চমৎকার গাইতে পারিস—শিশির তোকে লুফে নেবে।

কিন্তু নানা কারণে সেদিন শচীন্দ্রনাথের পক্ষে শরৎচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ভাগলপুরে গাঙ্গুলীদের সেই বাড়ি আজো আছে, বৎসরান্তে জগদ্ধাত্রী পুজো আজো সেই ঘরটিতেই অনুষ্ঠিত হয় - কিন্তু মণীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠে সে ঘর আর ধ্বনিত হয়ে ওঠে না, শরৎচন্দ্রের উচ্ছল হাসিতে সে ঘর আর মুখরিত হয় না।

মূক বাড়িটি সব দিনের পুঞ্জীভূত স্মৃতি বহন করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন একদিন ছিল, যেদিন এই বিদেশে শরৎচন্দ্র আমাদেরই মতো একজন অধম কেরানী ছিলেন এবং এই রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে তিনি একজন গায়ক বলিয়াই শুধু পরিচিত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই হোক কিংবা ১৯০৬-এর প্রথম ভাগেই হোক, শরৎবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয় কর্মসূত্রে একই অফিসে। এই অফিসে আর একটি বন্ধু জুটিয়াছিলেন, তিনি এখন পরলোকে। তাঁহারও একটু-আধটু সঙ্গীতে অধিকার ছিল, তাঁহারই প্রসাদে জানিতে পারিলাম শরৎবাবু সুগায়ক।

অপর একটি বন্ধু দীর্ঘকাল এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট দখল জন্মিয়াছিল। সেই ব্যপদেশে একটুখানি সঙ্গীতেও হয়তো বা তাঁহার দখল জন্মিয়া থাকিবে। ইহার জোরে দুর্লভ সঙ্গীত-বিদ্যাটাকে ইনি আমাদের মতো সঙ্গীতাভিজ্ঞদের কাছে যেরূপভাবে জাহির করিতেন, তাহাতে মনে হইত, আঃ! কী একটা মানুষের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে! এই বন্ধুটির সঙ্গে শরৎবাবুর একদম বনিবনা ছিল না। শরৎবাবুর সঙ্গীত প্রসঙ্গে ইনি প্রায়ই বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, 'ওঃ! ভারি তো গাইয়ে! 'তাল' কাকে বলে, সেই জ্ঞানই যার আদবে নেই, সে আবার গাইয়ে কিসের?

বন্ধু সুর-লয়, রাগ-রাগিণী, গমক-গিটকিরি, মূর্ছনা প্রভৃতির এমন সব আলোচনা করিতেন, যাহা আমাদের কাছে একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিত। তাঁহার এই দুর্লভ বিদ্যাটা আমাদের মতো ষণ্ডা মার্কাদের পাল্লায় পড়িয়া অচিরেই ধামা-চাপা পড়িবার যোগাড় হইল। ঝোঁক পড়িল আমাদের শরৎচন্দ্রের উপর। শীর্ণ রুগ্ন মলিন চেহারার এই লোকটির যে এমন সুকণ্ঠ, ইহাতে মনে হইত যে, বিধাতার বিচারে

এতটুকুও ভুল হয় নাই। এই শুষ্ক শীর্ণ দেহের ভিতরে তিনি যে মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সুর এই সঙ্গীত তাহারই লীলায়িত গতি-প্রবাহের শব্দ মাত্র।

শরৎচন্দ্র চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য ও সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন। একবার রেঙ্গুনবাসী বাঙালীরা মিলিয়া স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রকে এই শহরে অভ্যর্থনা করেন। সেই অভ্যর্থনা সভায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয়, তখন তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ওহে, সে ছোকরাটি কোথায় থাকে হে, রবির গান সে বড় চমৎকার গায়।' কিন্তু ছোকরাটিকে বহুবার অনুরোধ করিয়াও নবীনচন্দ্রের সদনে লইয়া যাইতে সক্ষম হই নাই।

আমার সেই পরলোকগত বন্ধুটি যাঁহার কৃপায় শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয়লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে খুড়ো সম্বোধন করিতেন। একদিন আমাকে বলিলেন, 'চল খুড়ো, আজ শরৎদার গান হবে, শুনে আসি।'

রেঙ্গুনে তখন একমাত্র 'বেঙ্গল সোস্যাল ক্লাব' ছিল বাঙালীর মিলন-কেন্দ্র। প্রায়ই সেখানে গীত-বাদ্যের অনুষ্ঠান হইত। দুই-একজন সুর-লয়ের ওস্তাদ সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বহুক্ষণ ধরিয়া তবলা তানপুরার সঙ্গে নানারকম সুরের কসরৎ দেখাইয়াও লোক-জনকে তেমন তৃপ্তিদান করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না।

সেইদিনকার গানের মজলিসে গান হয়তো সুরে-লয়ে জমিয়াই উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের মতো দুই-চারিজন অরসিকের কাছে কিছুই যেন ভালো লাগিতেছিল না। বন্ধুকে বলিলাম, 'না হে খুড়ো, আর তো ভালো লাগছে না—চল, এইবার সরে পড়া যাক। বলে এলে তোমার শরৎদার গান হবে। শরৎবাবু দেখছি মুষড়ে গেছেন।' এইবার খুড়ো আমার কথার চোটে শরৎদাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। শরৎবাবুর তো অসংখ্য ওজর-আপত্তি—"ওহে, আজ থাক,

আরেকদিন হবে। আজ যে পর্ব চলছে চলুক, অন্য রকম সুর করলে লোকজন সব চটে যাবে।'

খুড়ো সকলের সামনে দাঁড়াইয়া জোড়হাতে বলিলেন, 'এবার আপনারা দয়া করে দু-একখানা বাংলা গান বোধহয় শুনতে রাজী হবেন।'—বলিতেই সকলে প্রায় একবাক্যে সমর্থন করিল।

তবলার ওস্তাদ দাদামহাশয়ের শীর্ষস্থ সূক্ষ্ম শিখাটি অবিরাম মস্তকান্দোলনের জন্য গ্রন্থিচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। এইবার সেটিকে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া বাঁয়া তবলা হাতে করিয়া তড়াক করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। অমনি চারিদিক থেকে সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, 'কি করেন দাদামশায়! একটুখানি বসুনই না হয়।'

আর দাদামশাই! কাহারো অনুরোধ-উপরোধের ধার দিয়াও তিনি গেলেন না। দপ দপ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় সকলকে শুনাইয়া বলিয়া গেলেন - 'এখন তোমাদের—আয় না অলি কুসুম তুলি'—হোক ভায়া, এখন আর আমাকে কেন?' বলিয়াই নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। বাকি এখন রহিলেন শরৎবাবু, আর রহিলাম আমরা।

শরৎবাবু যে গান ধরিলেন, দেখিলাম. সে তো 'আয় না অলি কুসুম তুলি'র ধার দিয়াও গেল না। প্রথমেই ধরিলেন জ্ঞানদাসের সেই বিখ্যাত পদ—'তোমারি গরবে গরবিনী রাই, রূপসী তোমারি রূপে'। মরি মরি মরি! বাংলা গানে যদি প্রাণ থাকে তো এইসব মহাজনদিগের পদেই আছে, আবার বাঙালীর প্রাণেও যদি সত্যিকার গান থাকে তো সেও এই বৈষ্ণব গানই। শরৎচন্দ্র যে কী গাহিলেন, বলিতে পারি না। দেখিলাম, তাঁহার চোখ দু'টি ছল ছল করিতেছে—রুগ্ন শীর্ণ কণ্ঠ যেন সঙ্গীতের ভারে ফাটিয়া পড়িতেছে। কী সে প্রাণের বেদনা! কী সে মর্মের ক্রন্দন! সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আসিয়া সকলের মরমে প্রবেশ করিতেছে। গান বলিতে যদি কিছু থাকে, যাহার ভিতরে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সে এই গান, প্রাণ-জুড়ানো সঙ্গীত।

সেই হইতে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের ভক্ত হইয়া পড়িলাম এবং ওস্তাদদিগকে সঙ্গীতের আসর হইতে বিদায় দিলাম।

শরৎবাবু এখানে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের বাসায় থাকিতেন। সেই আত্মীয়টির দেহান্তর ঘটিলে, কিছুদিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেসে থাকিতে বাধ্য হন। যখন আমাদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে তখন খুড়ো প্রমুখ বন্ধুবান্ধবসহ আমরা সকলেই 'একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস্' অফিসের কেরানী। পূর্বোক্ত দাদামহাশয় এবং হিন্দুস্থানীদের দেশ-ফেরত সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুটিও আমাদের অফিসে। শরৎবাবু কোথায় যেন পেগু না টঙ্গুতে চাকরি করিতে গিয়াছিলেন, হঠাৎ একদিন আমাদের মাঝখানে লম্বা লম্বা চুল ও দাড়ি লইয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চেহারায় তাঁর গায়ে একটা আলখাল্লা হইলেই ঠিক মানাইত। কেহ কেহ রগড় করিতেও ছাড়িল না। জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাউলের বেশ তো ঠিকই হয়েছে, এবার একটা গুপী যন্ত্র-টন্ত্র নিয়ে শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়ুন। যে গলা, কোনো ভাবনা নেই।'

দাদামশায় দন্তহীন মুখে হে-হো শব্দে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্রের যে কোন দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক বেশী ছিল তাহা আমরা কেহই প্রথমটায় ধরিতে পারি নাই। তবে গায়ক বলিয়া যা কিছু খ্যাতি ছিল, সেটি তাঁহার নিজের দোষেই অবশেষে মাটি হইতে বসিল। কোনো গান আরম্ভ হইলে শেষ পর্যন্ত সেটি গাহিবার ধৈর্য তাঁহার প্রায়ই থাকিত না। আরব্ধ গানের মাঝখানে হঠাৎ হারমোনিয়ম ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেন। অমনি চারিদিক হইতে অনুরোধের পর অনুরোধ—'কি হে, শরৎদা! একি করলে? ঘাটে এসে ভরাডুবি? অন্য গান না গাও এখানাই অন্ততঃ শেষ করে যাও!'—আর শরৎদা! ততক্ষণে তিনি সিঁড়ি বাহিয়া রাস্তায় নামিয়া গিয়াছেন।

আমার খুড়োটি ছিল শরৎদার নামে পাগল, তিনি কখনও কখনও তাঁহার পায়ে পর্যন্ত পড়িয়া সাধাসাধি করিতেন। শরৎদা তখন হয়তো অঙ্গুলি নির্দেশে কাহাকেও দেখাইয়া দিয়া বলিতেন, 'ওহে, অমুক গাইবে।' কখনও বা আমাদেরই অপর একটি বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিতেন, 'ওহে, মানিক গাবে'খন।...ও চমৎকার গায়।'

এইরূপে ক্রমশঃ গানের আড্ডা হইতে শরৎবাবু আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন। কেননা, গানের মজলিস একবার বসিলে আর শীঘ্র ভাঙিবার নামটি নাই। ইহার উপর যদি কোনো গায়কের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার গান একবার শ্রোতাদের কানে ভালো লাগিয়া যায় তো ঐ গায়কের আর দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। বন্ধুবান্ধব, এমনকি আত্মীয়স্বজন পর্যন্তও তাঁহাকে রেহাই দেন না। চালাও যত হুকুম ঐ গরীব বেচারার উপর—ইহাতে সে মরুক আর বাঁচুক।

শরৎবাবু কোনোদিনই স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। অধিকক্ষণ গান গাহিতে হইলে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তাই কতকটা বাধ্য হইয়া, কতকটা বা অধ্যয়নের জন্য এইসব মজলিস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ সেদিন আমাদের ক্লাবের সম্মুখে দাদামশায়ের সঙ্গে আমার দেখা। দাদামশায় তাঁহার দন্ত-বিরল মুখে প্রচুর পরিমাণে মধুর হাসির ছটা বিকীর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে ভাই শরৎদা। আর এ-দিকটে মাড়াসনে যে!'

শরৎদাও 'প্রণাম' বলিয়া হাত দু'খানি কপালে ঠেকাইয়া তেমনি হাসির ছটা বিকশিত করিয়া উত্তর দিলেন, 'কি করবো দাদামশাই, নেহাৎ দুর্ভাগ্য তাই আসতে যেতে পারিনি।

'দুর্ভাগ্য তোর না আমাদের বল ভাই। মিত্তির, কি বল ভাই, এ সম্বন্ধে?' বলিয়াই পার্শ্বচর মিত্র মহাশয়ের দিকে একটুখানি সকৌতুকে কটাক্ষ করিলেন।

মিত্র মহাশয় যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, 'বটেই তো, দাদামশাই! ঠিক বলেছেন। শরৎদার যে কেন আর আমাদের এদিকটায় পায়ের ধুলো পড়ে না, তা শরৎদাই বলতে পারেন। একবার দয়া করে আমাদের ওদিকে—'

শরৎদার হইয়া মিত্র মহাশয়ের কথার আমিই জবাব দিলাম, বলিলাম, 'নিশ্চয়ই হবে।' বলিয়াই আর বাক্যব্যয় না করিয়া শরৎদার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একরূপ জোর করিয়াই দাদামশায়দের মেসের বাসায় লইয়া গিয়া উঠিলাম।

বাসায় একটি শখের হারমোনিয়াম ছিল। যিনি শখ করিয়া যন্ত্রটি কিনিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা-সোপানের প্রথম ধাপে পা দিতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। পয়সার জিনিসটা এখন ধুলাবালিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। শরৎবাবু যন্ত্রটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া বেলো করিতেই সুমিষ্ট সুরলহরীতে ক্ষুদ্র কক্ষটি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তারপর যখন তিনি কিন্নর-কণ্ঠে ধরিলেন—

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো বলে হে তাই এসেছিলাম এ গোকুলে
আমায় স্থান দিয়ো রাই চরণতলে।
মনের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেজেছি বিদেশিনী
এখন বাঁচাও রাধে কথা ক'য়ে
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
তুমি যদি না কও কথা, ফিরে যাব যমুনাকূলে
ভাঙবো বাঁশী ত্যজবো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙুক মান,
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে
চরণ-নূপুর বেঁধে গলে,
ঝাঁপ দিব যমুনা-জলে।

এই গানটি পূর্বে থিয়েটারে মাতাল দেবেন দত্তের অভিনয়ে যাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিও একজন অসাধারণ রঙ্গাভিনেতা।

ও কিন্নর কণ্ঠ গায়ক। তাঁহার মুখেও গান শুনিয়াছিলাম, শরৎবাবুর মুখেও শুনিলাম। সঙ্গীত-বিদ্যায় যে শরৎবাবুর অপেক্ষা তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে অধিক, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শরৎবাবুর প্রাণটি নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণের চাইতে বড়, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায়। কেননা, যে গানে একদিন হাসির উদ্রেক করিয়াছিল, আজ সেই গানে হাসির পরিবর্তে অনাবিল অশ্রুর ঝরনা বহাইয়া দিয়া গেল।

গানটি সমাধা হইতেই অনুরোধ-উপরোধের অন্ত রহিল না। অগত্যা আরও দুই-একখানি গান তাঁহাকে গাহিতে হইল। কিন্তু সে গান অনিচ্ছাসত্ত্বে গাহিবার দরুনই আগেরটির মতো জমিল না।

একদিন আমাকে শরৎদা বই-এর দোকানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কি কিনব বল তো?'

মুখের পানে নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি নিজেই বলিয়া ফেলিলেন, 'এই দেখ আজ কি কিনতে এসেছি।' বলিয়াই তিনি রং তুলি বাছাই করিতে লাগিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ আবার কি খেয়াল মাথায় ঢুকল, শরৎদা?

'দেখ কি করে বসি এবার।'—বলিয়া তিনি গুটিতিনেক তুলি আর দু'তিন রকম রং কিনিয়া লইলেন।

আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হবে এ দিয়ে?'

উত্তর পাইলাম, 'পরশু রবিবারে একবার আমার বাসায় গিয়ে দেখো, কি হয় এসব দিয়ে।'

রবিবারে তাঁহার বাসায় গেলাম। গিয়া দেখি, তিনি মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া যে বাড়িতে একাকী অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সে বাড়িটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও একার পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষুদ্র গৃহটির

সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের প্রান্ত-সীমায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি পজুন্ ডাঙের খাড়িটি রেঙ্গুন হইতে বাহির হইয়া উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে জনপদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মাঠটির দৃশ্য কী সুন্দর তখন! যেদিকে তাকাও যেন সোনা গলানো। গিয়া ডাকিলাম, 'শরৎদা! ও শরৎদা!'

'কে, সরকার নাকি? আরে এসো এসো। এতদূরে চিনে আসতে পেরেছ তো?'

উত্তর করিলাম, 'দেখতে তো পাচ্ছেন, পেরেছি। আর নাই যদি পারব তো এলাম কি করে?'

'তাই তো দেখতে পাচ্ছি। গঙ্গা তো আমার বাসার নাম শুনেই আঁৎকে উঠল সেদিন। আমি ও হতভাগাটাকে কিছু বললাম না। তুমি এসেছ, এতে আমি ভারি খুশী হয়েছি, সরকার; এসো, বসো এসে ভেতরে।'

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। সম্মুখে কক্ষটির উপযোগী একটি স্বল্পপরিসর বারান্দা। রেলিঙের একপাশে তক্তার উপর টবে বসানো একটি তুলসীর চারা, অপরপাশে একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ-সব কি, শরৎদা?'

'ওহে, এটা যে হিঁদুর বাড়ি, এ-কথাটা ভুলে যেয়ো না, সরকার।' —বলিয়াই আমার হাত ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে মাঝের ঘরটিতে আনিয়া বসাইলেন।

প্রথমটায় চোখে পড়ে নাই। এবার ঘরের ভিতরটায় ঢুকিতেই চোখে পড়িল, একটা ইজেলের উপর ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসের পট। তার গায়ে কেবল পেন্সিলের দাগ—কোথাও কোথাও রঙের পোঁচ। ব্যাপারটা বুঝিতে বাকি রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ শিক্ষার গুরু কে, শরৎদা?'

'এ গুরু আমি নিজে'—বলিয়া বাম হাতের তর্জনী দিয়া নিজের

কপালটি দেখাইয়া একটুখানি হাসিলেন। তারপর ছবির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যটি কিরূপ করিলে সুন্দর মানাইবে, কোন রঙে ইহার এফেক্ট কিরূপ বাড়িবে, সেই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। মোটের উপর, আমি তার এক বর্ণও বুঝিলাম না। কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া গেলাম।

ছবি আঁকার ঝোঁকটার ভিতরে শরৎবাবুর কতখানি যে প্রাণের দরদ ছিল তাহা এতদিন পরে সত্য-সত্যই নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ-কথা সত্য যে, তাঁহার যতটুকু চিত্রকলা বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাহাতে তাঁহাকে চিত্ররসজ্ঞ বলিলে ভুল হইবার কোনোই কারণ ছিল না। এই চিত্রবিদ্যার প্রসঙ্গে আমাকে সময় সময় অদ্ভুত রকমের সব প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন।—'আচ্ছা বল তো সরকার, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় পেণ্টার কে?'

উত্তর দিলাম, 'র‍্যাফেল বড় পেণ্টার।'

'উঁহু—হ'ল না। র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে, তিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেণ্টার।'

ওই সময়ে আমি 'উইণ্ডসর ম্যাগাজিনে' বোধ হয় স্যার জন এভারেস্ট মিলের কি বিখ্যাত নিসর্গ-শিল্পী টার্নারের চিত্র-পরিচয় পড়িতেছিলাম। ইহাদের নাম করিতেই শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'একালের চিত্রকরদের মধ্যে মিলের টার্নারের খুব নাম। দু'জনেই বিলাতী চিত্রকর। স্যার জোশুয়া রেনলডস্ ও গেইন্‌সবরোর পর এঁরাই বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।'

ঐ প্রসঙ্গে এ্যালমা ট্যাডেমার নামও করিলেন। আমি নিসর্গ চিত্রের চিরদিনই পক্ষপাতী। যেমনি বলিয়াছি যে, 'আমার কাছে টার্নারের ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টিং খুব ভাল লাগে'—অমনি শরৎবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টিং-এর চেয়ে হিউম্যান পেণ্টিং ফোটানো ঢের শক্ত। রীতিমত অ্যানাটমির জ্ঞান না থাকলে হিউম্যান পেণ্টিং ভাল আঁকা যায় না ছবিখানি হওয়া চাই যেমন

জীবন্ত, তবে তো ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর যা-তা রং দিয়ে আঁচড় পড়লেই ছবি হ'ল না। তোমরা তো র‍্যাফেলের ম্যাডোনা দেখেছ? বাজারে ও-ব্যক্তির খুব নাম হলেও বড় বড় সমালোচকদের কাছে ও থার্ড ক্লাস পেণ্টার বলে গণ্য হয়ে আসছে। তিসিয়ানের কাছে ও দাঁড়াতেই পারে না।'

এই তিসিয়ান সম্বন্ধে শরৎবাবুর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। যতদূর মনে পড়ে শরৎবাবু ইটালিয়ান চিত্রকলার পরেই ফ্লেমিশ্ ডাচ এবং বৃটিশ চিত্রকলার প্রশংসা করিতেন। এক রবিবারে গিয়া দেখি, ইজেলের উপর কাপড়ঢাকা একখানি ছবি।

'ওখানা কি, শরৎদা?'

প্রশ্ন শুনিয়াই সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, তুমিই বল আগে কি ওখানা?'

'কি আর হবে—ছবি!'

'বড় তো বললে ছবি!…ছবি ছাড়া ওখানা আর কি হতে পারে? কার ছবি যদি বলতে পার তো বুঝি তোমার অনুমানের জোর।'

'যদি বলি নারদ মুনির—?'

'হ্যাঁ, তাই। এই ছাখ'—বলিয়াই ছবির উপর হইতে কাপড়ের ঢাকনাটা সরাইয়া দিলেন। আমি তো দেখিয়াই অবাক। সত্য-সত্যই যে সেই বুড়োর ছবি! গ্রাম্য পুকুরের পাড়ে এলোমেলো গাছপালা, তারই মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা ভাঙাচোরা রাস্তা, তারই পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া একটি বৃদ্ধ। যে একবার ওই নারদ মুনিকে দেখিয়াছে সে কদাপি এমন কথা বলিবে না যে, এ আর কারও ছবি। বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের উপর নৈরাশ্যের কেমন গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে, সেটিই দেখিবার বিষয়। শরৎবাবু বলিলেন, 'আজ আবার বুড়ো আসবে, তখন ব'লো কোথায় কোথায় ডিফেক্ট আছে।'

'যা হোক, আর দুনিয়ার লোক পেলেন না, শরৎদা!'

'তা আর কি করব ভাই। আর লোক কোথায় যে, তাকে

জিজ্ঞেস করবো ? না হয় বটুবাবাকেই জিজ্ঞেস করা যাবে। কি বল বটুবাবা ?' বলিয়া—দাঁড়ে ঝুলানো ময়নাটির কাছে গিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইলেন। বটুবাবাও তাঁহার মুখের সঙ্গে ঠোঁট ঘষিয়া তাঁহাকে আদর জানাইল।

'আচ্ছা শরৎদা, এই বুড়োর নাম নারদ মুনি হ'ল কেমন করে বলুন তো ?'

প্রশ্ন শুনিয়াই সহাস্যে কহিলেন, 'কেন, এই যেমন করে আমার নাম শরৎ চাটুয্যে, তোমার নাম যোগীন সরকার হয়েছে, ঠিক এমনি করেই। তাই যদি বা না হ'ল, তো অমন পাকা চুল, দাড়ি, গলায় অমন কাঠের মালা, মুখে হরিনাম, এতেও কি এ বেচারাকে নারদ মুনি বলা ভুল হয় ?'

'আচ্ছা, বুঝলাম। এখন একবার এলে পরে ' মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সিঁড়ির উপর আওয়াজ শোনা গেল 'দেবতা ঘরে আছেন ?' গলা বাড়াইতেই দেখি, সত্য-সত্যই নারদ ঋষির আবির্ভাব হইয়াছে। একটুখানি নীচে নামিয়া গিয়া বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিলাম। সে তখনো হাঁফাইতেছিল। সেই অবস্থায়ই গড় হইয়া তাহার দেবতাকে প্রণাম করিল। ঐ সঙ্গে একটা প্রণাম আমার কাছেও পৌঁছিল।

শরৎবাবু বৃদ্ধের অলক্ষিতে ছবিখানি তুলিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন। বৃদ্ধের কোটরস্থ চোখ দুইটি একবার জলজল করিয়া উঠিল। তারপর কহিল, 'দেবতা, এতও আপনার মাথায় আসে ?'

শরৎবাবু প্রত্যুত্তরে কহিলেন, 'ছাখ নারদ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কজটা ভাবছ খুব শক্ত ? না, তা নয়। রোজ সকালবেলা আমার এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্তে আসতে পার ? চা-টাও খেতে পারবে, আর আমার ছবি আঁকাও দেখতে পারবে।'

চায়ের উল্লেখে বৃদ্ধ মনে মনে একবার পরম উপাদেয় বস্তুটির

স্বাদ উপভোগ করিল, পরে মুখেও চপ চপ করিয়া বার দুয়েক শব্দ করিল। শরৎবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া গেলেন। পরে এক পেয়ালা চা লইয়া আসিয়া বৃদ্ধের সামনে নামাইয়া রাখিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন 'বড়ই কষ্ট হয়েছে, নাও চা খাও।'

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের হয়েছে তো, দেবতা ?'

'ওহে, দেবতাদের কি আর ওটি বাকি থাকতে আছে ? তুমি এখন খেয়ে নাও চট করে। নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

তাহার চা-পান শেষ হইলে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার অবয়বের সহিত ছবির অবয়ব মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, 'কত যে ডিফেক্ট আছে সরকার, তা আর কি বলবো। যাক, যখন একবারটি হাত দিয়েছি, তখন আর সোজায় ছাড়াছাড়ি নেই। যা হোক একে মনের মতো করে ফিনিস করতে হবে। নইলে পয়সা খরচের কথা ছেড়েই দাও, বিলকুল মেহনতটা মাটি হয়ে যাবে।'

আমিও বলিলাম, তাই করুন। শরীর-ক্ষয়, অর্থ-ব্যয় এই দুটোই যেন মাঠে মারা না যায়।'

'ওহে, তা আর বলতে হবে না তোমাদের কাউকে'—বলিয়াই তিনি ছবির দিকে মনঃসংযোগ করিলেন।

শরৎবাবু এবারে একখানা নূতন ছবি আঁকার আয়োজন করিতে-ছিলেন। নূতন করিয়া সরঞ্জামের যোগাড় করিয়া নূতন ক্যানভাসের উপর এক নূতন চিত্রের পরিকল্পনা নেহাৎ মন্দ হইতেছিল না। তাঁহার সর্বপ্রথম চিত্র 'রাবণ-মন্দোদরী'-খানা কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল। এখানা দেখা গেল সেই সব অস্পষ্টতা দোষরহিত, অতিরিক্ত আলোক-সম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল তাও নয়। আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মতো নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এ্যানাটমির জ্ঞান, পারস্পেক্টিভ এবং ব্যাক-গ্রাউণ্ডের আইডিয়া

সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণ-জ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর, একসঙ্গে নিসর্গ-চিত্র ও মনুষ্য-চিত্র মিলাইয়া যাহা হয়, ঠিক তাহাই, এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল প্রকৃতির খেয়ালী-সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

বর্ষার দিনে অচ্ছোদের তীর ঝাপসা দেখাইতেছিল, ওপারে মেঘ-ভারাবনত আকাশ আরও অস্পষ্ট, ইহার একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য একটুখানি উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশা সদ্য-স্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা রোরুদ্যমানা প্রকৃতিদেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।

স্বল্পান্ধকার ক্ষুদ্র ঘরটির এক কোণে ছবিখানি এমনিভাবে বসানো যে, দরজার একপাশ খুলিলে যতখানি আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারই সাহায্যে ছবিখানিকে ভালোরূপে বোঝা যায়। শরৎবাবু সেই অবস্থায়ই আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। বুঝিলাম, সকল উন্নত কলার মধ্যেই সেই চিরসুন্দরের আনন্দঘন রসমূর্তিরই বিকাশসাধনের চেষ্টা। বাস্তবিকই একটুখানি উদার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আপাতকুৎসিত জিনিসটিও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অবশ্য শরৎবাবু যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেটি নগ্ন সৌন্দর্যের চিত্র নয়। নগ্ন হইলেও বোধ হয় কুৎসিত বলিতে পারিতাম না এই কারণে যে, তাহার সহিত পারি-পার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল।

শরৎবাবুর চিত্রকলার পরিচয় আমিই জানিতাম। ঠাট্টা-বিদ্রূপ হইতে নিজেকে এবং শরৎবাবুকে বাঁচাইতে গিয়াই কাহারও কাছে এ-কথাটি ভাঙি নাই। তবে এ-কথা সত্য যে, এই ছবি আঁকা দেখিবার ঝোঁকেই আমি তাঁহার বাড়ি অত ঘন ঘন যাইতাম। কেননা আমার মনে হইত ছবি আঁকা বাস্তবিকই একটা দেখবার মতো জিনিস—কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত-চর্চার চেয়েও কাজটি ঢের শক্ত। এই উপলক্ষে আরও অনেকের শুভাগমন ঘটিত।..

কিছুদিন থেকে শরৎচন্দ্র ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন বলে আমাদের অনুরোধে তিনি কাশী চলে যান। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই আবার কোলকাতায় চলে আসেন। আমি বললাম—"কিছুদিন থেকে এলে তো ভালো হ'ত; তাড়াতাড়ি চলে এলেন কেন দাদা?"

বেশ সহজকণ্ঠে শরৎচন্দ্র বললেন—"শীগগিরই মরে যাব, তাই অনেকদিনের একটা শেষ সাধ মেটাতে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।"

"শীগগিরই মরে যাবেন? কি করে বুঝলেন?"

"হ্যাঁ, আমি বুঝেছি; দেখো।"

মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো। তবুও সেটাকে চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওসব বাজে কথা আর বলবেন না। যাক; শেষ সাধটা কি শুনি?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবলেন; তারপর বললেন—"জীবনে অনেক জায়গা থেকে অনেক 'অভিনন্দন' আমি পেয়েছি; অর্থাৎ আমি খালি নিয়েছি; কারুকে কিছু দিইনি। সেই জন্যে অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে, আমি একজনকে 'অভিনন্দন' দিয়ে যাব।"

"খুব ভালো কথা। কাকে দেবেন?"

"দেবো একজনকে।" একটু থেমে আবার বললেন—"উপযুক্ত পাত্রকেই দেবো।"

কাকে দেবেন, তা যখন তিনি বললেন না, তখন বার বার জিজ্ঞাসা করার অসভ্যতাটা আমি আর করলুম না। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, শরৎচন্দ্র নিজ হাতে অভিনন্দন দেবেন যাঁকে, তিনি কে হতে পারেন? দু'তিনজনের নাম আমার মনে হ'ল, যাঁরা খোদ শরৎচন্দ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হবার পক্ষে সত্যিই উপযুক্ত। তাঁদের

মধ্যে অশীতিপর বয়স্ক রায় বাহাদুর জলধর সেন মশায়ের নামটাই বেশী করে আমার মনে হতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না—"জলধর সেন কি ?"

"না।"

তখন আরো দু'জনের নাম করলাম : কিন্তু তিনি তাঁর ঐ নেতি-বাচক প্রথম উত্তরটাকেই বজায় রাখলেন। এরপর আর জিজ্ঞাসা করা চলে না ; সুতরাং নীরব রইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে ঐ ক'জনের নাম জোয়ার-ভাঁটার মতো কেবলি আসতে-যেতে লাগলো। অথচ ঔৎসুক্য ও অভদ্রতার কাছে হার মেনে, মুখ ফুটে এরপর আর জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

দু'-একদিন পরে একদিন কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন—"শরৎচন্দ্র আপনাকে 'অভিনন্দন' দেবেন।"

চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমাকে ?"

"হ্যাঁ।"

বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করলুম—"আমাকে কেন ?"

"তা বলতে পারি না। যে কারণেই হোক, শরৎচন্দ্র আপনাকে খুবই পছন্দ করেন এবং আপনার লেখাও তাঁর খুব ভালো লাগে ; সেই জন্যে তিনি আপনাকে অভিনন্দন দিতে চান।"

কয়েক মাস পূর্বে কবিশেখর 'দেশ' পত্রিকায় 'রসচক্র ও শরৎচন্দ্র' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে আমার এই 'অভিনন্দন' সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেছেন, তার মোটামুটি কথা এইরূপ—'অসমঞ্জবাবু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লিখিত একখানা বই পাঠিয়ে দেন। সেই বই পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশংসাপূর্ণ পত্র দেন। তারপর অসমঞ্জবাবু তাঁর আর একখানা উপন্যাস—'মাটির স্বর্গ' পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে এ বইখানার খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। এতে অসমঞ্জবাবু খুবই ব্যথা পান। এই সূত্রেই শরৎচন্দ্র এক-দিন আমাকে বলেন—'ও বড় মন-মরা হয়ে আছে, ওকে সান্ত্বনা ও

উৎসাহ দেওয়া দরকার। তোমার 'রসচক্রে'র একটা বড় অধিবেশনের মাধ্যমে ওকে একটা অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা কর। আমি নিজেই ওকে অভিনন্দিত করবো।......"

—শরৎচন্দ্র এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, তার কিছুদিন পরেই 'রসচক্রে'র এক প্রকাশ্য অধিবেশন হয় এবং তাতে শরৎচন্দ্র অসমঞ্জ-বাবুকে অভিনন্দিত করেন।......এই ব্যাপারে যা ব্যয় হয়েছিল, শরৎচন্দ্র তার একটা মোটা অংশ দিয়েছিলেন"... ..ইত্যাদি।

অনেক দিনের কোনো পুরোনো ব্যাপারে একটু-আধটু ভুল-ভ্রান্তি এবং অসামঞ্জস্য হওয়া স্বাভাবিক। তা'ছাড়া সেই সামান্য ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে আমার 'অভিনন্দন' ব্যাপারের বিশেষ কোনো সম্বন্ধও নেই, তা'হলেও ব্যাপারটা এই যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে আমি একখানা নয়, আমার সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত ছ'খানা বই পাঠিয়েছিলাম ও তিনি সব বইগুলি পড়ে, অত্যধিক প্রশংসা করে আমায় পত্র দেন। পরের মাসেই আবার আর একখানা উপন্যাস (মাটির স্বর্গ) বার হ'লে, আমার প্রকাশক ওখানাও রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। সে সময় কবির দেহ-মন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। তখন তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিংয়ে অবস্থান করছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি 'মাটির স্বর্গে'র বিরুদ্ধ সমালোচনা করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দেন। এটা ১৩৩৮ সালের কথা। এজন্য যদি সে-সময় আমি কিছু মনোব্যথা পেয়ে থাকি, তা নিরসনের জন্য শরৎচন্দ্র ঐ সময়েই আমাকে সান্ত্বনা দিতেন; বা ছ'মাস এক বছর পরেও দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমায় 'অভিনন্দন' দেন ১৩৪৪ সালে, অর্থাৎ ছ'বছর পরে। সুতরাং কবিশেখর আমাকে অভিনন্দন দেবার যে-কারণটার কথা লিখেছেন, সেটা আমার মনে হয় যথার্থ নয়। কবি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি তাঁকে চিরকাল যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এসেছি। কোনো কারণে শ্রদ্ধাস্পদ প্রবাসী-সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দবাবু আমার ওপর একটু ক্ষুব্ধ হন।

ঐ সূত্রে সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথও হন। এটা শরৎচন্দ্র জানতেন। কিন্তু কবির এই ক্ষুণ্ণ ভাব অল্পদিন পরেই দূরীভূত হয় এ সংবাদ সে সময় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমাকে অভিনন্দন দেবার জন্যে শরৎচন্দ্রের এই প্রবল ইচ্ছার কথা সেদিন কবিশেখরের মুখে শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল;—সত্যই খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার পক্ষে যে খুবই গৌরবের, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এর আর একটা দিক ছিল। এই গৌরবলাভের পেছনে কত বড় যে একটা বিপদ আছে, তা ভালোভাবেই আমি জানি। সুতরাং সেই নিশ্চিত বিপদের জন্য আমি ভীত হয়ে পড়লুম। আমাকে শরৎচন্দ্র 'অভিনন্দন' দিলে, কোনো কোনো লোকের সেটা মোটেই ভালো লাগবে না এবং আমাকে তাঁরা বিষ-নজরে দেখবেন। আমার লেখা রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের একটু ভালো লাগে এবং তাঁরা তার প্রশংসা করেন—এটাই অনেকে সহ্য করতে পারেন না এবং এজন্যে তাঁদের মন অস্বস্তিকর ও পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর ওপর, শরৎচন্দ্র যদি আমাকে অভিনন্দিত করেন, তা'হলে তো কথাই নেই। এখন এ-বয়সে হলে, ওসব গ্রাহ্যই করতাম না বা ভয়ও পেতাম না; কিন্তু তখন তো জিনিসটা আমাকে সত্যই আতঙ্কিত করে তুললো।

অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু ভেবে-চিন্তেও এর কোনো উপায় বার করতে পারলুম না। শরৎচন্দ্র দ্বারা অভিনন্দিত হওয়ার লোভটাও বড় কম নয়। কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে যেতে লাগলো—উপরে লিখিত ওই সবের ভয় ও আতঙ্ক। যাই হোক, শরৎচন্দ্রকে আমি এ সম্বন্ধে অনেক বোঝালুম, অনেক অনুরোধ করলুম, কিন্তু কোনোই ফল হ'ল না। তখন দু-পাঁচজন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কাছে পরামর্শ চাইলুম—কি করা যায়। তাঁরা সকলেই বললেন—"এ তো সৌভাগ্য, এতে অমত করবার আছে কি?" আমার ভগিনীপতি, কালীঘাট-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গত গুরুপদ হালদার বি. এল দর্শনশাস্ত্রী

মহাশয় একটা সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে বললেন—"উপযাচক হয়ে মান্য নিতে নেই, কিন্তু তা আপনি এলে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই।" যাক ; প্রত্যাখ্যান আর করলুম না। বিশেষতঃ এই সময়টাতে শরৎচন্দ্র ঘন ঘন অসুখে পড়ছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিয়ে তাঁর মনে ব্যথা দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করলুম না। বরঞ্চ মনে একটা ভয় হ'ল যে, তাঁর মুখে ঐ 'শীগগির মরে যাবার' কথাটা সত্য হয়েই ফলে যাবে নাকি ?

এই সময় একদিন তাঁর শরীরের অবস্থা জানবার জন্যে আমার এক ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলুম। ছেলের হাত দিয়ে তিনি একখানা চিঠি পাঠালেন। সেটা এখানে হুবহু তুলে দিলুম।

24, Aswini Dutt Road,

Sarat Chandra Chatterjee Phone—South 84

1—5—'37

প্রিয়বরেষু—

জ্বর এবং অর্শের রক্তপাত সমভাবেই চলছে, বরঞ্চ একটু বেশী বললেও অন্যায় বলা হয় না।

তোমার ছেলে আমার পায়ের ধুলো নিয়েছে, আশীর্বাদ করেছি।

শরৎদা

পুঃ—বাড়ির সকলের অত্যন্ত অমত থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজন করচি। সজ্ঞানে ঐটিই শেষ কাজ।

৮

কয়েকদিন পরে 'রসচক্রে'র এক সভ্য-বন্ধু আমার বাসায় এসে জানিয়ে গেলেন—"আর কয়েকটা দিন পরেই, ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার শরৎচন্দ্র আপনাকে 'অভিনন্দন' দেবেন।" আমি তাঁকে বললাম—"আমাকে না দিয়ে, শরৎচন্দ্র যদি আর কাকেও দিতেন, ভালো হ'ত। আমার চেয়ে বহুগুণ উপযুক্ত লোক রয়েছেন, তাঁদের কাকেও দিলে…"

"না · আপনাকেই তাঁর দিতে ইচ্ছে, এবং ইচ্ছেটা অনেকদিনেরই। শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার দিয়েছেন রাধেশদা'র ওপর।" রাধেশদা—অর্থাৎ কবিশেখর কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। রাধেশের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। রাধেশ বললেন, "আপনার জন্যে মুর্শিদাবাদী গরদের 'জোড়', রূপোর চন্দন-বাটি, 'ট্রে' প্রভৃতি সব কিনে ফেলেছি। শরৎদা'র হুকুম, কোনও জিনিস যেন খারাপ না হয়। যে টাকা তিনি আমাকে দিয়েছেন, তাতে যদি না কুলোয়, আরো যদি টাকা লাগে, তিনি চেয়ে নিতে বলেছেন" —ইত্যাদি।

মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ করতে লাগলাম, যদি হঠাৎ কোনো কারণে কোনও রূপে ব্যাপারটি বন্ধ হয়ে যায়! সে জন্যে একে-তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, কতদূর কি হচ্ছে। আমার মনোমত উত্তর কারো কাছ থেকেই কিছু পাই না। সকলেই বলেন—"কাজ এগুচ্ছে। রাধেশবাবুর ওপর শরৎচন্দ্র ভার দিয়েছেন, ও আর দেখতে হবে না।" একজন বললেন—"আজ বোধহয় অভিনন্দন-পত্র ছাপাতে দেওয়া হ'ল।"

মনে মনে বুঝলুম, আর কোনো আশা-ভরসা নেই, অভিনন্দনটা হবেই। জানতে পারলুম, বেলগাছিয়াতে 'দ্বারকা-কানন' নামে একটি সুন্দর বাড়িতে অভিনন্দনের আয়োজন হবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ অভিনন্দনের দিন। ১লা জ্যৈষ্ঠ শরৎচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখে আমার এক ছেলের হাত দিয়ে পাঠালাম। লিখলুম— "দাদা, ঠিকই কাল অভিনন্দনের ব্যাপারটা হবে? আমাকে কি তাহলে যেতেই হবে? আপনার শরীর কেমন আছে?" আমারই চিঠির এক পাশে শরৎচন্দ্র লিখে দিলেন—

"Injection নিয়ে আজ শয্যাগত। দিন কয়েক পূর্বে রাধেশ এসেছিলেন—সব ঠিক করেছেন বললেন, তার পরে আর কোনো সংবাদ জানিনে।"

অভিনন্দন সম্পর্কীয় প্রশ্নটার উত্তর, পাশ কাটিয়ে যে এড়িয়ে যাবার মতলব, তা বেশ বুঝতে পারলুম। পাছে, শেষ মুহূর্তে আমি বেঁকে বসি তাই সংক্ষেপে যেন জানাতে চাইলেন—'কোনো সংবাদ জানিনে।'

পরদিন বেলা আন্দাজ ১টার সময় আমি বেলগাছিয়ায় যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে আরও দু'চারজন কে কে গিছলেন, তা ঠিক আমার স্মরণ নেই। সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের যাবার আগেই 'দ্বারকা-কানন' গুলজার; হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। বহু সাহিত্য-রসিক, কবি, শিল্পী প্রভৃতির উপস্থিতিতে বাগানবাড়ি কোলাহল-মুখর। নীচের রান্নাবাড়িতে শ্রীমান রাধেশের তত্ত্বাবধানে আহার্যাদির প্রস্তুতি ব্যাপার পূর্ণোৎসাহে চলছে। রাধেশ সেখানে একখানা চেয়ার নিয়ে বেশ জুত করে বসে আছেন। আয়োজন প্রচুর; সুপ্রচুরও বলা যেতে পারে।

বেলা ১১টা আন্দাজ, শরৎচন্দ্র তাঁর মোটরে করে এসে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর শরীর গত কয়েকদিনের তুলনায় একটু ভালো থাকলেও, মোটের উপর ভালো ছিল না। এইরূপ অসুস্থ দেহে, জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদে এতদূর আসাটা আমার মনকে লজ্জা এবং পীড়া দুই-ই দিল।

যাই হোক, যথাসময়ে দ্বিতলের বড় একটা হল-ঘরের মধ্যে সকলের উপস্থিতিতে একখানি আসনে আমি বসলাম এবং আমার সামনের আসনে শরৎচন্দ্র বসলেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অভিনন্দন দান হবে; তার কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে না। সুতরাং ধান, দূর্বা, ফুল-চন্দন, মালা ইত্যাদি কোনো বিষয়েই কোনো ত্রুটি রইল না। আসনে বসবার আগে, আমার পরিহিত জামা-কাপড় ছেড়ে, তাঁর দেওয়া গরদ পরতে হ'ল এবং গরদের উত্তরীয় গায়ে জড়াতে হ'ল। তারপর যথারীতি ধান-দূর্বাদি দিয়ে তিনি আমার অভিষেক করলেন। এই সব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার

শেষ করে তিনি যে বাণী দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করেন, সেই বাণীযুক্ত অভিনন্দন-পত্রখানির···লেখাটি শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা নয় বলেই মনে হয়, কারণ অভিনন্দন-পত্র লেখার মতো ভাষা শরৎচন্দ্রের তেমন আয়ত্ত না থাকায় কবিশেখরের ওপরই ওটা লেখার ভার পড়ে, এইরকমই শুনেছিলুম।

যাক। অভিনন্দনের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার যখন শেষ হয়ে গেল, তখন নীচের প্রশস্ত দালানে ভোজনের আয়োজন শুরু হ'ল। লম্বা দালানে সারি সারি দু'পংক্তিতে শ'খানেক পাতা পড়লো। মহা আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে প্রত্যেকে এক-একখানা পাতা অধিকার করে বসলেন। খাদ্যের আয়োজন সুন্দর, প্রচুর ও ত্রুটিশূন্য। মাছ, মাংস, পোলাও, কালিয়া, লুচি, তরকারী, দই, মিষ্টান্ন - কিছুই বাদ পড়েনি। রাধেশ ভায়া যেখানে 'ইনচার্জ', সেখানে কোনোদিনই কোনো ত্রুটি হবার কথা নয়।

শরৎচন্দ্র অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সেদিন সকলের সঙ্গে আহারে বসলেন এবং পেটভরে সব কিছুই খেলেন। তিনি দৈহিক অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করতেন না, গ্রাহ্য করতেন—মনের আনন্দকে। সবাই মিলে একসঙ্গে এই আনন্দ-ভোজনে তাঁর মতো লোক কি অংশ না নিয়ে থাকতে পারেন? ভোজনের ওজনের চেয়ে, আনন্দ কোলাহলের ওজনটাই সেদিন ছাপিয়ে উঠেছিল।

অভিনন্দনের ব্যাপারটাও চুকে গেল। আমার ভয় হয়েছিল যে, ঐ দিনের অনিয়ম-অত্যাচারে হয়তো শরৎচন্দ্রের শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিন্তু তারপর থেকে রোজই আমি তাঁর খবর নিয়ে জানতে পারতুম যে তিনি ভালোই আছেন।

'গ্রামের ভদ্রতা !' হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

একবার প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সভায় তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) বাড়িতে গিয়াছিলাম। জলখাওয়ার আয়োজন বেশ ছিল। খাওয়াইতে আমি তাঁহাকে কুণ্ঠিত দেখি নাই।

আমার বন্ধু গল্প-লেখক চারুচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, একবার তাঁহার নূতন বাড়ি পাণিত্রাসে গিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য শরৎবাবুকে দেখিতে ও প্রণাম জানাইতে।

চারুবাবু একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তখন সরকারী কাজে ঐ অঞ্চলে ঘুরিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির ভিতর হইতে একথালা গরম লুচি, বেগুনভাজা ও ছয়খানি বাতাসা আসিয়া উপস্থিত হইল।

চারুবাবু কোনো কথা বলিবার পূর্বেই শরৎবাবু তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্যভরা কণ্ঠে বলিলেন—এই বেলায় ব্রাহ্মণের বাড়ি এসে কি অভুক্তাবস্থায় যেতে পারো ভায়া ?

চারুবাবু—বেশ, বেশ, বাতাসা আবার কেন ?

শরৎবাবু—ওটা ভায়া, গ্রামের ভদ্রতা !

গুটিকয়েক গল্প বলে মানুষ শরৎচন্দ্রের মনের ছবি একটু দিতে চেষ্টা করবো। লেখককে পাওয়া যায় তাঁর রচনার মধ্যে, কিন্তু মানুষকে পাওয়া যায় তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যে। শরৎচন্দ্র বলতেন, খাঁটি মানুষ বা মেকি মানুষ চেনা যায় টাকার কষ্টিতে। অর্থাৎ, সোনা খাঁটি না মেকি জানা যায় যেমন কষ্টি-পাথরে ঘষলে, তেমনি মানুষ ভালো না মন্দ বোঝা যায় তার সঙ্গে টাকা-পয়সার লেন-দেন করলে।

শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর এমন দুঃখ ও অভাবের মধ্যে কেটেছিল যে, দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই ছিল না। এই সময় তিনি গ্রামের দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে জুটে অনেক রকম দুষ্টুমি করতেন। তার কিছু কিছু পরিচয় আমরা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পাই এবং তাঁর নিজের মুখ থেকেও অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কৈশোর কালের দরদী মন ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় কিছুটা থাকলেও পরিণত বয়সে সেই মানুষের মনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল তার কোনও বিশেষ আভাস পাওয়া যায় না। আমি তাই আজ সেই পরিণত মন মানুষ শরৎচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি গল্প বলে তাঁর মনের ছবিটি আঁকবার চেষ্টা করবো।

জীব-জন্তুর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মায়া-মমতা। যেমন তাঁর পোষা টিয়াপাখী 'বাটু' যে রেঙ্গুন প্রবাসে তাঁর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতো। তিনি অফিস যাবার সময় বাটুকে খালি বাড়ি পাহারা দেবার জন্য সিঁড়ির মুখে দাঁড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যেতেন। একদিন দুপুরে চোর এসেছিল তাঁর বাড়িতে। বাটুর চিৎকারে পাড়ার লোক অস্থির। তারা ছুটে এসে দেখে, বাটু চেন ছিঁড়ে উড়ে এসে চোরকে

আক্রমণ করে তাকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে তুলেছে। চোর কিছুই চুরি করতে পারেনি। বাটুর বিকট চিৎকারের চোটে লোকজন এসে পড়ায় চোরটা ধরা পড়ে গেল। শরৎচন্দ্র অফিস থেকে ফেরবার সময় রোজ তার জন্য কিছু-না-কিছু ফলমূল কিনে আনতেন এবং নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াতেন। চোর ধরা পড়তে বাটুর আদর আরও বেড়ে গেল। তিনি এবার বাটুর চোর ধরার পুরস্কার হিসেবে তাকে একটি সোনা-রূপোর চেন গড়িয়ে দিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, একদিন তিনি অফিস থেকে বাটুর জন্য আঙুর কিনে এনে দেখেন, বাটু সেই সোনা-রূপোর চেনটিতে কেমন করে জড়িয়ে গিয়ে, গলায় ফাঁস লেগে মরে আছে। একমাত্র আদরের ছেলের হঠাৎ অপঘাতে মৃত্যু হলে বাপ যেমন কাতর হয়ে পড়েন, শরৎচন্দ্র বাটুর শোকে তেমনিই কাতর হয়ে পড়লেন। যাই হোক, কতকটা শান্ত হবার পর তিনি মৃত বাটুকে বুকে করে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন এবং মানুষের মতোই চিতায় তার দেহের সংকার করে ভস্মাবশেষ নদীতে ফেলে দিয়ে এসে তবে প্রকৃতিস্থ হলেন।

তিনি যখন বর্মা ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে এসে হাওড়ায় বাজেশিবপুরে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে থাকতে হাওড়া জেলার পাণিত্রাস অঞ্চলে সামতাবেড় গ্রামে রূপনারায়ণ নদীর ধারে বাড়ি তৈরি করে চলে গেলেন, তখনকার একটা গল্প বলি। সামতাবেড় দরিদ্র গ্রাম। একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না সহজে। শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা যত্ন করে শিখেছিলেন দরিদ্রের সেবা করবার জন্য। গ্রামের যত চাষাভুষো দীন-দরিদ্র কুলি-মজুর সবার সঙ্গে তিনি ডেকে আলাপ করতেন। তাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন। ছেলে-মেয়ের অসুখ করেছে শুনলে চিকিৎসা করতেন। বিনামূল্যে ওষুধ দিয়ে তাদের ভালো করে তুলতেন। কিন্তু রোগীর পথ্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা দিতে পারতো না। শরৎচন্দ্র নিজব্যয়ে তাদের পথ্যেরও ব্যবস্থা করতেন। এমনি করে তিনি সারাগ্রামের 'দাদাঠাকুর' হয়ে

উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'ভেলী' ছিল রাস্তার একটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা। একদিন কি জানি কি মনে করে এই নেড়ী কুত্তার বাচ্চাটা শরৎচন্দ্রের পিছু পিছু তাঁকে অনুসরণ করে অনেকদূর পর্যন্ত যায়। শরৎচন্দ্র তার জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বেপাড়ার কুকুরগুলো পাছে তেড়ে এসে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলে, তাই কুকুর-ছানাটাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি চলতে থাকেন। বাচ্চাটা এমন করুণভাবে পুটপুট করে তাঁর মুখের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে চায় যে, শরৎচন্দ্রের তার উপর একটা মায়া পড়ে। তিনি বাচ্চাটাকে শিবপুরের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব যত্ন করে পোষেন। নাম রাখেন 'ভেলী'। এই ভেলী শরৎচন্দ্রের সন্তানতুল্য স্নেহ পেয়েছিল। কারণ শরৎচন্দ্রের ছেলে-মেয়ে ছিল না। আদর-যত্নে প্রতিপালিত ভেলী একটা কেঁদো বাঘের মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল। তার প্রতাপে শরৎচন্দ্রের বাড়ি কোনও অপরিচিত লোকের ঢোকবার উপায় ছিল না। শরৎচন্দ্রের হুকুম পেলে তবে সে অচেনা লোককে ঘরে ঢুকে বসতে দিত। একবার কর্পোরেশনের একটি কর্মচারী ট্যাক্স আদায় করতে এসে ভেলীর কাছে ভীষণ জব্দ হয়েছিলেন। ট্যাক্স নিতে কর্মচারীটি যখন আসেন শরৎচন্দ্রের হুকুমে ভেলী কিছু বলেনি তাঁকে। শরৎচন্দ্র তাঁর হাতে প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে যান স্নানাহার সারতে।

তারপর অনেক বেলায় তাঁর বৈঠকখানা-ঘরে ফিরে এসে দেখেন কর্পোরেশনের কর্মচারীটি তখনও হাতে টাকাটি নিয়ে কাতর মুখে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন, আর ভেলী তাঁকে আগলে 'গর্‌র্‌র্' শব্দ করতে করতে পাহারা দিচ্ছে। মনিবের হুকুম না পেলে তাঁকে টাকা নিয়ে ঘর থেকে এক পা-ও যেতে দেবে না। শরৎচন্দ্র তাঁর সেই শোচনীয় অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। অন্য কেউ হলে হয়তো হেসে উঠতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ভেলীকে সামলে রেখে ভদ্রলোককে যেতে দিলেন। সে ভদ্রলোক

হাঁক ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে—ছুট! ছুট! বলতে বলতে গেলেন 'বাপ্! আর এ বাড়িতে ঢুকছিনি। প্রাণটা গেছলো আর একটু হলেই।'

এই ভেলীর অসুখে শরৎচন্দ্র আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে তিন দিন তিন রাত্রি বেলগাছিয়ার ভেটার্নারী হাসপাতালে ভেলীর সেবা করেছিলেন। কিন্তু ভেলী বাঁচলো না। শরৎচন্দ্র বালকের মতো কেঁদে ফেললেন। ভেলীর মৃতদেহ সযত্নে হাসপাতাল থেকে বহন করে এনে তাঁর গৃহসংলগ্ন অঙ্গনে অশ্রুসজল নেত্রে সমাধিস্থ করলেন। সমাধির উপর একটি স্তম্ভও নির্মাণ করে দিলেন। এ হেন কুকুর-প্রিয় শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ির বাগানের এক গাছতলায় বেওয়ারিশ একটা কুকুরের তিনটি বাচ্চা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। কুকুরটা সারাটা গাঁ ঘুরে-ফিরে বেড়ালেও ঠিক সময়ে এসে ছু'তিনবার বাচ্চাদের স্তনপান করিয়ে যেতো। কিন্তু একদিন সে আর এলো না। বাচ্চাগুলো ক্ষিদের জ্বালায় পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। শরৎচন্দ্র অস্থির হয়ে পড়লেন। লোকজন ডেকে হুকুম দিলেন খুঁজে বার করো এদের মাকে। যে বার করতে পারবে দশ টাকা পুরস্কার। দশ টাকা পাবে শুনে ছুটলো চারিদিকে লোক। শরৎচন্দ্র দুধের বাটি আর তুলোর সলতে নিয়ে গাছতলায় এসে বসলেন এবং সযত্নে মায়ের মতোই বাচ্চা-গুলির মুখে দুধ দিতে লাগলেন। তারা যখন চক্ চক্ করে খেতে শুরু করলে শরৎচন্দ্র আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। দু'দিন ধরে খোঁজা-খুঁজির পর বাচ্চাগুলোর মাকে পাওয়া গেল একটা জলশূন্য কুয়োর মধ্যে, কেমন করে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের লোকেরা কুয়োর মধ্যে নেমে তাকে উদ্ধার করে যখন এনে দিলে শরৎচন্দ্র খুশী হয়ে তাদের পনরো টাকা বকশিশ দিলেন। মা-হারা বাচ্চাগুলো মা ফিরে পেতে শরৎচন্দ্রের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

শরৎচন্দ্র একদিন সকালে উঠে পথে বেরিয়ে দেখেন কসাইরা দু'টি ছাগলছানা নিয়ে চলেছে। বাজারে তাদের মাংসের দোকান আছে।

বাচ্চা দুটোকে কেটে তারা বিক্রি করবে। সেই দু'টি অবোধ ছাগ-শিশুকে অকালমৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার জন্য শরৎচন্দ্রের কোমল প্রাণ কাতর হয়ে উঠলো। তিনি কসাইদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা দিয়ে কিনেছো এবং এদের কেটে মাংস বেচে তোমাদের কত টাকা লাভ হবে? কসাইরা সেকথা জানাতে শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাদের সে টাকা দিয়ে বাচ্চা দু'টিকে কিনে বুকে করে সযত্নে বাড়ি নিয়ে এলেন। তারা শরৎচন্দ্রের গৃহে অপত্য স্নেহে পালিত হতে লাগলো। একদিন সামতাবেড়ে গিয়ে দেখি তারা আর বাচ্চা নেই। প্রকাণ্ড বড় হয়ে উঠে আশ্রম-মৃগের মতো শরৎচন্দ্রের উদ্যান-প্রাঙ্গণে যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। শরৎচন্দ্র তাদের নাম ধরে ডাকতেই তারা এক দৌড়ে তাঁর কাছে এসে হাজির। তিনি ওদের নিজের হাতে আম খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, 'তোমরা বলো এদের বোকা পাঁঠা, কিন্তু এদের মতো চালাক পশু আমি খুব কমই দেখেছি।' বুঝলাম এই ছোট জীবের প্রতি তাঁর কী অসীম স্নেহ!

বালীগঞ্জে তাঁর নূতন বাড়ি তৈরী হবার কিছুদিন পরে তিনি একখানি মোটর গাড়ি কিনেছিলেন। তাঁর ড্রাইভারের নাম ছিল কালী। কালী ছিল এক গোঁয়ারগোবিন্দ দুঁদে জোয়ান। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অমায়িক ব্যবহারে এই দুর্দান্ত কালী হয়ে উঠেছিল তাঁর একান্ত ভক্ত গোলাম। তাকে যেদিন শরৎচন্দ্র তাঁর রথের সারথিরূপে নিযুক্ত করেন সেদিন এই কথাটি বলে দিয়েছিলেন যে, আমি যতদিন বাঁচবো কালী, তোমার কোনও অভাব রাখবো না; কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি—যেদিন তুমি গাড়ি চালাতে গিয়ে পথে কোনও মানুষ কেন, একটা কুকুর, বিড়াল বা হাঁস-মুর্গীও চাপা দেবে সেইদিনই তৎক্ষণাৎ তোমার চাকরি যাবে। আমার এই কথাটা মনে রেখো।

সুতরাং বুঝতেই পারা যায় এই প্রতিভাশালী লেখক মানুষটিকে লোকে কেন দরদী শরৎচন্দ্র বলে। এই মানুষটির দরদী মনের

আরও একটু পরিচয় দিচ্ছি। একদিন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলেছি গড়িয়াহাটা বাজারের দিকে। তাঁর কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনবার দরকার ছিলো। শীতকাল। বৃষ্টির সময় নয়। কিন্তু সেদিন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। আমার ছাতা ছিলো সঙ্গে। দু'জনেই সেই ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছি। গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে আসতে একটি বৃদ্ধ ভিখারিণী আমাদের সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো। পরিধানে ছিন্নবস্ত্র। বৃষ্টিতে ভিজে লেপটে আছে গায়। শীতে বুড়ী কাঁপছিলো। শরৎচন্দ্র তার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে তাঁর মানিব্যাগ বার করে তার মধ্যে যা ছিলো সব উপুড় কার বুড়ীর হাতে ঢেলে দিলেন। আন্দাজে মনে হ'লো খুচরো পয়সা সিকি দুয়ানি টাকা ও নোটে সে নেহাৎ কম হবে না। গোটা পনরো-কুড়ি টাকা তো বটেই। আমি তো দেখে অবাক! বুড়ী ভিখারিণীও অবাক! আমার দিকে একবার এবং শরৎচন্দ্রের দিকে একবার চেয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অতগুলো টাকা নিতে সাহস হচ্ছিলো না তার। ভাবছিলো, হয়তো ভুল হয়ে গেছে কিছু। আমিও আমার বিস্ময়াভিভূত অবস্থা কেটে যাবার পর বলতে যাচ্ছিলাম শরৎদাকে—এ আপনি কী করছেন? কিন্তু, তার আগেই শরৎচন্দ্র ভিখারিণীকে বললেন, মা, এ টাকায় তোমার যে ক'দিন চলে সে ক'দিন আর ভিক্ষায় বেরিও না। একে শীত, তাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঠাণ্ডায় তুমি কাঁপছো। দেখো, আমি রোজ এদিকে বেড়াতে আসি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে আবার তুমি এসে দাঁড়িও এই মোড়ে, আমি আবার কিছু দেবো। আজ আমার সঙ্গে এর বেশি আর কিছু নেই। বুড়ী 'রাজা হও বাবা, বেঁচে থাকো, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক'—বলে ধীরে ধীরে চলে গেলো। আর আমি? আমার সমস্ত অন্তর এই দরদী মানুষটির পায়ে অসীম শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়লো।

সেদিন আর বাজার করা হ'লো না। ফিরে এলেন তিনি আমাদের

বাড়ি বসে গল্প করতে। সে কী সব বিস্ময়কর রোমাঞ্চ-সঞ্চারী চিত্তাকর্ষক গল্প! সমস্তই তাঁর জীবনের সত্য ঘটনা। আজ আক্ষেপ হয়, হায়, সেদিন যদি তাঁর গল্পগুলি লিখে রাখতুম।

কলকাতায় থাকলে আমাদের বাড়ি রোজই আসতেন প্রায় সন্ধ্যের পর আড্ডা দিতে। বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত্রি ১১টা থেকে ১২টা নাগাদ। গড়গড়ায় তামাক সেজে রাখা হ'তো তাঁর জন্য, কিন্তু চাকরের সাজা তামাক তাঁর পছন্দ হ'তো না। তিনি দু'চার টান দিয়েই বিরক্ত হয়ে সে কল্কে উপুড় করে দিয়ে নিজের হাতে তামাক সেজে নিয়ে খেতেন। কত গান কত গল্প যে করতেন তার সংখ্যা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমস্ত তাঁর মুখস্থ ছিলো। এক লাইন ধরিয়ে দিলেই সবটা গড় গড় করে আবৃত্তি করে যেতেন। কণ্ঠস্বর ছিলো খুব মিষ্টি। তাঁর কীর্তন-গানের তুলনা হয় না।

একদিন রাত্রি ১২টা নাগাদ একটি রোমাঞ্চকর মর্মস্পর্শী গল্প শেষ করে তিনি উঠলেন বাড়ি যাবার জন্যে। আমরা, অর্থাৎ আমি ও আমার স্ত্রী তাঁকে নিত্যই পণ্ডিতিয়ার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে আসতুম। সেদিন রাত্রে পণ্ডিতিয়ার মোড় বরাবর পৌঁছতেই একটি কচি শিশুর করুণ ক্রন্দন আমাদের কানে এলো। পথের পাশেই কোথাও থেকে সেই কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। কৌতূহলী হয়ে সেই শব্দ অনুসরণে একটু অগ্রসর হয়েই দেখা গেল মহানির্বাণ মঠের ধারে অন্ধকার গাছতলায় একটি কাপড়ের পুলিন্দা পড়ে রয়েছে এবং তারই ভিতর থেকে কচি শিশুর ক্রন্দন-রোল নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি সেই ন্যাকড়ার পুঁটলি খুলে দেখেন তার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুকে কারা পথে ফেলে দিয়ে গেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে লাল পিঁপড়ে থিকথিক করে ছেঁকে ধরেছে বাচ্চাটাকে। শরৎচন্দ্র বসে পড়লেন সেই পথের উপর ছেলেটির পরিচর্যা করতে। আমার স্ত্রীকে বললেন, তোমার ঘরে গরম দুধ বা মধু আর একটু তুলো যদি থাকে চট করে নিয়ে

এসো। নরেন, তুমি যাও ওর সঙ্গে। আমি ততক্ষণ ছেলেটাকে পিঁপড়ের কামড় থেকে মুক্ত করে একটু পরিচ্ছন্ন করে তুলি।

আমি বললুম, দাদা, বিপজ্জনক কাজে হাত দিচ্ছেন। কারা এই হতভাগ্য শিশুকে পথের ধারে ফেলে দিয়ে গেছে। পুলিস দেখতে পেলে এখনি আপনাকেই আসামী বলে ধরে নিয়ে যাবে।

শরৎচন্দ্র বললেন, পুলিস না এলে আমিই তাদের খবর দেবো। তোমরা সেজন্য ভেবো না। যাও, যা বললুম, করো। আর দেরি কোরো না।

আমরা তাড়াতাড়ি এসে দুধ, মধু আর তুলো সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে দেখি সদ্যোজাত শিশুর সমস্ত মালিন্য মুছে দিয়ে তাকে পিপীলিকার আক্রমণ থেকে স্নেহময়ী জননীর মতো কোলে নিয়ে পথের ধূলির উপর বসে আছেন শরৎচন্দ্র। আমরা যেতেই তিনি বাচ্চার মুখে মধু দিয়ে দুধের পলতের ব্যবস্থা করতে করতে আমায় বললেন, তুমি যাও, এখনি কোনো কাছাকাছি বাড়ি থেকে বালীগঞ্জের থানায় ফোন করে বলো তারা এসে যেন ও ছেলেটির চার্জ নেয়।

সবিনয়ে বললুম, এত রাত্রে কোনও বাড়ির দরজা খোলা পাবো না। ফোন করবো কোথা থেকে ?

শরৎচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, যাও, একটু আগে 'জলযোগ' বলে একটা খাবারের দোকান আছে। তারা অনেক রাত্রি পর্যন্ত খুলে রেখে সন্দেশ তৈরী করে। তাদের দোকান থেকে দু'আনা পয়সা দিয়ে ফোন করে এসো।

তাঁর উপদেশমতো বালীগঞ্জ থানায় ফোন করে ফিরে এলুম, তখন রাত্রি একটা বেজে গেছে। দেখলুম, শরৎচন্দ্র আমার পত্নীর সাহায্যে অতি নিপুণ ধাত্রীর মতো শিশুটিকে পলতে দিয়ে বিন্দু বিন্দু দুধ খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, ছেলের রূপ দেখো। অভিজাত ঘরের বলে সন্দেহ হচ্ছে। পুঁটলিবাঁধা কাপড়খানা বেশ দামী শাড়ি।-

আমার স্ত্রীকে বললেন, রাধা, তুমি এই খোকাটিকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করো না।

আমার স্ত্রী বললেন, বড়দা! (শরৎচন্দ্রকে উনি 'বড়দা' বলতেন) বৌদির কোলও তো শূন্য, আপনি যখন একে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছেন তখন আপনার দাবিই অগ্রগণ্য। আমার কোলে তো একটি ছেলে এসেছিলো। রইলো না বেঁচে তো কি করবো।

পুলিসের ভ্যান এসে পড়লো। সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রিপোর্টে আমাদের স্বাক্ষর নিয়ে শিশুটিকে তুলে নিয়ে চলে গেলো।

শরৎদা দেখি চোখ মুছছেন। বললুম, কি হ'লো দাদা, চোখে কিছু পড়লো নাকি?

শরৎদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, শিশুগুলো যাদু জানে। একদণ্ডে মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছিলো।

আর একটি গল্প বলেই মানুষ শরৎচন্দ্রের পরিচয় সংক্ষেপে শেষ করবো। একদিন শরৎচন্দ্র সন্ধ্যায় যথারীতি আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। আমি সেদিন বাড়ি ছিলুম না, আমার এক আত্মীয়ের বিবাহে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলুম। স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলুম ফিরতে রাত হবে। কারণ, বিবাহের লগ্ন রাত্রি ১১টার পর। বিবাহ শেষ না হলে আমার চলে আসা উচিত হবে না। সুতরাং বালীগঞ্জে আসতে হয়তো রাত্রি ১২টাও হতে পারে। একটি গাঁয়ের মেয়ে দিনরাত আমার স্ত্রীর পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত ছিলো। তার নাম তারা। আর এক পুরাতন ভৃত্য ছিল। তার নাম গুণনিধি। সেও অনুরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো বিয়ে-বাড়িতে তাদের কাজকর্মে সাহায্য করতে। শরৎদা এসে দেখেন আমার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছেন। আর সেই গেঁয়ো মেয়েটি নিরুপায় হয়ে ম্লানমুখে তাঁর কাছে বসে আছে।

শরৎচন্দ্র আমার স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে আমার উপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে তিরস্কার শুরু করেছিলেন যে, স্ত্রীর এত অসুখ দেখেও

আমি তাঁকে একলা বাড়িতে ফেলে রেখে চাকরটাকে সুদ্ধ বিয়ে-বাড়িতে নিয়ে আমোদ করতে গেছি। আমার স্ত্রী অতিকষ্টে কাতরকণ্ঠে তাঁকে জানালেন যে, আমি চলে গেছি সেই সকালে। ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসে যাবার সময় বলে গেছি অফিসের ফেরত বিয়ে-বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরবো। ফিরতে আমার রাত হবে। চাকরটা সব কাজকর্ম সেরে দিয়ে দুপুরে সেখানে গেছে। তখনও তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। রোগটা তাঁর দেখা দিয়েছে হঠাৎ বিকেলের দিকে। তারা গাঁয়ের মেয়ে, কলকাতার পথঘাট চেনে না। ডাক্তারের বাড়িও কোথায় জানে না। কাজেই এই অবস্থায় পড়ে আছি।

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ছুটলেন ডাক্তার আনতে। ডাক্তার এসে রোগিণীর অবস্থা দেখে ইনজেকশন দেওয়া প্রয়োজন বললেন। শরৎচন্দ্র ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন্ নিয়ে দৌড়লেন ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ কিনে আনতে। ইনজেকশন দেবার পর রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করেছেন দেখে ডাক্তার বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, রাত্রে যদি অসুখটা আবার বাড়ে তবে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, ওষুধের দাম, ডাক্তারের ফী সবই শরৎচন্দ্র নিজের পকেট থেকেই দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী শয্যাগত। উঠে আলমারির চাবি খুলে টাকা দেবে কে ?

আমার বাড়ি ফিরতে রাত্রি ১টা হ'লো। এসে দেখি স্ত্রীর এই অবস্থা। শরৎচন্দ্র রোগিণীর শিয়রে বসে তাঁকে বাতাস করছেন। সারাক্ষণ কোথাও নড়েননি। এক ছিলিম তামাকও পর্যন্ত খাননি। আমি লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাড়ি যেতে বলে রোগিণীর ভার নিলুম। রাত তখন প্রায় দুটো। শরৎদা বাড়ি গেলেন। আমার সারারাত জেগেই কাটলো। ভগবানের দয়ায় স্ত্রীর অসুখ আর বাড়েনি। বরং কমের দিকেই চলেছে দেখলুম।

পরদিন সকালেই শরৎদা এসে হাজির। সকালে তিনি বড়

একটা কোথাও যেতেন না। আমি তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, একি শরৎদা, এতো সকালেই এসে পড়লেন কি করে ?
শরৎদা কোনও জবাব না দিয়ে সোজা রোগিণীর ঘরে গিয়ে হাজির। হাতে তাঁর একটি ওষুধের বাক্স এবং একখানি ডাক্তারী বই। রোগিণীর অবস্থা অনেকটা ভাল দেখে খুশী হয়ে তিনি গুণনিধিকে চায়ের হুকুম দিয়ে নিজেই তামাক সাজতে বসলেন। তারাকে ডেকে বললেন, ভাতের হাঁড়িতে আমার জন্যেও একমুঠো চাল নে মা। আমি আজ তোদের এখানেই সেবা করবো। তারা ব্রাহ্মণের মেয়ে। ব্রাহ্মণ ভোজনের পুণ্যার্জনের সুযোগ পাবে জেনে পুলকিত হয়ে উঠলো।
গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে এতক্ষণে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন—আর বেলা করছো কেন—নেয়ে, খেয়ে নিয়ে অফিস চলে যাও। এটা সারা বছরের হিসাব-নিকাশের সময়। ক্লোজিংয়ের মুখে কামাই করলে ইনক্রিমেণ্ট পাবে না। ভয় নেই। আমি থাকবো সারাদিন রাধুর কাছে। রোগীর দেখাশোনার কোনো ত্রুটি হবে না। অনেক রোগীরই সেবা করেছি এ জীবনে, বুঝলে ? কলেরার রোগী, প্লেগের রোগী, বসন্তের রোগী এই হাতে অনেক ঘেঁটেছি। এ তো কিছু না। সামান্য জ্বর-জারি।
আমার দুর্ভাবনা হয়েছিলো বটে, এ সময় অফিস কামাই। শরৎদার ভরসা পেয়ে যথাসময়ে চলে গেলুম। বেলা পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখি শরৎদা ঠায় বসে রোগীর সেবা করছেন। এই মানুষটির মতো বন্ধুবৎসল ও মানবধর্মী সব দেশেই কম দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সকলেরই আপনজন—শিক্ষিত মহলের আত্মীয়, অশিক্ষিত মহলের পরমাত্মীয়। শরৎচন্দ্র যে কী ছিলেন, সে খবর উভয় মহল সমানভাবেই রাখতেন। শিক্ষিত মহলের কথা বলা বাহুল্য। অশিক্ষিত মহলের কথাটা একটু বলি। আমার বাড়ি পল্লীগ্রামে। সেখানে একটি মুদিখানার দোকান আছে। প্রত্যহই সন্ধ্যার পর উক্ত দোকানে গ্রামের দু-একজন ভদ্রলোক এসে বসেন, আর এসে জড় হয় গ্রামের যত ছোটলোক—সাঁওতাল, কোঁড়া, দুলে, বাগ্দী। আগে আগে দেখতাম, নিশুতি রাত পর্যন্ত দোকানে তাস খেলা চলতো। এখন চলে বই পড়া। দোকানের মালিক একজন চলনসই শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাঁকে আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি—গ্রামের তিনি মাতব্বর বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর একটি বিশেষ শখ হচ্ছে নভেল-নাটক কেনা, বিশেষ করে সস্তা দামের গ্রন্থাবলী। পল্লীর হাটবারে পাঁচুই-মদের দোকানে যেমন সাঁওতাল-কোঁড়ারা ঢুকে অঙ্গনের গাছতলায় জড় হয়, তেমনি গ্রামের নিরক্ষরদলও বই শোনবার লোভে এই দোকানে জড় হয় প্রতি সন্ধ্যায়। পাঠ করা হয় ডি. এল. রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দামোদর গ্রন্থাবলী, ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী, আরও কত কি! এই বইগুলি কতবার যে পড়া হয়েছে এবং কত যে ওদের ভাল লেগেছে তার আর ঠিক নেই। অপেক্ষাকৃত বেশী দাম বলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কেনা হয়নি। কিন্তু 'কাল' হলাম আমি। দোকানের মালিককে বলে-বলে এক সেট শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কেনালাম। তারপর থেকে, এই দাঁড়ালো যে, আগেকার বইগুলি আলমারিতে উঠলো জন্মের মতো। এমনই সকলের রুচি ফিরে গেলো যে, শরৎচন্দ্রের বই ছাড়া যেন অন্য কোনও পুস্তকের

কাহিনী তাদের মনে আর সহ্যই হবে না। আমি একদিন বাড়ি গেছি, এক বন্ধুর একখানি উপহৃত উপন্যাস নিয়ে। বইখানি আমার হাতে দেখেই দোকানে স্থির হ'লো সেই বইখানিই পড়া হবে সেদিন। তারপর যখন 'রামচন্দ্রের সভা' বসলো, একজন সাঁওতাল বলে উঠলো "ও কি শরৎ চাটুয্যের বই!" পাঠক বললেন, "না রে, এ একখানা খুব ভাল বই!" সাঁওতাল প্রভুর মুখের ওপর বলে উঠলো, "রেখে দাও ঠাকুর, তোমার ভাল বই। শরৎ চাটুয্যের বই হয় তো পড়ো', নইলে যাই, গিয়ে হিরু রোজার কাছে সাপের মন্তর শিখিগে!" আমি তখন উপস্থিত ছিলাম, চোখে আমার জল এলো। ভাবলাম, অপরাজেয় কথাশিল্পী আজ এই নিভৃত পল্লীর উপহৃত যে পুরস্কার পেলেন সে পুরস্কার বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য। ঠিক এমনিতরই শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের প্রত্যেক নর-নারীর অন্তর জয় করেছেন! তাই, আবার প্রশ্ন করি—কেন?

এই 'কেন'র উত্তর ভারতের বাতাসে বাতাসে ভরে আছে—'শরৎচন্দ্র অসাধারণ দরদী লেখক'। শরৎচন্দ্রের 'অর্থ' যত প্রকার বার হয়েছে, মোটের ওপর তা এই একই, কিন্তু অর্থের মূল কি, তাই আমি আজ বলবো। সর্বাগ্রে তাঁর একখানি চিঠি পড়ে শোনাই—

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোস্ট,
জেলা হাওড়া।

পরম কল্যাণীয়েষু,

চরণ, অত করে পরিচয় না দিলেও চিনতে পারতাম। আমার স্মরণশক্তি আজও ছেলেবেলাকার মতই আছে। চিঠির জবাব না দেওয়াটাই যেন আমার স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাই কত আত্মীয় বন্ধুই না পর হয়ে গেল! কেমন আছো?

আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—৩রা কার্তিক '৩৬।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩৩৬ সালে পূজার পর বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে শরৎদাকে আমি পত্র দিই। সেই পত্রে নিশ্চয়ই আমি পূর্বেকার পরিচয় একটু দিয়েছিলাম, কারণ তিনি 'মথুরার রাজা' আর আমি বৃন্দাবনের এক 'গোপ-বালক'—পাছে চিনতে না পারেন। কিন্তু, জবাবটা যা এলো তা আমার মুখের মতোই। এর পর যখন উনি কলকাতায় এলেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার, মেলা-মেশা করবার সুযোগ এলো ঠিক দু'হাত বাড়িয়ে। তারপর যখন 'রবি-বাসরের' সদস্য হলেন, তখন হলেন উনি ঘরের লোক। দেশ-বিশ্রুত, দেশ-দুর্লভ শরৎচন্দ্র আর আমার কাছে রইলেন না, কারণ পনরো দিন অন্তর তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগলো, নিবিড় আত্মীয়তায় পরস্পর পরস্পরের কাছে লীন হয়ে গেলাম। তারপর তাঁর শেষ-দিন পর্যন্ত এ আত্মীয়তা নিষ্প্রভ হয়নি। কেন? আমার মতো একজন ক্ষুদ্র লোকের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেবোপম এক বিরাট পুরুষের সঙ্গে সম্ভব হ'লো কিসের জোরে?—দারিদ্র্যের জোরে। শরৎচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র-খাঁটি, শাশ্বত। আমিও তাই। শরৎচন্দ্রের কাছে পৌঁছবার পথ ছিলো আমার নিজস্ব। দরিদ্র আমি, দারিদ্র্যের সেই চিরন্তন অবহেলিত পথটি বয়ে আমি তাঁর কাছে যেতাম দারিদ্র্যের আভিজাত্য নিয়ে। আমি মনেপ্রাণে অনুভব করেছি, ইহ-জীবনে শরৎচন্দ্রের গর্ব করবার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিলো দারিদ্র্যের অনুভূতি—সাহিত্যের রাজমুকুট নয়। তাই তাঁর অন্তরাত্মা ভালবাসতো যে দরিদ্র অবস্থা-শঙ্কিত—তাকে। তারই মাঝে নিজেকে মিশিয়ে, ডুবিয়ে, চুবিয়ে রেখে পেতেন তিনি পরম সান্ত্বনা। তাই তিনি আজ দরদী চিন্ময়। তাই পার্থিব যশ, খ্যাতি বা অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুমেরু পর্বতে উঠেও তাঁর আসল, সত্য, মৃত্যুহীন মানুষটিকে একদিনও বিস্মৃত হননি। একদিনও না। ঐশ্বর্যের মহলে যখনই তাঁকে দেখেছি তখনই স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি, তিনি সেখানে কত না বিব্রত, কত না আনাড়ী। তাঁর নবনির্মিত কলকাতার বাড়িতে যতবার তাঁকে দেখেছি

ততবারই লক্ষ্য করেছি —ও বাড়িখানা যেন তাঁর নয়, যেন বা কোনো দৈব-দুর্বিপাকে হঠাৎ সে তাঁর নিমিত্তের ভাগী করে কবে কোনদিন রাতারাতি গড়ে উঠেছে—সে অপরাধ তাঁর নয়। কয়েকদিন অবস্থার বিপর্যয়ে ধনীর ঐশ্বর্য তিনি ভোগ করেছিলেন বটে, কিন্তু আকণ্ঠ উপভোগ করে গেছেন দারিদ্র্যের এক অপূর্ব অনুভূতিকে!

আমি শরৎবাবুকে ইংরেজি ১৯০৮ সাল হতেই জানতাম, এমন কি, এক বাড়িতেও বাস করেছি। আমি ছিলাম তাঁর দোহার, যদিও তিনি কীর্তনের পদাবলী ও সুর যোজনা করতে পারতেন, কিন্তু গাইতে চাইতেন না। যেদিনই তিনি সংকীর্তনের খবর পেতেন, এমন কি, চিঠিও পেতেন, তিনি ডাকতেন—ওহে সুরেন, শীঘ্রই তৈরী হও, সংকীর্তনে যেতে হবে, চিঠি এসেছে।

নিজের ঘরেও কীর্তন বাদ যেতো না। আমাদের দস্তুরমতো একটা সংকীর্তনের দলও ছিলো। দোল, চাঁচর ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার উৎসব শরৎবাবুর কাছে কিছুই বাদ যেতো না। এই প্রকারে পাঁচ-সাত বছর চলাফেরার পর রেঙ্গুনে বর্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা হতে আমার চাকরি গেলো। আমি পড়ে গেলুম বিপদে। আমার দু-চারজন বন্ধু তখন বর্মায় গোল্ড মাইন-এ চাকরি করছিলো। ক্রমান্বয়ে চিঠিপত্রের চালাচালিতে, হঠাৎ এক বন্ধুর চিঠি পাওয়া গেলো, 'নামটু গোল্ড মাইন'-এ গেলে চাকরি হতে পারে।

দু-চারদিন পরে শরৎবাবু খবর পেলেন। তিনি বললেন—তুমি নামটুতে চলে যাও, এখানে তোমার কোনো সুবিধা হবে না।

তখন আমি কপর্দকহীন। এমন কি, বেণীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আমার কাছে একশ' টাকা পেতেন।

আবার দু-চারদিন পরে শরৎবাবু বললেন—কি হে সুরেন, তোমার নামটু যাবার কি হ'লো?

আমি আর গোপন করতে না পেরে বললাম—দাদাঠাকুর, যাই কি করে? একটা পয়সা নেই, দাদাঠাকুরের হোটেলে খোরাকির টাকা বাকি, আবার বেণীবাবু পাবেন একশ' টাকা।

শরৎবাবু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আর কোনো কথা বললেন না। পরদিবস আমাকে ডেকে বললেন—সুরেন, এদিকে এসো।

আমি তখন সামনে যেতে বললেন—রেঙ্গুন হতে নামটু যাবার রাস্তা জানো? প্রথমতঃ ম্যাণ্ডেলের মেল গাড়িতে উঠে তোমাকে ম্যাণ্ডেলে নামতে হবে। উঠতে হবে লাসিওর গাড়িতে। লাসিও যেতে পথে পাবে নামিও স্টেশন। সেই স্টেশনে নেমে রাত্রে স্টেশনে থাকতে হবে। পরদিন সকালবেলা পাবে মাইন-এর গাড়ি। যদিও প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে না বটে, তবুও তোমার বন্ধুর চিঠি দেখালেই তোমাকে নিয়ে যাবে। খরচ পড়বে প্রায় গাড়িভাড়া সহ পনরো টাকার মতন। টাকাটা আমি দিচ্ছি, তুমি আর দেরি না করে দু-একদিনের মধ্যে বের হয়ে পড়ো।

আমি বেণীবাবুর টাকাটার কথা বলতেই তিনি বললেন—সে টাকার বিষয় তোমাকে ভাবতে হবে না। তার জবাব আমি দেবো। যাচ্ছ শীতের দিনে, সেখানে শীত খুব বেশী। জামা-কাপড় দরকার হলে আমাকে চিঠি দিও। দেখি কাল ক'টায় ট্রেন ছাড়ে।

পরদিবস সকালবেলাই শরৎবাবু বই দেখে আমায় বলে দিলেন। এমন কি, যাবার খরচের টাকাটাও আমার হাতে দিলেন।

আমি আর কোনো কথা না বলে সেদিনই দুটোর গাড়িতে নামটু চলে গেলাম। আজও সেই মহাত্মার কৃপায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে কাল-যাপন করছি।

শরৎবাবুকে আমরা শুধু বন্ধুভাবে দেখিনি। আমরা যেমন দেখেছি, একদিকে বন্ধু অপরদিকে আত্মীয়, তিনি একদিকে ছিলেন পরোপকারী অপরদিকে ছিলেন দেবতা।

আমি [শরৎচন্দ্রকে] বলিলাম—একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, দাদা ?

—কি, বলো ?

—অনেক লোক আপনার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলে, সব দিকেই আপনি কি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন ?

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—তোমার কি মনে হয় ?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কেন ?

—কারণটা ঠিক বলতে পারবো না, মন বিশ্বাস করতে চায় না।

—আমি বলি, কারণটা আমায় ভালবাসো বলে তোমার মনের আদর্শ থেকে আমায় খাটো করে দেখতে ইচ্ছে হয় না তোমার। কিন্তু কোন সাহসে তুমি আমায় এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে ? এমনও তো হতে পারে যে, আমার সম্বন্ধে লোকের যা কিছু ধারণা, সব সত্যি। আমার মুখের স্বীকারোক্তি শুনলে তোমার কিছু শাস্তি হবে কি ?

—না। কিন্তু আমার মন বলে, সবই মিথ্যা। লোকে ঠিক কথা জানে না বলেই বলে।

দাদা চুপ করিয়া রহিলেন। কতকক্ষণ বাদে বলিলেন—দেখো হরিদাস, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি—তার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। অন্যে এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে কোনো জবাবই পেতো না, তার কারণ সাধারণ লোকের ধারণায় কি আসে যায় ? আর সে ধারণা কতদিনের জন্যেই বা ? একদিন আমি থাকবো না, তারাও থাকবে না, লোকে হয়তো আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ই জানতে চাইবে না। তখনও যদি আমার কোনো লেখা বেঁচে থাকে, তা নিয়েই আমার বিচার

করবে তারা, আমার চরিত্র নিয়ে নয়। তবুও তোমার জানতে ইচ্ছা হয়েছে, জানাবো। বাস্তবিকই তাদের ধারণা মিথ্যা। অর্থাৎ নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনোকালে উচ্ছৃঙ্খল ছিলো না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পারো, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয়নি। তার কারণ এ নয় যে, আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারিনে, তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠেনি কখনও। আরও কিছু—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।

প্রশ্ন করিলাম—আর কিছু, কি?

—বিশ্বকবির গানটা তোমার মনে আছে কি?

কখনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ স্মরি সরমেতে হই সারা।

প্রশ্ন করিলাম—তার মানে?

—তার মানেও শুনতে চাও? আচ্ছা শোন। প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিষ্ফল হ'লো, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সে এসে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। সশরীরে যে নয়, সে তোমায় বোঝাতে হবে না বোধহয়।

—না। তারপর?

—তারপর—তার পরিচয় চাও তো? না, তা দেব না। আজ শুধু আর একটি কথা তোমার বলবো—এসব কথা নিয়ে তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করতে যেয়ো না—এইটিই আমার আদেশ রইলো তোমার উপর।

এমন লোক থাকা অসম্ভব নয় যিনি মনে করিবেন আমি

গল্প লিখিতেছি। তাঁহাদের বলিতে চাই যে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে-- তা তাঁর প্রশংসারই হউক, নিন্দারই হউক—আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতাম না। তত্ত্বান্বেষীগণকে একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল ছিলো সর্বদা জাগ্রত। নারীর কলঙ্ক সম্বন্ধে তিনি সাধারণতঃ বিশ্বাস করিতেন না। এবং তাদের ভুলের জন্য সর্বদাই তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেন।

সেদিন সকালে আমাদের দেশপ্রিয় পার্কে বেড়াতে যাবার কথা ছিলো। উদ্দেশ্যটা হাওয়া-খাওয়া নয়। পার্কের বাগানে যেসব সীজন-ফ্লাওয়ারের গাছ দেওয়া হয়েছিলো সেগুলি কি কি এবং কেমন ক'রে কোথায় সাজানো হ'য়েছে তাই দেখার জন্যে শরৎচন্দ্র অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন, আমার কাছে গল্প শুনে শুনে।

বললাম, তা দু'জনে ন'টা-দশটার সময়ে গেলে হয় না? তোমার ত সকালে ওঠার অভ্যেস নেই!

শরৎচন্দ্র বললেন, আমিও যাব, সকালেই যাব। বেলা হ'লে লোকের ভিড় হবে পার্কে, বিশেষ করে একদল লোক আছে যারা নিত্য ছুটোছুটি করে ওখানে গিয়ে কেবল ক্ষিদে করার মতলবে। ও আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। তুমি সকালেই আমাকে ডেকো।

তখন সামতা থেকে ছেলেমেয়েরা আসেনি। দু'জনে বিরাজ করছি বালীগঞ্জের বাড়িতে অখণ্ড প্রতাপে। সময়ে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে তাঁইস্ তম্বি করার গার্জেনটি—(অর্থাৎ বড়মা) আছেন সামতায়। কুড়েমির থির-বিথার জলে তনু ভাসিয়ে দিন গোঙাচ্চি, নিয়ম ভঙ্গ ক'রে—বিরাট মনের আনন্দে!

সকালে উঠে দেখি শরৎচন্দ্র যেন বিছানায় পড়ে চিরনিদ্রার পাঁয়তারা ভাঁজচেন। বার-দুই ডাক দিলাম, সাড়া নেই, শব্দ নেই। মনে হলো সবেমাত্র চোখ বুজেছেন, সারারাত যন্ত্রণার ছট্‌ফটানির পর। আর ডাকতে মায়া হলো; ছেড়ে দিয়ে, ফিরে নিজের কাজে মন দিয়েছি কি—একেবারে প্রস্তুত, স্টকিং এঁটে!

বললেন গুড্ মর্নিং, কৈ আমাকে ডাকোনি?

না ডাকলে, উঠলে কেমন ক'রে, এতো সকালে?

ডেকেছিলে তুমি? তাই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো।...চা খেয়েছ?

হুঁ, সে অনেক আগেই।

বাঃ, তবে আমায় দিচ্চে না কেন? ওরে ও জীবন···তীক্ষ্ণ গলা, রেলগাড়ির হুইশিলের মত উঠলো ঝঙ্কার দিয়ে—সেই নির্জন ঘরে—তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি চাকরদের কাছে পৌছতে না পৌঁছতে জীবন তার মোটা গলায় ইষ্টিমারের ভেঁ-বাঁশীর মত আওয়াজ দিয়ে বললে, যাই বাবু···অবিলম্বে গড়াগড়া হাতে জীবনের প্রবেশ—সুদীর্ঘ নল সমেত।

শরৎ তাড়া দিয়ে বললেন, কৈ রে, চা, চা দে না!

এই দিচ্ছি বাবু—বলে, সে অচিরে ঊর্ধ্ব-পুচ্ছ হ'য়ে গেলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে সকালের মিঠে হাওয়ায় ছুঁয়নেই হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। শরৎ বললেন, ভোরে উঠে এবার সকালে বেড়ানোটা নিয়মিত করতে হবে।

কেন, ক্ষিদে করার জন্যে?

শরৎ হাসলেন, বললেন, ওটা কিন্তু অপরিহার্য এবং অন্যতম কারণ—অবশ্য ওদের পক্ষে। ফুলের ধারও ধারে না ওরা।

আমাদের পক্ষেই বা নয় কেন?

যেহেতু, দিনে রাতে আহারের চিন্তাটা আমাদের নেই বলে।

চলো না, শুনবে ওদের ইলিস মাছের ঝোলের গল্প।

ওটা দেহরক্ষার, অবচেতনায় নিহিত গাঢ় বা গূঢ় ভাবনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র···

শরৎ উদাসভাবে বললেন, ঐটেই কোনোদিন করলুম না।

কথাটা এমন একটা জায়গায় এসে বেধে গেলো যে, আর ওদিক দিয়ে চলা যায় না। তাই মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্যেই বোধহয় বললাম, শ্রীঅরবিন্দ এই দেহকে যে স্থান দিলেন এই ভারতবর্ষের দর্শনের চিন্তাধারায়—তা অপূর্ব!

কি-ই সে?

তাঁর মন্দার বইখানা পড়েছো?

না তো।

একখানা কিনে আনা যাবে।

আর আমার পড়ার মনও নেই, সময়ও নেই।

পড়ে তোমায় বলবো।

শরৎ উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

পার্কে পৌঁছে দেখা গেল সেই ক্ষিদে-করার দল প্রাকালে পৌঁছে দ্রুত পরিক্রমা শুরু করে দিয়েছেন।

একটা চক্কর দিয়ে শরৎ বললেন, চলো ফুলের গাছগুলো দেখিগে। আমরা ঘেরার মধ্যে ঢুকে পড়ে—একটি একটি করে গাছ পরীক্ষা করছি ; এটার কি নাম ?

ভার্বিনা।

এটার ছোট ছোট ফুল হয় নিশ্চয় ; দেখচো না একসঙ্গে অনেক-গুলো গাছ। শুধু চিনলে হবে না ; তাদের কেমন করে লাগাতে হবে, তাও শিখতে হবে। বুঝেছো, এ বছর শিখচি ; আসছে বছর আমি শেখাবো লোককে।

হেসে বললুম, একেই বলে গুরু-মারা বিদ্যে !

ক'টা বাজল সুরেন ?

কেন ?

একবার সট্টনদের বাড়ি যাব। কিছু বীজ কিনে আনতে হবে।

বীজ কেনার পক্ষে দেরি হয়ে গেছে, এ বছর।

তবুও, কিছু কিছু কিনব। আর একটা ভাল বই কিনে আনতে হবে। চলো, এতক্ষণে কালী এসেছে, দশটার পর আজ যেতেই হবে।

বাড়ি ফিরে দেখি বৈঠকখানাঘরে প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারের চেটাল হাতলের উপর চিঠিপত্র আর 'বিচিত্রা' সে মাসের রয়েছে।

সট্টনদের বাড়ীতে গিয়ে কেনা হলো একটা দশটাকা দামের সবজি, ফল-ফুল লাগাবার বই—আর কিছু কিছু বীজ। ওদের ছবিওয়ালা বড় ক্যাট্‌লগ্‌ নিয়ে শরৎ নিবিষ্টচিত্তে গাড়িতে পড়তে লেগে গেলেন।

বাড়ি ফেরার মুখে বললেন, একদিন যেতে হবে বৈঠকখানা বাজারের হাটের দিন। কালী, জানো কবে, কখন হাট বসে ?

জানো না ? আচ্ছা খবর নিও তো।

বাড়িতে এসে বইটা পড়া শুরু হলো। আমি দিলাম 'বিচিত্রায়' মন।

অনেক বেলা হয়েছে, বললাম, তোমার পরিজ তৈরী হয়েছে, খাবে ?

তুমি খেয়ে এসো, তারপর।

আমার অফ্‌ডে আজ। সব বন্ধ, শরীর ভাল বলছে না।

আমার উপর একটা সারগর্ভ সার্মান্‌ হয়ে গেলো সেই অবসরে। শুনে মুখ টিপে হাসচি দেখে শরৎ বললেন—

হাসছো যে ?

ডক্টর, হীল্‌ দাই-শেলফ্‌।

আই অ্যাম বীয়ণ্ড অল হিউম্যান্‌ এড্‌ ; কিন্তু তুমি সাবধান।

বিকেলে জীবন এলো চা দিতে। শরৎ বললেন, মামাকে লুচি ভেজে দিতে বলো ঠাকুরকে—সমস্ত দিন না খেয়ে আছেন।

এখন না, শরৎ—যা-কিছু খাব সেই রাতে

খালিপেটে চা ?···ওরে, তবে বিস্কুট এনে দে—বাক্সটাই নিয়ে আয় বিস্কুটের—আমাকে একটা ছোট্ট কাপে দে বুঝেচিস্‌ ?

আলো জেলে শরৎ মন দিলেন ফুলের তথ্যসংগ্রহের গবেষণায় আর আমি পড়ি 'বিচিত্রা'।

পায়ের শব্দ শুনতে পাইনি। শরতের আহ্বান শুনে ফিরে দেখি বীজুবাবু এসেছেন।

হেসে বললেন বীজুবাবু, আপনারা ঘোরতরভাবে যে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেছেন !

চেয়ারের উপর হেলে পড়ে শরৎ বললেন, কি করি আর বীজু, ফুলের নাম মুখস্থ করছি।

আমার দিকে ফিরে বীজুবাবু বললেন, আর আপনি ?

উত্তর দেবার আগেই শরৎ বললেন, সমস্ত দিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই—গো-গ্রাসে গিলছেন মামা আমার 'বিচিত্রা'। এত কি পড় হে ?

মুখরোচক ঝগড়া।

কিসের ? এতক্ষণ বলোনি !

গানের সুর আব কথার।

এতও পারে উপীন—মণ্টু নেই ?

আছে বৈকি !

রবিবাবু ?

আছেন বৈকি !

মহা-তার্কিক দুজনেই, ওঁকে মেরেছে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে। ওদের সাহসও তেমনি। ওঁর কথার আবার প্রতিবাদ ! দেখো না, ওঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করিনে আমি, আজকাল। গানের সুর আর কথার জানিস কি তোরা !

না জানলেই তর্কটা করা যায় ভাল।

তা ঠিক। বলে, একরাশ ধোঁয়া বার করে শরৎ যেন ঝিমিয়ে গেলেন।

এই অবসরে শান্ত-শিষ্ট ছেলেটির মত উপীন ঘরে ঢুকলেন।

কেমন আছো, শরৎ ?

আমি তো যা থাকার আছি, কিন্তু তোমরা এসব কি করতে লাগলে কবির সঙ্গে—নাবালকের দল ?

বাঃ, আমাদের দোষ কোনখানে, শুনি ? ওঁর মত দিয়েই তো ওঁর মনের খণ্ডন করছি।

পাঁশ করছো। তোমরা গানের জানো কি, শুনি ! আজীবন যিনি করলেন গানের চর্চা, যাঁর গানের নেই তুলনা, এই সারা পৃথিবী জুড়ে—তাঁর সঙ্গে···ভারি অন্যায়, এ কী তোমাদের ?···বাস্তবিক !

শোনো, শোনো, ওঁর মতের কোনটা ঠিক? তোমার মতে আগেরটা না পরেরটা?

দুটোই ঠিক। বলে শরৎ তামাক খেতে লাগলেন।

আমরা হেসে উঠলাম।

শরৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, এক বয়সে আমিও করেছিলাম বাচালতা ওঁর সঙ্গে; এখন ভাল করে বুঝেছি যে সেটা শুধু অন্যায় হয়নি, ধৃষ্টতাও হয়েছিলো।...গান সম্বন্ধে মণ্টু নিশ্চয় কিছু জানেন, তুমিও জানতে পারো; কিন্তু এসব জানা, তাঁর জানার সঙ্গে তুলনা হয়? ওস্তাদি গান উনি শোনেননি, না জানেন না! আজীবন আছেন এ নিয়ে উনি! আচ্ছা পড়তো সুরেন, শুনি, রবিবাবু কি বলচেন।

পড়ে গেলুম:

সুরের মহলে কথাকে ভদ্র আসন দিলে তাতে সঙ্গীতের খর্বতা ঘটে কি না এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলচে। বিচারকালে সম্পাদক বলছেন, আসামীর বক্তব্য শোনা উচিত। সঙ্গীতের বড়ো আদালতে আসামী শ্রেণীতে আমার নাম উঠেছে অনেকদিন থেকে। আত্মপক্ষে আমার যা বলার সংক্ষেপে বলব।

আমার শক্তি ক্ষীণ, সময় অল্প, বিদ্যাও বেশী নেই। আমি যে-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি সে বিশেষভাবে সঙ্গীত-শাস্ত্রও নয় কাব্য-শাস্ত্রও নয়, তাকে বলে ললিতকলা-শাস্ত্র, সঙ্গীত ও কাব্য দুই তার অন্তর্গত। কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন বাক্য ও অর্থ একত্রে সংপৃক্ত। কিন্তু যে বাক্য কাব্যের উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ করে দিয়ে তবে নিজের কাজ চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনীয়কে নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে। কথাকে পদে পদে আড় করে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের জাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের ধর্ম লাভ করে। তখন সে হয় সঙ্গীতের সমজাতীয়।

এই সঙ্গীত-রস-প্রধান কাব্যকে ইংরেজীতে বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাইবার যোগ্য বলে স্বীকার করে। একদা এই জাতীয়

কবিতা সুরেই সম্পূর্ণতা লাভ করতো। কবিতার এই সম্পূর্ণ রূপ সেদিন গান বলেই গণ্য হোতো, বৈদিককালে যেমন সাম গান। সুরসম্মিলিত কাব্যের যুগলরূপের সঙ্গে সঙ্গেই সুরহীন কাব্যের স্বতন্ত্র রূপ অনেকদিন থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে, যন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্র্যও ক্রমে উদ্ভাবিত হোলো। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এদের যে বিশেষ পরিচয় উন্মুক্ত হয়েছে সেটা মূল্যবান, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই তাদের পরস্পরের সঙ্গে ঠেকাবার জন্যে জেনেনা রীতি চালাতেই হবে, এমন গোঁড়ামি মানতে পারবো না।

শুনেছি চরক সংহিতায় বলেছে, তাকেই বলে ভেষজ যাতে আরোগ্য হয়। যারা চিরকাল একমাত্র অ্যালোপাথি চিকিৎসায় আসক্ত, তাদের মতে তাকেই বলে ভেষজ যা অ্যালোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার ফর্দ-ভুক্ত। বৈদ্যশাস্ত্র মতে বড়ি খেয়ে যে লোকটা বলে আরাম পেলুম তাকে ওরা অশাস্ত্রীয় গ্রাম্য বলেই ধরে নেয়। তারা বলে ডাক্তারী মতেই আরাম হওয়া উচিত, অন্য মতে কদাচ নয়।

সাঙ্গীতিক চরক সংহিতার মতে তাকেই বলে সঙ্গীত যার থেকে গীতরস পাওয়া যায়। কিন্তু ওস্তাদের সাক্রেদ্‌রা বলে সেটাই সঙ্গীত যেটা গাওয়া হয় হিন্দুস্থানী কায়দায়। ঐ কায়দার বাইরে যে গীতকলা পা ফেলে তাকে ওরা বলে স্বৈরিণী, সাধু সমাজের সে বা'র। সমজদারের খাতায় যারা নাম রাখতে চায় অন্য শ্রেণীর গানে রস পাওয়াই তাদের পরে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আমরা চরক সংহিতার সঙ্গে মিলিয়ে বলব, গানের রস যেখানেই পাই সেখানেই সঙ্গীত, কথার সঙ্গে তার বিশেষ মৈত্রী থাক বা না থাক। ভালো কারিগরের হাতে শিল্পিত প্রদীপের মুখে শিখা জ্বলে উঠে উৎসবসভা আলোকিত করলো; সেই শিখার আলোককে আলোই বলবো সেই সঙ্গেই গুণীর হাতে গড়া প্রদীপটাকে বাহবা দিলে দোষের হয় না। বস্তুত প্রদীপটা আলোককেই সম্মান দিয়েছে, আর ঐ প্রদীপের মুখ উজ্জ্বল করেছে আলোক। যাঁরা এরকম সম্মানের ভাগাভাগিকে সঙ্গীতের জাতি নাশ

বলে রাগ করেন তাঁরা জ্বালুন না মশাল, তার বাহনটা নগণ্য হোক তবুও তার আলোর গৌরব মানতে দ্বিধা করবো না।

"কারি কারি কমরিয়া গুরুজী মোকে মোল দে"—

অর্থাৎ কালো কালো, কম্বল গুরুজী আমাকে কিনে দে। এটা হল মোটা মশাল, এবং চূড়ার উপরে জ্বলছে পরজ রাগিণীর আলো, মশালটার কথা মনেও থাকে না। কিন্তু কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন করে তোলে তাহলে কোনদিক থেকে মূল্যেব কিছু হ্রাস হতে পারে বলে তো মনে করিনে।

শরৎ বললেন বুঝেছি আর পড়তে হবে না।

উপীনের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের আপত্তি বাংলা গানের কথা-বাহুল্যে—নয় কি ?

উপীন বললেন, সেই বাহুল্যে হয় সঙ্গীত শৃঙ্খলিত, সেখানে তার স্বরূপে প্রকাশ পাওয়ার বাধাটা মারাত্মক।

কিন্তু উপীন, তোমরা ভুলে যাচ্ছ যে, বাংলা গানের কথাটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই ; ওটা কবির কথায় শিল্পীত প্রদীপের মুখে শিখা। সঙ্গীতের ওস্তাদেরা কথাকে আমল না দিয়ে সুরকে বড় করেন—এই তো ? কিন্তু কথা তো বাদ দিতে পারেন না। তোমরা যদি কথা বাদ দিয়ে তেলেনা গাও, দেখবে শ্রোতার সম্পূর্ণ অভাব হয়েছে। ওস্তাদী গানের চরম উদ্দেশ্য হতে পারে সুর, কথা নয় ; কিন্তু সেখানেও মুশকিল দাঁড়ায় সুরের কুস্তি নিয়ে। সেটা করা শক্ত হতে পারে ; কিন্তু সেখানেও সঙ্গীত শৃঙ্খলিত।

একটু চুপ করে থেকে শরৎ বললেন, বাংলা গানের নিজের বিশেষত্ব আছে—সেটাকে আমি বলব নিজের প্রতিভা। আধুনিক বাংলা গানের আলোচনা করতে বসে তোমাদের বাংলা গানের অতীতটা বাদ দিলে বিচার হয় না, হয় গা-জুরি। বাংলার কীর্তন গান বাদ দিলে বাঙালীর থাকে কি ?

সুর আর কথার আদর্শ সাহচর্যর কথাই রবিবাবু বলেচেন। তোমাদের বয়স হলে বুঝতে পারবে। এখন পারচো না - তাই তর্ক করছো।

আজ থাক, আমি বড় পরিশ্রান্ত।

চেয়ারের উপর শুয়ে পড়ে শরৎ চুপ করে রইলেন। তিনি কম আলো ভালবাসতেন না, তাই জ্বলছিলো চার জোড়া আলো দেয়ালের গায়ে আর একটা মাঝখানে। মশার জন্যে ধুনো-গুগ্‌গুলের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতায় মনে হলো বার বার :

মিউজিক্ ইজ সুইট বাট্ সাইলেন্স ইজ গোল্‌ডেন।

চোখ বুজেই শরৎ বললেন, চলো সুরেন, বেরিয়ে আসা যাক্— যাবে ?

যাব।

গাড়ি তৈরী ছিলো। বীজুবাবু বিদায় নিলেন। উপীন ভায়াকে সঙ্গে যেতে আহ্বান করলেন।

কোথায় যাবে তুমি উপীন ?

চড়ক্‌ডাঙ্গা পর্যন্ত—শ্যামরতনের সঙ্গে—

তুমি কাজের মানুষ, অনেক কাজ হাতে করেই···

না, তা ঠিক নয়—এদিকে এসেছি, ঘুরে যাই একবার।

নেমে যাবার সময় উপীনকে বললেন শরৎ, মাঝে মাঝে এসো, একেবারে ভুলে থেকো না।

উত্তরে উপীন বললেন, তুমি দেশে ছিলে—তখনও চারবার এসেছি, খবর নিয়ে গিয়েছি।

কোথায় চলেছি জানো ?

না।

ফুল চিনতে, মার্কেটে। চেনা না হলে ঘুম হবে না।

একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে শরৎ জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ফুল ?

মনে হয় এক পাটি ডেলিয়া।

জিজ্ঞেস করে জানা গেলো সেগুলো মোটেই ডেলিয়া নয়; কস্‌মস্‌।

ভুল হয় কেন?

অত বড় কস্‌মস্‌ এর আগে কখনও দেখিনি বলে।

ওর চারা সংগ্রহ করতে হবে।

বললাম : চারা গ্লোব নার্স'রিতে পাওয়া যাবে।

চাটুজ্যেদের স্টল থেকে একটি সুশ্রী যুবক এসে বললেন, আপনি আমাদের স্টলটা দেখুন—

কোথায়?

এই যে—

বাঃ, আপনার কলেক্‌শন চমৎকার!

একটা প্রকাণ্ড গোলাপের তোড়া এনে ভদ্রলোক বললেন, এটা আপনাকে দিতে চাই।

কেন? আপনারা কি ফুল বিতরণ করেন?

নাঃ, সম্মানিত ব্যক্তিকে ফুল দিয়ে আনন্দ পাই আমরা।

কে সে হতভাগ্য?

আমাদের সৌভাগ্য যে শরৎচন্দ্র পায়ের ধুলো দিয়ে গেলেন।

আমায় কি করে চিনলেন?

বাঃ, বাংলায় কে আপনাকে না চেনে!

ভালো, আজ নিতে পারবো না, আজ যে শুধু চিনতে এসেছি ফুল।

এ যে আপনার চেনা ফুল।

গোলাপ? চিনি বটে।

গাড়িতে উঠে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা তোড়া তারা রেখে গেছে।

শরৎ বসতে বসতে বললেন, আর চুপিচুপি কিছুই করার উপায় নেই। চলো কালী, বাড়ি যাই।

যমুনা-আপিসে শরৎচন্দ্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়

একদিন বৈকাল-বেলায় যমুনা-আপিসে একলা বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি, এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগা ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উস্কো-খুস্কো চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফ। পরনে আধ-ময়লা জামাকাপড়, পায়ে চটি জুতো। সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর।

লেখা থেকে মুখ তুলে শুধোলুম, 'কাকে দরকার?'

—'যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।'

—'ফণীবাবু এখনো আসেননি।'

—'আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বসবো কি?'

চেহারা দেখে মনে হলো লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'এই যে শরৎবাবু! কলকাতায় এলেন কবে? ঐ বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন?'

আগন্তুক মুখ টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁর হুকুমেই এখানে বসে আছি।'

ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সে কি! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেননি?'

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে স্বীকার করলুম, 'আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী।'

শরৎবাবু সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

এই হলো কথা-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়।

উপরি-উক্ত ঘটনার সময়ে শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে

বিখ্যাত না হলেও, যমুনায় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্প লিখে তিনি প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরও বছর ছয়েক আগে ভারতীতে তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যসমাজে অল্পবিস্তর আগ্রহ জাগিয়েছিলো বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর যশের ভিত্তি পাকা করে তুলেছিলো ঐ তিনটি সদ্য-প্রকাশিত গল্পই - বিশেষ করে বিন্দুর ছেলে'। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি তখন অশ্লীলতার অপরাধে বাংলাদেশের কোনো এক বিখ্যাত মাসিক পত্রের আপিস থেকে বাতিল হয়ে ফিরে এসে যমুনায় দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তার প্রথমাংশ পাঠ করে আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপুল আগ্রহ। তাঁর 'চন্দ্রনাথ' ও নারীর মূল্য'ও তখন যমুনায় সবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে তখনো শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার মতো আর বেশী-কিছু ছিলো না। রেঙ্গুনে সরকারী আপিসে নব্বই কি একশো টাকা মহিনায় অস্থায়ী কাজ করতেন। অ্যাকাউণ্টেণ্টসিপ্ একজামিনে পাস করতে পারেননি বলে তাঁর চাকরি পাকা হয়নি। শুনেছি, বর্মায় গিয়ে তিনি উকিল হবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বর্মী ভাষায় অজ্ঞতার দরুন ওকালতী পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছিলেন। এক হিসাবে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়িয়েছিলো। কারণ সরকারী কাজে পাকা বা উকিল হলে তিনি হয়তো আর পুরোপুরি সাহিত্যিক জীবন গ্রহণ করতেন না।

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ যমুনা-আপিসে আসতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাঁর অকপট বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিলো যথেষ্ট, কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়নি।...

শত শত দিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গলাভ করে তাঁর প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষত্ব আমার কাছে ধরা পড়েছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় যে-সব মতবাদ আছে, তাঁর মৌখিক মতের সঙ্গে প্রায়ই তা মিলতো না।

তিনি প্রায়ই আমাদের উপদেশ দিতেন, 'সাহিত্যে দুরাত্মার ছবি কখনো এঁকো না। পৃথিবীতে দুরাত্মার অভাব নেই, সাহিত্যে তাদের টেনে না আনলেও চলবে।'...

আজকাল অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক নিজেদের অভিজাত বলে প্রচার করে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার হাস্যকর চেষ্টা করেন। তাঁরা লেখেন ও বলেন বড় বড় কথা। কিন্তু সাহিত্যের এক বিভাগে অসাধারণ হয়েও শরৎচন্দ্র কোনদিন এইসব ময়ূরপুচ্ছধারীর ছায়া পর্যন্ত মাড়ানিনি। নিজেকে অতুলনীয় ভেবে গর্ব করবার অধিকার তাঁর যথেষ্টই ছিলো, কিন্তু মুখের কথায় ও অসংখ্য পত্রে তিনি বার বার এই ভাবটাই প্রকাশ করে গেছেন যে—আমি লেখাপড়াও বেশী করিনি, আমার জ্ঞানও বেশী নয়, তবে আমার লেখা লোকের ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে আমি স্বচক্ষে যা দেখি, নিজের প্রাণে যা অনুভব করি, লেখায় সেইটেই প্রকাশ করতে চাই। 'ইনটেলেকচুয়াল' গল্প-টল্প কাকে বলে আমি ত জানি না।...

যমুনা-আপিসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর ভেলু কুকুরকে নিয়ে আমাদের বহু সুখের দিন কেটে গিয়েছিলো। ঐ ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেতো না, কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিলো না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড় বলেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ-হয় সেটা জানতো। সে কতোবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এবং তার এই সাংঘাতিক আদর থেকে শরৎচন্দ্রও নিস্তার পেতেন না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকারের ছিলো ভীষণ কুকুরাতঙ্ক, ভেলু যদি ঘরে ঢুকলো সুধীর অমনি এক লাফে উঠে বসলো টেবিলের উপরে। ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিলো না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ আপত্তি ছিলো ভেলুকে বাঁধতে—আহা, অবলা জীব, ওর যে দুঃখ হবে!

হোটেল থেকে ভেলুর জন্যে আসতো বড় বড় ঘৃতপক্ক চপ, ফাউল কাটলেট। ভেলুর অকালমৃত্যুর কারণ বোধ হয় কুকুরের পক্ষে এই অসহনীয় আহার। এবং ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলুম, এ-জীবনে তা আর ভুলবো বলে মনে হয় না।

যমুনা-আপিসে শরৎচন্দ্র অনেকদিন বেলা দুটো-তিনটের সময় এসে হাজিরা দিতেন, তারপর বাসায় ফিরতেন সান্ধ্য-আসর ভেঙে যাবারও অনেক পরে। কোনো-কোনোদিন রাত্রি দুটো তিনটেও বেজে যেতো। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা তিন-চারজন মাত্র লোক থাকতুম। বাইরের লোক চলে গেলে শরৎচন্দ্র শুরু করতেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা কাহিনী। বেশী লোকের সভায় আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের সময়ে শরৎচন্দ্র বেশ গুছিয়ে নিজের মতামত বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু গল্প-গুজব করবার শক্তি ছিলো তাঁর অদ্ভুত ও বিচিত্র। শ্রোতাদের তাঁর সুমুখে বসে থাকতে হতো মন্ত্রমুগ্ধের মতো। একদিন এমন কৌশলে একটি ভূতের গল্প বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রে একলা বাড়ি ফিরতে ভয় পেয়েছিলেন। সেই গল্পটিও পরে আমি আমার 'যকের ধন' উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর মুখের ভাষার অভাবে তার অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি রাত্রেই আসর ভাঙবার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ি ফিরতুম আমি, কারণ তিনি তখন বাসা নিয়েছিলেন আমার বাড়ির অনতিদূরেই। সেই সময় পথে চলতে চলতে শরৎচন্দ্র নিজের হৃদয় একেবারে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং তাঁর জীবনের কোনো গুপ্তকথাই বলতে বোধ হয় বাকি রাখেননি। এই ভাবে খাঁটি শরৎচন্দ্রকে চেনবার সুযোগ খুব কম সাহিত্যিকই পেয়েছেন এবং আরো বছর-কয়েক পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে আমার ভাগ্যেও হয়তো এ সুযোগলাভ ঘটতো না।

শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিলো। তিনি বিলাতী নহেন, খাঁটি দেশী। তার নাম ছিলো ভেলু। শরৎচন্দ্র কুকুরটির এ নামকরণ কেন করেছিলেন তা জানিনে। কুকুরটি দেখতে ছিলো কদাকার, আর তার আচরণ ছিলো অতি অভদ্র। যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করতো, শরৎ-দর্শন প্রার্থীবৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থে দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন। ভেলুর গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই বলতেন—'এই ভেলু!' আর অমনি মেষশাবকের মত দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসতো। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালবাসতেন, তা আর বলতে পারিনে।

সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাড়িতে যত রকমের চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করলেন। দু'হাতে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশুচিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন - পাঠিয়ে দিলেন না। ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচেছিলো, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নান আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে থাকতে দেয়ার আদেশ থাকতো, তাহলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জরপার্শ্বেই বসে থাকতেন। কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না। তার মৃতদেহ শিবপুরে নিয়ে সমাধিস্থ করলেন। আমি সংবাদ পেয়ে সেইদিনই শিবপুরে গেলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—'দাদা, আমার ভেলু আর নেই।' তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের হলো না।...

শরৎচন্দ্র তখনও শিবপুরে বাস করেন। একদিন প্রাতঃকালে আমি শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম। সেদিন-রবিবার। আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরতের বাসায় যেতাম, সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আটটা-ন'টায় কলকাতায় ফিরে আসতাম।

সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ছোট বড় কলের ধুতি-শাড়ী ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে। শরৎ একখানি চেয়ারে বসে সুমুখের টেবিলে আনি-দুয়ানি, সিকি গণে গণে গোছাচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন—'দাদা, আমি এই দশটার গাড়িতে দিদির বাড়ি যাব। তা বলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন সেই রাত দশটায়।'

আমি বললাম—'দিদির বুঝি কোনো ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছ, আর কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য ঐ আনি-দুয়ানি?'

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন—'না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়।' এই বলেই তিনি চুপ করলেন, আসল কথাটা গোপন করাটাই তাঁর ইচ্ছা।

আমি বললাম—'ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নূতন কাপড়ই বা নিয়ে যাচ্ছ কেন? অত সিকি-দুয়ানিরই বা কি দরকার?'

শরৎ অতি মলিনমুখে বললেন—'দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চার পাশের গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের যে দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কী—'

শরৎ আর বলতে পারলেন না; তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

এই আমার শরৎচন্দ্র! এই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। এই শরৎচন্দ্রকে আজ আমি বন্দনা করছি।

শরৎচন্দ্র ও চরকা　　　　　　　　　　　　গোপালচন্দ্র রায়

১৯৩২-এ রামমোহন লাইব্রেরি হল্‌-এ ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়ের এক সংবর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতি হন। সভায় প্রবীণ-নবীন বহু সাহিত্যিক, গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের আহ্বানে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ঐ সভায় এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেছিলেন।

সভার শেষে শরৎচন্দ্র সেদিন আর বাড়ি ফিরলেন না, বেহালায় মণীন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। পরদিন সকালে তাঁকে কেন্দ্র করে রায়বাড়িতে বিরাট এক বৈঠক বসেছে। চা সহযোগে গতকালের জলধর-সংবর্ধনা-সভার কথা আলোচনা হচ্ছে। শরৎচন্দ্র গুরুসদয়ের বক্তৃতার খুব প্রশংসা করলেন। গুরুসদয়ের কথা থেকে পল্লীসংস্কার, পল্লীসংস্কার থেকে আলোচনা শেষে চরকায় এসে দাঁড়ালো।

একজন প্রশ্ন করলেন—শরৎবাবু, আপনি কি নিজে কখনো চরকা কেটেছেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে, আমার চরকা কাটা যে এক ইতিহাস—চরকা আমি শুধু একাই কাটিনি, বাড়িসুদ্ধ সবাই কেটেছি, মায় চাকরগুলো পর্যন্ত। চাকরগুলোর চারকাকাটা শিখে খুব মজা, কাজে দেদার ফাঁকি দিতে লাগলো। যদি জিগ্‌গেস করি, হ্যাঁরে অমুক, কাজটা করিসনি কেন? তখুনি জবাব পাই, বাবু, চরকা কাটছিলাম যে। চরকার নাম করলে আর কিছু বলাও যায় না, কেননা ভৃত্যেরা আমার দেশোদ্ধারের কাজে লেগেছেন। তা লাগুন, কিন্তু সত্যিকারের সুতো যদি কিছু কাটতো, তাহলেও না হয় বুঝতাম।

নিজের উপরই কি কম ধাক্কাটা গেছে? দেশবন্ধুর পাল্লায় পড়ে

পচা তেলের ফুলুরী, কচুরী, নিমকি মায় ছোলাভাজা পর্যন্ত খেয়ে গ্রামে-গ্রামে চরকা-চরকা করেই বা কি কম ঘুরেছি। অনেকদিন আবার তাও জোটেনি। চরকা-চরকা করে এতটা অত্যাচার না করলে শরীরটা বোধ করি আজ এতটা খারাপ হ'তো না।

কত কাণ্ডই না করেছি। এই চরকা থেকেই শেষে তাঁতও বসানো হয়েছিলো। সুরেনমামা একদিন এসে বললেন—শরৎ, শুধু চরকায় তো হবে না, তাঁতও বসাতে হবে। বললাম—ঠিক বলেছো। অমনি লেগে গেলাম তাঁত বসানোর কাজে। ভাগলপুরে পাঁচ-সাতটা তাঁতও বসানো হয়ে গেলো। বাঙলাদেশ থেকে ভালো-ভালো তাঁতী অগ্রিম টাকা দিয়ে আনানো হ'লো। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই, এমনকি তাদের দাদনের টাকাটা শোধ না হতেই, তাদের বাড়ি থেকে চিঠি আসতে লাগলো, কারো ছেলের অসুখ, কারো স্ত্রীর অসুখ, টাকার অভাবে তাদের নাকি চিকিৎসা পর্যন্ত চলছে না। অতএব, দাও টাকা। দিলাম টাকা।

আবার চিঠি এলো—লোক অভাবে পাকা ধান মাঠে মারা যাচ্ছে, কাটবার লোক নেই, অতএব পত্রপাঠ চলে এসো। কারো চিঠি এলো—অমুকে নালিশ করেছে, মামলার তদ্বির করতে হবে, চলে এসো, না হলে সব যাবে। তাঁতীরা এ হেন সব চিঠি নিয়ে হাজির হয়, আর আমরা বাধ্য হয়ে রাহাখরচ আর ছুটি দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠাই। কিন্তু ছুটি ফুরিয়ে গেলেও তারা আর ফেরেনা। এদিকে তাঁতশালায় উইপোকারও উৎপাত—ওদের তো আর দেশাত্মবোধ নেই।

হতাশ হয়ে সুরেনমামা বললেন—দূর ছাই, পরের উপর নির্ভর করে আর কাজ চলবে না। তার চেয়ে এসো, দেশলাইয়ের কারখানা করা যাক। দেশের কাজও হবে, পয়সাও হবে। তবে এবার কিন্তু আর লোক লাগানো নয়। নিজেরাই শিখবো, নিজেরাই সব করবো, কিছু অনুগত ছেলেকেও কাজ শিখিয়ে নেয়া যাবে।

সুরেনমামার উপদেশমতো তাঁত শিকেয় তুলে দেশলাইয়ের কল

পাতা হ'লো। কিন্তু হিন্দুর ছেলেরা কেউ কাজ শিখতে এলো না। শেষে পাওয়া গেল ক'টি মুসলমান ছেলে। তারা বললে—আমরা কাজ শিখবো, কিন্তু আমাদের মজুরী দিতে হবে। সুরেনমামা অনেক বলে কয়ে দৈনিক চার আনাতে একটা রফা করে নিলেন।

সুরেনমামা আমাকে বললেন—দেশে শিক্ষার অভাব। তা নইলে কি আর দেশের এমন দুরবস্থা হয়!

যাই হোক, কাজ তো খুব জোর চলতে লাগল। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন বারুদে আগুন লেগে গেলো। কারো হাত পুড়লো, কারো পা পুড়লো, কারো গা পুড়লো, আর সেই সঙ্গে পুড়লো আমাদের মুখ। এইখানেই আমাদের দেশলাইয়ের কারখানার ইতি। সুরেনমামা বাইরে মুখ দেখানোর লজ্জায় ভাগলপুরেই লুকিয়ে রইলেন, আর আমি চলে এলাম সামতাবেড়েয়।

হাতে-কলমে দেশোদ্ধারপর্ব শেষ হ'লো।

শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ার ঘরটি ছিলো একেবারে বাড়ির বাইরে। শুধু একটা বারান্দা দিয়ে যুক্ত ছিলো সেটা বাড়ির সঙ্গে। ঘরটার পাশেই ছিলো বাগানের একটা বিরাট অংশ। এই বাগানটা শরৎচন্দ্র নিজে হাতেই তৈরি করেছিলেন। সেই বাগানের সামনে একটা বড় জাম গাছ ছিলো। শরৎচন্দ্র ওই গাছটার একেবারে পাশেই মাধবী আর মালতী ফুলের দুটো গাছ পুঁতেছিলেন। তাই মাধবী ফুল ভরে থাকতো ওই জাম গাছটায়। আর ওই জাম গাছটার একটা ডালেই থাকতো মালতীর লতা। থোপা থোপা কুঁড়িতে ভরে থাকতো তখন ওই মালতী লতাটা। একটা বাতাবী লেবুরও গাছ ছিলো সেখানে। সেটাতেও ফুল ফুটে থাকতো তখন। আর ওই ফুলের গন্ধ তখন ভেসে আসতো শরৎচন্দ্রের ওই লেখাপড়ার ঘরটাতে। সমস্ত বাগানটাকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র যে, একদিকে ছিলো বকুল-কুন্দ-করবী, অন্যদিকে ছিলো মালতী-মাধবী-বাতাবীর সমারোহ।

শরৎচন্দ্রের ওই ঘরটা বাড়ির বাইরে ছিলো বলে, আর সারা রাত সেখানে একলা থাকতে হোতো বলে, তাছাড়া সমাজপতিদের বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন বলেই তিনি নিজে খুব সাবধানে থাকতেন। আত্মরক্ষার জন্য একটা বন্দুক রেখেছিলেন তিনি ওই ঘরটাতে। তাছাড়া একটা পিস্তলও থাকতো তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে।

লিখতেন অনেক রাত পর্যন্ত। এমন কতদিন গেছে যে, সারারাত ধরেই তিনি লিখে গিয়েছেন। খাবার ঢাকা থাকতো ওই ঘরের এক পাশেই। কোনোদিন তিনি তা খেতেন, আবার কোনো—কোনোদিন অভুক্তও থেকে যেতেন। যখন তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন, বিশ্রাম নিতেন পাশের ইজিচেয়ারটায়।...

সেই সময়েই তিনি 'বিপ্রদাস' লেখেন। আর লেখেন 'শেষপ্রশ্ন'।

বিপ্রদাস বেরুতো তখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে। যদিও এর আগে 'বেণু' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় বিপ্রদাসের অনেকটাই লিখেছিলেন তিনি। তবুও আবার গোড়া থেকেই বিচিত্রায় লেখেন ওই 'বিপ্রদাস'।

এই 'বিপ্রদাস' সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যেতো তখন। বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় ছিলো ওর নামকরণ। শরৎচন্দ্রের আপন ছোট মামার নামই ছিলো বিপ্রদাস। উনি চুরাশি বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। শরৎচন্দ্র বাস্তবে যা ওঁকে দেখেছিলেন, গ্রন্থে হুবহু তা চিত্রিত করে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বলতেন সকলকে, তাঁর ছোট মামার মতো ধর্মপরায়ণ, আচারনিষ্ঠ, গুরু এবং দেবতায় ভক্তিমান মানুষ বুঝি খুব কমই মেলে। তিনি আরো অনেক কথাই বলতেন তখন। আর বলতেন তাঁর অনেক সাহসিকতার গল্প। বলতে বলতে তিনি যেন আত্মহারা হয়ে যেতেন। বিপ্রদাসের সমস্ত ছবিটাই তখন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতেন তিনি। তাছাড়া তার ছোট ভাই ঠাকুরদাসের কথাও বলতেন। এই ঠাকুরদাস বিপ্লবীদের সঙ্গে তখন যুক্ত ছিলেন। ইনি কিছুদিন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করছিলেন। ইনি হলেন সম্পর্কে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মশায়ের জ্ঞাতি ভাই।

একদিন রাত্রে শরৎচন্দ্র যখন লিখছিলেন তাঁর ওই ঘরটিতে তখন গভীর রাত। ওই রাতে ঘটেছিলো এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। ভীষণ ঝড় জল শুরু হয়েছিলো তখন। আর শুরু হয়েছিলো রূপনারায়ণের প্রবল গর্জন। মনে হয়েছিলো রূপনারায়ণ বুঝি তখন সমুখের সমস্ত কিছু গ্রাস করে ফেলবে। শরৎচন্দ্র তখন শেষ প্রশ্নেরই একটা বিতর্কিত অধ্যায় রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এমন সময় ছপ্‌ ছপ্‌ করে যেন কিসের একটা আওয়াজ হ'লো। ধীরে ধীরে সেই আওয়াজটা খুব কাছাকাছি এসে পড়লো। শরৎচন্দ্রের মনটা তখন লেখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো তাঁর ওইদিকেই।

তিনি জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন বাগানটার দিকে। ঐ বাগানটা তখন জলে-কাদায় একাকার হয়ে গিয়েছিলো। ঘরের থেকে যেটুক সেজের আলো গিয়ে পড়েছিলো অন্ধকার বাগানটায়, সেই দিকেই তখন তিনি চেয়ে দেখলেন।

তিনি দেখলেন জল-কাদার মধ্য দিয়ে একটা লোক এদিকে আসছে। বর্ষাতির মধ্যেই লোকটার চেহারাটা ঢাকা। প্রথমটায় তিনি হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপরেই ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—কে, কে ?

উত্তর এলো—আমি।

—কে আমি ?

—বলছি, চুপ করো। বলে, লোকটা দ্রুত এসে পড়লো তাঁর সামনে।

কাছে আসতেই তিনি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে, বিপিন মামা যে !

বিপিন গাঙ্গুলী তখন গলার স্বর নিচু করে বলে উঠলেন, চুপ করো, কেউ শুনতে পাবে।

তারপর শরৎচন্দ্র বিপিন গাঙ্গুলীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। সমস্ত জানালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে এলে এই দুর্যোগের রাত্তিরে ?

—আর বলো কেন, এলাম ডিঙ্গি নিয়ে। বললেন বিপিন গাঙ্গুলী।

—অ্যাঁ! চমকে উঠলেন শরৎচন্দ্র।

—এতে চমকাবার কি আছে ? আমরা হলাম যমের অরুচি। মৃত্যুর পথও আমাদের জন্যে রুদ্ধ। বলেই বিপিন গাঙ্গুলী হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

সেকথা শুনে শরৎচন্দ্র কেমন যেন হয়ে গেলেন। তারপর আবেগের সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, "পথের দাবী"র সেই কথাগুলো—তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও, তাইতো দেশের খেয়াতরী

তোমায় বহিতে পারে না। কোন বিস্মৃত অতীতে শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিলো সে তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই। সে তো তোমার গৌরব। তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার? এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, এ তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই। ...দুঃখের দুঃসহ বোঝা বহিতে পারো বলিয়াই তো ভগবান এতো বোঝা তোমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন।...

বিপিন গাঙ্গুলী আর বলতে দিলেন না তাঁকে। তিনি বললেন, ভীষণ খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেতে দাও, তারপর তোমার কাব্যি কোরো।

শরৎচন্দ্র উঠে গিয়ে নিজের জন্যে ঢাকা দেওয়া খাবারটা এনে দিলেন তাঁকে।

সঙ্গে তাঁর নিজের শুকনো জামা-কাপড় এনে দিলেন। বললেন—আগে ভিজে জামা-কাপড়গুলো বদলে ফেলো, তারপর খাও—

জামা-কাপড় বদলে নিয়ে খেতে খেতে বিপিন গাঙ্গুলী বললেন—আমার কিছু টাকার দরকার।

—টাকা? কত টাকা?

—চার হাজার টাকা। কালকের মধ্যেই টাকাটা চাই। রাসবেহারী বোসের কাছে পাঠাতে হবে—

শরৎচন্দ্র বললেন—আচ্ছা আগে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করো তো। তারপর আমি ওটার ব্যবস্থা করছি।

তারপর শরৎচন্দ্র ওপরে উঠে গেলেন।

ওপরে গিয়ে আলমারী থেকে যা কিছু টাকাপয়সা গহনাপত্তর ছিলো সব একটা চামড়ার ব্যাগে ভরে নিয়ে আবার নিচে চলে এলেন তিনি। যখন সেগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন দেখলেন যে বিপিন গাঙ্গুলী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু ঘুম ভাঙালেন না বিপিন গাঙ্গুলীর। নিজের লেখায় তিনি আবার মনঃসংযোগ করলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর, বিপিন গাঙ্গুলী নিজেই উঠলেন। ঘড়ি দেখে বললেন—আমার কিন্তু সময় হয়ে গেছে শরৎ।

শরৎচন্দ্র বললেন, কিন্তু আগে বৃষ্টি থামুক তবে তো যাবে!

সে কথায় বিপিন গাঙ্গুলী হেসে বলেছিলেন, তাহলে আর আমায় এখান থেকে যেতে হবে না। পুলিসের হাতকড়ি পরতে হবে তখন।

এর একটু পরই বিপিন গাঙ্গুলী চলে গিয়েছিলেন। যাবার আগে ওই ব্যাগটা খুলে দেখেছিলেন তিনি। দেখে বলেছিলেন শরৎচন্দ্রকে—আরে তুমি যে বড় বৌয়ের গহনার সঙ্গে ছোট বৌয়ের গহনাগুলোও দিয়ে দিয়েছো এতে!

তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, তা হোক, ছোট বৌয়ের তাতে পুণ্যিই হবে। শুধু বড়বৌ পুণ্যিটা একলাই বা সঞ্চয় করবে কেন?

কিন্তু বিপিন গাঙ্গুলী বাধা দিয়ে বলেছিলেন, ওহে, এখনও যে ছোট বৌয়ের গহনাগুলো থেকে বিয়ের গন্ধ যায়নি দেখছি। এগুলো তো এই সেদিন তোমার সঙ্গে গিয়ে আমিই পছন্দ করে কিনিয়ে দিয়েছিলাম—

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন তখন, বিয়ের সময় তুমি পছন্দ করেছিলে বলেই তো এখন তোমার কাজেই লাগলো এটা।

বলে, খুবই রহস্যময় এক হাসি হেসেছিলেন।

তারপরেই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বিপিন গাঙ্গুলী বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন সে পথ দিয়েই, যে পথে এসেছিলেন এখানে। পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই সারা বাড়িটা পুলিসে ঘিরে ফেলেছিলো। ঘিরে ফেলেছিলো বিপিন গাঙ্গুলীকে ধরবার জন্যেই। আর তার ফলে শরৎচন্দ্রকে পুলিসের অনেক দুর্ব্যবহার ভোগ করতে হয়েছিলো।

বড় বৌ—শরৎচন্দ্রের সহধর্মিনী হিরন্ময়ী দেবী।

ছোট বৌ—শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী।

শরৎবাবু অনুরূপা দেবী

মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর খুব শখ ছিলো।

তিনি একদিন আসিয়া বলিলেন,—'একটি বাঙালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়, অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু তা নয়, লোকটা বাঙালীই। একদিন নিয়ে আসবো তাকে? গান শুনবে? তার খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—তোমার এখানে রাখতে পারলে ভালো হয়।'

বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা এক-একদিন, ভালো কোনো গায়ক পাওয়া গেলে গান-বাজনার আসর বসতো।

নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসেন।

ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়িতে অতিথিরূপে এইখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতোই ছিলো।...

শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু [লেখিকার স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন।

শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিলো।—অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্ত-ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এইসব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটি স্থান করিতে পারিয়াছিলেন।

দেখো, মানুষ যে কাজই করুক, সেই কাজে সে যদি তার দলের আর পাঁচজনের চেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করে, তাহলে এটাই বুঝতে হবে যে ঐ কাজের পিছনে তার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ছিলো। এ না থাকলে আমার মনে হয়, কেউ বড় হতে পারে না। ধরে-বেঁধে, চেষ্টা-চরিত্র ক'রে কাজের সাফল্য এক, আর প্রেরণায় কাজের সাফল্য আর এক। লোক আমার নাম জানলো যখন আমার লেখা ছাপা হ'লো, যেন ঐ সময়েই ওগুলো আমি লিখেছি। কত ছেলেবেলায় যে লিখতে আরম্ভ করেছি, তা বললে তোমরা ভাববে যে আমি মিথ্যে বলছি। কিন্তু সত্যি, মিথ্যে তা নয়। কে যেন আমাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে লেখাতে বসাতো। আমার ভারি দুঃখ হয় যে, সেই বয়সের আমার লেখাগুলো হুবহু ছাপা হয়ে গিয়েছিলো।

আমার সাহিত্যিক জীবনের জন্য আমি যাঁর নিকটে সবচেয়ে তিনি হচ্ছেন যমুনা-সম্পাদক ফণীবাবু। আমার লেখা ছাপাবার জন্যে ভদ্রলোকের কী আগ্রহই ছিলো! কাগজ চালাতে গেলে, লেখকের প্রতি এমনি দরদী সম্পাদক হওয়াই উচিত।

—আপনার মতো লেখক পেলে, সব সম্পাদকই দরদী হন।

—তা যদি হ'তো, তাহলে আমার 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি প্রথমে আমি যে কাগজে পাঠিয়েছিলুম, সেখানে তা ছাপা হ'লো না কেন? অবশ্য আমি তাঁদের দোষ দিই না, কারণ 'চরিত্রহীন' তো সত্যি-সত্যিই একদল পাঠক গ্রহণ করতে পারেননি। এমন কি, এমন কথাও আমার কানে গেছে, কোনো এক সম্পাদক মশাই অশ্লীলতার অপরাধে একে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে পুলিস কমিশনারের দপ্তরে

চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আমাদের দেশে বঙ্কিমবাবু সাহিত্যের যে-পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তার বাইরে যে আর পথ থাকতে পারে, দেশের লোকের অনেকেরই তা বোধ ছিলো না। মানুষ যে জড় পদার্থ নয়, তার মন ব'লে যে একটা বস্তু আছে, এ বোধটা অনেকেরই তখন জাগেনি। আমি কিন্তু মনের বল হারাইনি। কেন জানো? 'চরিত্রহীন'কে আমি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সায়েন্টিফিক্ পথে চালিয়ে নিয়ে গেছি।

* *

দেখ 'যমুনা'কে আমি বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম। স্বনামে বেনামে অনেক লেখাই তাতে লিখেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ফল হ'লো না। আমার মনে হয় মানুষের মতো কাগজেরও একটা আয়ু আছে, সেই আয়ুটা যখন ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ হয়ে আসে তখন তাকে আর শত চেষ্টা করেও বাঁচানো যায় না।

* *

সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, গোড়ার জীবনে কোন কোন বিদেশী ঔপন্যাসিকের লেখা আমি সবচেয়ে বেশী পড়েছি। এর উত্তরে আমি যখন তাঁদের বলি গোড়ার দিকে জীবনে আমি বঙ্কিমবাবুর আর রবিবাবুর বই-ই সবচেয়ে বেশী পড়েছি তখন আমার উপর আর যেন তাঁদের শ্রদ্ধা থাকে না। বিদেশীদের হু'একখানা বই আমি অনুবাদ করেছিলুম, কিন্তু সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ওঁদের মধ্যে ডিকেন্সের লেখা আমার খুব ভালো লাগতো।

* *

একজনের পাণ্ডিত্য আছে বলেই যে গল্প-উপন্যাসে তাঁর দক্ষতা থাকবে, এ ধারণা ভুল। আমাদের দেশে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা সত্যিই পণ্ডিত—দেশ-বিদেশের অনেক কিছু পড়াশুনার দাবি তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু এঁদের হাতের উপন্যাস, বাবু সত্যি-সত্যিই পীড়াদায়ক।

—রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় এমনি মত পোষণ করেন।

—কি করে জানলে ?

—একদিন আমি সকালবেলায় প্রমথ চৌধুরী মশাইয়ের বাড়ি গেছলুম। আমি যখন গেছি, তখন তিনি তাঁর বাইরের ঘরে আসেননি। আমি ঢুকেই দেখলুম, টেবিলের উপর একখানা পোস্টকার্ড প'ড়ে রয়েছে—বোধ হয় তার কিছু আগে ডাকপিওন সেখানা দিয়ে গেছলো। চিঠিখানা ছিলো রবীন্দ্রনাথের লেখা। তার একস্থানে লেখা ছিল—প্রমথ,······তোমার কথা খুব শোনে। তাকে বুঝিয়ে ব'লো সে যেন উপন্যাস আর না লেখে।

* *

একদিন কি একটা ঘটনার কথা উঠলো। বললুম, কালকের খবরের কাগজে তো এটা বেরিয়েছিল—আপনি পড়েননি ?

—না। তোমাদের মতো খবরের কাগজ পড়ার আমার বাতিক নেই। তবে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়তে আমার খুব মজা লাগে। এক কলম ব্যাপী সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইংরেজ সরকারের কত রকমারী অন্যায়ের বর্ণনা করে, শেষে মন্তব্য হ'লো কিনা—এটা কি সরকারের উচিত হয়েছে ? বিশেষ করে······খানা এর বেশী আর কখনো লিখতেই পারলে না। ভাগ্যিস, দেশবন্ধু আর সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশে জন্মেছিলো, নইলে দেশের কী অবস্থা হ'তো বলতো ? এঁরা না থাকলে, বাংলাদেশের রাজনীতি ঐ স্বদেশী যুগেতেই থেমে থাকতো।

* *

লেখকমাত্রেই তাঁর বিশেষ সৃষ্টির প্রতি একটি বিশেষ প্রীতি থাকে —এই রকম একটা কথা লেখকদের সম্পর্কে শোনা যায়। শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসখানিকে এমনি প্রীতির সঙ্গে দেখতেন। এ কথা কতদূর সত্য, তা আমি বলতে পারি না। সে যাই হোক, আমার নিজের ধারণা ছিলো, 'গৃহদাহ'ই শরৎচন্দ্রের

নিকটে সবচেয়ে প্রিয়, এবং এই ধারণা হবার প্রধান কারণ ছিলো এই যে, 'গৃহদাহ' সম্পর্কে যখনি কোনো প্রসঙ্গ উঠত, তখনি তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে সে-সম্বন্ধে কথা কইতেন—আর কোনো বই সম্বন্ধে তাঁর এমনি উৎসাহ দেখা যেতো না। বরং এই কথাটাই বলতেন—পাঠকরাই বইয়ের বিচারক—আমার নিজের মতে কি এসে যায়। কিন্তু 'পথের দাবী' বই সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। সেই কথাটাই এখানে বলি।

* *

আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর পর, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাস-খানির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের রাজনৈতিক মতবাদকেই প্রচার করেছেন। এদিক থেকে বইখানি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'অসহযোগ আন্দোলন'-এরই তীব্র প্রতিবাদ। এই বইখানি যে শরৎচন্দ্রের কিরূপ প্রিয় ছিলো তার প্রমাণ পেলুম যেদিন, সেদিন 'গৃহদাহ'র স্থান তুচ্ছ হয়ে গেলো। বুঝলুম, একেই বলে বিশেষ সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার বিশেষ প্রীতি। সে কী উত্তেজনা! কী বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি 'পথের দাবী' প'ড়ে ইংরেজদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন! এই বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্যে আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ানো উচিত। হায় কবি, যদি তুমি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা—কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী' যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিলো। কি মন নিয়েই যে আমি এই বইখানা লিখেছি, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

অল বেঙ্গল লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েসনের প্রথম অধিবেশন এলবার্ট হল্-এ অনুষ্ঠিত হবে। এই সমিতির একজন উদ্যোক্তা হিসেবে শরৎচন্দ্রের কাছে গেছি তাঁকে এ অনুষ্ঠানে আহ্বান করতে। 'পথের দাবী' তখন সরকারী নিষেধাজ্ঞার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—আচ্ছা, তোমাদের এটা তো সারা বাংলার লাইব্রেরির ব্যাপার। তোমরা একটা কাজ করো না, আর তোমাদেরই তো এটা কাজ। এই যে সরকার আমার 'পথের দাবী'কে আটকে রেখেছে, এটা ছাড়াবার একটা প্রস্তাব সভা থেকে মঞ্জুর করাতে পারো না? প্রকাশ্য সভা থেকে এর একটা প্রতিবাদ হলে অনেক কাজ হবে—সরকারের একটু টনক নড়বে। আমার আর পাঁচখানা বইও যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করতো, তাহলে আমার এতো দুঃখ হ'তো না।

* * *

শরৎচন্দ্রের একটি রিভলভার ছিলো। প্রতি বৎসর এর লাইসেন্স বদলাতে হ'তো। এ কাজটি করতে তিনি নিজে পুলিসের কাছে যেতেন। এমনি একদিন যখন তিনি যাবার আয়োজন করছেন, আমি গিয়ে পড়ি। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শুধু লাইসেন্স বদলানো নয়, টেগার্ট সাহেবের [পুলিশ কমিশনার] সঙ্গেও আমাকে একবার দেখা করতে হয়। তাঁর ধারণা আমি যখন 'পথের দাবী' লিখেছি তখন বাংলার বিপ্লবীদের নাড়ীর খবর আমি জানি। গত বছরে আমি তাঁর এ ভুলটা ভাঙাবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর মত বদলাতে রাজী হলেন না। তখন আমি বললুম, তাহলে আপনি আমায় ধরেন না কেন? সাহেব খুব হেসে উঠলেন।

—দেখুন, আপনাকে ওরা না ধরতে পারে, কিন্তু আপনার সব খবর যে ওরা জানে না, এমন কখনই হতে পারে না।

দেখো, সেদিন বিপিন [বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী] হঠাৎ মেয়েছেলের বেশে রাত্রে এসে উপস্থিত—সাতশো টাকার তার ভীষণ দরকার।

ঘণ্টা কয়েক থেকে ভোর রাত্রে সে চলে গেলো। ওদের পিছনে তো পুলিস লেগেই আছে, তাই দু'পাঁচ দিন আমার একটু সন্দেহের মধ্যে কেটেছিলো। আর যদি ধরেই নিয়ে যেতো, কি আর করতুম! তবে এ বিশ্বাস আমার বিপিনের উপর আছে যে, সে যদি নিজেও ধরা পড়তো তাহলে পুলিস হাজার চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে আমার টাকা দেওয়ার খবর বার করতে পারতো না। ওর মতো একটা দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী খুব কমই আছে। কই, তুমি যে বললে পুলিস আমার সব খবর রাখে, তাহলে এ খবরটা তারা পেলো না কেন? এ খবর পেলে তারা আর আমাকে ছাড়তো না।

* * *

দেখো, "ঘটে যাহা, সব সত্য নয়" কবির এই কথাটা যদি লেখকরা উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে রিয়েলিস্টিক সাহিত্যের নামে আর নোংরামির সৃষ্টি হয় না। আমার 'সাবিত্রী' মেসের ঝি ছিলো—বেশ্যা ছিলো না। সে ছোট কাজ করতো, কিন্তু সতীত্বের দিক থেকে সে কারুর ছোট ছিলো না।

শরৎচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

শরৎচন্দ্র যখন ১৯৩৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত তাঁর ডক্টরেট উপাধি আনতে উক্ত বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করবার জন্য ঢাকা যান, তখন বাংলার তদানীন্তন গবর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যার জন্ এণ্ডারসন্ শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার লেখার মধ্যে মুসলমান সমাজের পরিচয় হিন্দু সমাজের তুলনায় এত অল্প কেন? বাংলাদেশের অধিকাংশই মুসলমান, সুতরাং এদেশের সাহিত্যে তাদের কথা যথাযোগ্য স্থান লাভ করাই স্বাভাবিক; কিন্তু বাঙালী ঔপন্যাসিকদের রচনা পড়লে এদেশে যে মুসলমান বলে এত বড় একটা সম্প্রদায় আছে, তা জানতেও পারা যায় না। শরৎচন্দ্র অতি অল্প কথায় এর জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তো মুসলমান চরিত্রও আমার রচনার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করেছি। তবে এ-কথা সত্য, তা সংখ্যার দিক থেকে এমন কিছু বিশেষ নয়। ভবিষ্যতে তিনি যাতে আরও মুসলমান-চরিত্রের সৃষ্টি করে মুসলমান সমাজভিত্তিক উপন্যাস রচনা করেন সেজন্য স্যার জন এণ্ডারসন্ তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্রও প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ উপন্যাসে তিনি মুসলমান সমাজ-জীবনকে প্রাধান্য দেবেন। এরপর ঢাকায় বাসকালীনই শরৎচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ে স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে কিছুদিন রোগ-ভোগ করবার পর তিনি প্রথমতঃ স্বগৃহে, তারপর সেখান থেকে দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য চলে যান। তিনি সে অসুখ থেকে আর কোনোদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি ঢাকায় স্যার জন্ এণ্ডারসনের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা আর পূর্ণ করতে পারেননি।

কিন্তু তিনি তাঁর সুস্থ দেহে আরও বেশিদিন জীবিত থাকলেও তাঁর এ প্রতিশ্রুতি কতদূর পালন করতে পারতেন, বিচার করে দেখা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে যে দুটি মাত্র মুসলমান চরিত্র সামান্য একটু প্রাধান্য লাভ করেছে তা প্রায় একই স্তরের সমাজ থেকে এসেছে।—একটি পল্লীসমাজের আকবর লাঠিয়াল ও দ্বিতীয়তঃ 'মহেশ' ছোট গল্পের গফুর। দুই-ই কৃষক সমাজের চরিত্র—তবে আকবর বীর, গফুর দরিদ্র, নীতিবোধ উভয়েরই সমান। বাংলার নিরক্ষর মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি যে বিশিষ্ট ধর্মবোধ বর্তমান আছে, তা ইতিপূর্বেও বাংলা সাহিত্যের কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন, এ সম্পর্কে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের তোরাপ চরিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তোরাপ ও আকবর লাঠিয়ালে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। তোরাপ যেরকম বলে, 'মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারব না,' আকবরও তেমনই বলে, 'সব সইতে পারি কিন্তু বেইমান সইতে পারি না।' এই দু'জন লেখকই নিরক্ষর মুসলমান সমাজের জীবন গভীরভাবে অনুসরণ করেছিলেন, সেইজন্য তাঁর সম্পর্কে তাঁদের এই উপলব্ধি হয়েছিল, এ-কথা কেউ কারো কাছ থেকে ধার করে লেখেননি। বাংলার নিরক্ষর মুসলমান সমাজের এই ধর্মবোধ তার সহজাত বৃত্তির মতো তোরাপই হোক কিংবা আকবরই হোক, কোনো মুসলমান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এই বিশ্বাস লাভ করেনি, মানুষ যেভাবে তার ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো জৈব বৃত্তিগুলো লাভ করে থাকে, নিরক্ষর সমাজও সেই সূত্রেই তার এই ধর্মবোধ লাভ করে থাকে। সেজন্য এর ভিতর দিয়ে তার এত শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই ধর্ম রক্ষা করবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ হয়ে উঠে। আকবর লাঠিয়ালের এই বিষয়ক দৃঢ়তা দেখে বেণী ঘোষাল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, শিক্ষা ও উচ্চতর জীবন-সংস্কার দিয়েও বেণী যে ধর্মবোধ আয়ত্ত করতে পারেনি, নিরক্ষর আকবর তার সহজাত বৃত্তির সূত্রেই তা লাভ

করে নিজের জীবনে আচরণ করে আসছিল। শরৎচন্দ্রের এই চেতনা বাংলার মুসলমান সমাজের একাংশ সম্পর্কে একটি সত্য জীবন-চেতনা ছিল, সেজন্য 'পল্লী-সমাজে'র মধ্যে একটি সামান্য চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও আকবর লাঠিয়াল এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

'মহেশ' ছোট গল্পের গফুর এবং তার কন্যা আমিনার চরিত্র তাদের জীবনের একান্ত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে বলে তাদের মধ্য দিয়ে কোনো চরিত্র-শক্তির বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠেনি। অত্যাচারী প্রবলের হাত থেকে এরা ক্রমাগত পীড়নই লাভ করেছে, তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবার কোনো শক্তিই তাদের ছিলো না, সে পথে তারা অগ্রসরও হয়নি। কিন্তু এই অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও একটি অসহায় অবোলা জীবের প্রতি তাদের একান্ত আত্মীয়তাবোধ এই কাহিনীটির মধ্যে এক অপূর্ব আবেদন সৃষ্টি করেছে। এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, আকবর কিংবা গফুর এদের চরিত্রের পরিকল্পনা যতই সার্থক এবং সহানুভূতি-পূর্ণ, হোক এদের ভিতর দিয়ে বাংলার বৃহত্তর মুসলমান সমাজের সামগ্রিক পরিচয়ের একাংশ প্রকাশ পেতে পারেনি। মুসলমান বলেই যে গফুর এই অত্যাচারের ভাগী হয়েছে তা নয়, সে দরিদ্র ও অসহায় বলেই তার উপর প্রবলতর সমাজের অত্যাচার এত কঠিন হয়ে উঠেছে। এমন কি, অসহায় দরিদ্র হিন্দু নীচ জাতির উপরও সমাজের এমনই অত্যাচার দেখতে পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদির মধ্যেও তার পরিচয় আছে। সুতরাং গফুর মুসলমান সমাজের সূত্রে এই কাহিনীতে আসেনি—অসহায়, দরিদ্র ও অত্যা-চারিতের প্রতীক রূপেই সে এখানে এসেছে।

আমি জানি বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ এদেশের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে যতখানি শ্রদ্ধা করে, আর কাউকে তত শ্রদ্ধা করে না। তথাপি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি তাদের আঘাত করেছে। সেই তাঁর 'শ্রীকান্ত' প্রথম

পর্বের শ্রীকান্তের একটি উক্তি। তার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তর যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, সেদিন শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর জবানীতে লিখেছেন, 'বাঙালী ও মুসলমানছাত্রদের মধ্যে একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল।' এই উক্তি থেকে আপাতদৃষ্টিতে এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মুসলমান বাঙালী নহে, তাহারা মুসলমান মাত্র, অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের তাই বিশ্বাস। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে এই অর্থে কথাটি ব্যবহার করেননি, তা আমরা সকলে না জানলেও অনেকেই জানি। এখানে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের উল্লেখ করেছেন। সেখানকার বাঙালীরা বাংলা ভাষাভাষী হলেও মুসলমানেরা হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাষী। বাঙালী ও মুসলমান ছাত্র অর্থে তিনি বাংলা ভাষাভাষী ও হিন্দী বা উর্দু ভাষাভাষী ছাত্রই মনে করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরের বাঙালী ও অবাঙালী সমাজ সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্রও জ্ঞান আছে, তাঁরা জানেন যে, এর ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র বাঙালী মুসলমানকে লক্ষ্য করেননি। কিন্তু পূর্ববাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকের সঙ্গেই বাংলার বাইরের মুসলমানদের বিশেষ কোনো যোগ নেই, তবে দেশবিভাগের পর ইদানীং সে যোগ কিছু সৃষ্টি হবার ফলে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই ভুল ধারণা কতকটা দূর হওয়ার সুযোগ দেখা দিয়েছে। বিহারের বহু মুসলমান এখন পূর্ব-বাংলায় এসে বাস করতে আরম্ভ করেছে; তারা মুসলমান হলেও যে বাঙালী নয়, ভাষার ব্যবধানের ভিতর দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে নারী-চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু একমাত্র 'মহেশ' ছোট গল্পের আমিনা চরিত্র ছাড়া শরৎচন্দ্র মুসলমান সমাজের নারী-চরিত্রের আর কোনো পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু আমিনা কতটুকু চরিত্র? এ যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। বাংলার মুসলমান সমাজের স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সুগভীর বাস্তব জ্ঞান থাকবার কোনো কথা ছিলো না, সুতরাং শরৎচন্দ্র সে পথে অগ্রসর হলেও তাঁকে একান্তভাবে

কল্পনাকে আশ্রয় করতে হ'তো। শরৎচন্দ্রের পক্ষে তার ফল যে সার্থক হ'তো না, তা বলাই বাহুল্য। মুসলমান সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই, স্ত্রীসমাজ যেভাবে পর্দার অন্তরালে জীবনযাপন করে সেখানে কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বিস্তার করা অসম্ভব। অথচ জীবনের জটিলতায় তথা ঔপন্যাসিক উপাদানের দিক থেকে তার মধ্যে কিছু অভাব আছে, তা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার আশ্রয় নিয়ে আগ্রার প্রাসাদ-জীবনের রোমান্টিক চিত্র পরিবেশন করেছিলেন, কিন্তু তা দিয়ে বাস্তব জীবন রূপায়িত করা সম্ভব হয় না।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর রচনার ভাব-ধারার বিরুদ্ধে অভিযান কম হয়নি—চারিদিক থেকে কত নিন্দাবাদই না বর্ষিত হয়েছিল। নিন্দকদের উক্তিগুলি একেবারে যুক্তিহীনও ছিলো না। শরৎচন্দ্র তাতে কম বেদনা পাননি। কিন্তু ক্রমে যত আত্মপ্রত্যয় বাড়তে লাগল ততই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন। মহাকালের ও মহামানবের বিচারের উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিলো। চিঠিপত্রে কখনো কখনো উষ্মা প্রকাশ করতেন, সে সব চিঠিপত্র পরে ছাপা হবে এ-কথা বুঝতে পারলে তাও করতেন না। কখনো তিনি আত্মসমর্থনের জন্য লেখনী ধারণ করেননি। তাঁর নিন্দকের উক্তির জবাব দেওয়ার লোকের অভাব ছিলো না, কিন্তু কখনো কাউকে এজন্য উৎসাহিত করেননি তিনি। আমরা অনেক সময় ' তাম—"এই আক্রমণের একটা জবাব দেওয়া যাক।" তিনি বলতেন—"পাগল নাকি? জবাব দিয়ে ঐ নিন্দাবাদের ইম্পরট্যান্স বাড়িয়ে আমাকেই অপমান করবে তোমরা? তা করলে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে না। বুঝছো না, ওরা একটু ব্যস্তবাগীশ? মহাকাল কবে কি বিচার করবে তার ভরসায় ওরা থাকতে চায় না। ওরা চায় আমরা একটা ভারডিক্‌ট দিয়ে দিই সেটাই মহাকাল মাথা পেতে নিক। তোমরাও ওদের মতো ব্যস্তবাগীশ হলে চলবে কেন?"

সেকালের একজন তরুণ (একালের প্রবীণ) সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলো। আমি তার একটা জবাব লিখে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শোনালাম। তিনি গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। খুব মন দিয়ে গম্ভীরভাবে সবটা শুনলেন। তারপর আমার পড়া শেষ হলে লেখাটা চেয়ে নিলেন। কিছুই না বলে ক'য়ে লেখাটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে মস্তবড় কল্‌কের আগুনে সমর্পণ করলেন। আমি বললাম—"ওকি করলেন দাদা"—তিনি বললেন—"ঠিকই করলাম। লোকে কি ভাববে বলো তো? ভাববে

আমি তোমাকে দিয়ে এটা লিখিয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা লেখকের প্রবন্ধেই রয়েছে যে।"

সে লেখাটার একটা কপি ছিলো। আমি সেটাকে একটু-আধটু বদল করে আমার শরৎ-সাহিত্যে ছেপেছি। যারা এক সময়ে নিন্দাবাদ করেছিলো তাদের দেখেছি তাঁর গৃহে এসে তাঁর স্নেহ ও বান্ধবতা লাভ করতে। ক্ষমাশীল শরৎচন্দ্র সব আঘাত ভুলে যেতেন। তিনি বলতেন—'ক'দিনের জীবন, ভাই! এই অল্পদিনের জীবনে কারো সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ কি রাখতে আছে? যে মানুষ একদিন অপরাধ করেছিলো যে মানুষ তো আর নেই—এখন তো সে নতুন মানুষ হয়েছে। রাগ করবো কার উপর বলো? আর অপরাধটা আমারও তো কম হয় না। সে সব কথা আমাদের সামাজিক জীবনে অপ্রিয় সে সব কথা তো আমি কম বলি না।" যাদের কৃতজ্ঞ থাকবার কথা তারা নিন্দা বিদ্রূপ করলে বলতেন—"দেখ, কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের একটা প্রধান অঙ্গ। কৃতজ্ঞতা বিধাতার একটা মস্তবড় দান। বিধাতা যাকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন—এত বড় দানটা তিনি তাকে দেবেন কি করে?"

একজন বলেছিলেন—"যারা আপনার লেখার উপর দশ বছর দাগা বুলিয়ে লিখতে শিখেছে—আর যা হোক, তাদের উচিত নয় আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।"

শরৎচন্দ্র তাতে উত্তর দিয়েছিলেন—"আরে তুমি যে উল্টো বুঝলে। তাদেরই তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবার কথা। তাদেরই তো প্রচার করতে হবে, তারা ঋণী নয়, পাছে ঋণ ধরা পড়ে এই ভয়ে। রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন দুটো বলো তো।"

আমি সঙ্গে সঙ্গেই আবৃত্তি করলাম⋯ ⋯

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

শরৎচন্দ্র বললেন—'কবি অনেক দুঃখেই লিখেছেন হে।"

কোনো এক প্রতিবেশী সাহিত্যিকের সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে শরৎচন্দ্রের মনোমালিন্য হয়। তাতে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সাহিত্যিকের কন্যার মৃত্যু-সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। আর একবার তাঁরই সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল, সে-বার ঐ সাহিত্যিকই শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসবে উপস্থিত হয়ে কবিতা পাঠ করেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেন—"তুমি যদি আজকের অনুষ্ঠানে না আসতে কালকে আমি তোমার বাড়ি যেতাম। দু'জনেরই মরণকাল আসন্ন ক'দিন আর এ সংসারে আমরা আছি, ভাই? রাগ অভিমান কোরো না।"

কেউ কেউ মনে করতেন—বালীগঞ্জে বাড়ি করে মোটরে চড়ে শরৎচন্দ্র বুঝি এরিস্টোক্র্যাটিক হয়ে গিয়েছিলেন। এ ধারণা মিথ্যা। আহারে-বিহারে পোশাকে-পরিচ্ছদে আসবাবপত্রে চালচলনে কথাবার্তায় তাঁর বিন্দুমাত্র বড়মানুষির ভাব ছিলো না। তাঁর গৃহ দুঃস্থ আত্মীয়গণের আশ্রয় ছিলো। গৃহের দ্বার অবারিত, একটা স্কুল কলেজের ছাত্র গেলেও তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আলাপ করতেন। শরৎচন্দ্র বাড়িতে আছেন অথচ দেখা হ'লোনা—এরূপ বড়মানুষি ব্যাপার কখনও ঘটেনি। আমাদের মতো দরিদ্র অনুবর্তীদের গৃহে এসে ভাঙা চেয়ারে অথবা ধূলিমলিন সতরঞ্চিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন। মোটরে তিনি চড়তেন বটে, কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র স্কুলমাস্টারকে পাশে বসিয়ে এখানে ওখানে যেতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না। একা কোথাও যেতে ভালবাসতেন না। অনেক সময় শুধু গেঞ্জি কি ফতুয়া গায়ে দিয়েই শিল্পী সতীশের বাড়িতে 'রসচক্রে' চলে আসতেন। হাতে একটা অত্যন্ত পুরাতন শ্রীহীন লাঠি থাকতো। আমরা বলতাম—"ও লাঠি-গাছটা ফেলে দিন, একটা ভদ্রগোছের লাঠি ব্যবহার করুন।" তিনি বলতেন—"আমি তো বুড়ো হয়েছি, শ্রীহীন হয়েছি—আমাকেও তোমরা তবে ফেলে দেবে? জানো—এ লাঠি আমার বন্ধু। এতে আমি কত যে সাপ মেরেছি তার ইয়ত্তা নেই। একে কি ফেলতে পারি?"

রসচক্রের উত্থানসম্মিলনীতে বেলা ছুটোর সময় সকলের সঙ্গে কলার পাতে ভাত-ডাল খেতে তাঁর খুব ভালো লাগতো।

কবি যতীন্দ্রমোহন খেতে দেরি হলে অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করতেন। শরৎদাদ বলতেন—"ওহে বিশ্বপতি যতীনকে কয়েকখানা বেগুন-ভাজা এনে দাও ওর জঠর হোমানল কিছু আহুতি চাচ্ছে।" যতীনদাদাকে বলতেন—"তুমি গাঁয়ের জমিদার, তোমার পাড়াগাঁয়ে প্রজার বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার অভ্যেস নেই, আমার সে অভ্যেস আছে। যারা নেমন্তন্ন করে তারা নিমন্ত্রিতদের ক্ষুধাকে চরম অবস্থায় নিয়ে গিয়ে খেতে দেয়। তাতে কি হয় জানে? শাকভাজা থেকে শুরু করে সব অমৃতোপম হয়ে ওঠে। আয়োজনের দৈন্যের তার ক্ষতিপূরণ করে ক্ষুধার প্রখরত বাড়িয়ে। রাধেশ পাড়াগাঁয়ে মানুষ। সে পাড়াগাঁয়ের ধারাই এখানে রেখেছে। আমরা এসেছি এখানে একসঙ্গে বসে আমোদ করে খেতে—খাওয়াটাই বড় নয়। তাহলে তোমাকে আগেই মাছভাজা দিয়ে ডাল ভাত খাইয়ে দিতে পারা যেতো।"

দেশের বহু বর্ষীয়ান গণ্যমান্য লোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিলো, কিন্তু কখনো কাউকে খগেনদা, দীনেশদা রাজশেখরদা বলে সম্বোধন করতে সাহস করিনি। শরৎচন্দ্রকে সকলেই 'শরৎদাদা' বলে ডাকতাম—যেমন ডাকতাম জলধর দাদাকে। গণ্যমান্যেরা 'আপনি'র বদলে 'তুমি' সম্বোধন করে আমাদের সে অধিকার দেন না। শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকদের নয়, অসাহিত্যিক পরিচিতদেরও দাদা ছিলেন। একদিন শরৎদা বলেছিলেন—"যদি দাদাই বলো তবে নাম ধরে দাদা বলো কেন? বিধাতা আমাকে দাদা করেই যে সৃষ্টি করেছেন।— অনেকগুলো দাদা এক জায়গায় থাকলে অবশ্য শরৎদাদা না বললে অসুবিধা হয়।"

তাঁর অসামান্য খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা বাড়ি-গাড়ি আমাদের সঙ্গে তাঁর কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। এখনকার কোনো কোনো নামজাদা সাহিত্যিকের চেয়ে তিনি অনুজদের কাছে ঢের বেশী অন্তরঙ্গ ছিলেন।

একদিনের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে ছিলেন অসমঞ্জবাবু। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিয়ে। তখন বরানগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে ছিলো তাঁর অস্থায়ী নিবাস। সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। শরৎচন্দ্রের হয়েছিলো দাঁতের যন্ত্রণা। আমি বললাম—"দাদা অতদূরে এই বর্ষায় আর গিয়ে কাজ নেই—হাতে করে তো গাল চেপে রয়েছেন। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।" শরৎচন্দ্র বললেন, "বলো কি। চারুর মেয়ের বিয়ে। ঢাকায় নয়, কলকাতার কাছেই—না গেলে কি চলে? যেতেই হবে। তুমি কি বলতে চাও বৃষ্টিবাদল বলে বর যাবে না, বরযাত্রীরা যাবে না, আর কন্যাযাত্রীরা কেউ যাবে না? তারা যদি যেতে পারে, আমরাও পারব। দাঁতে বেদনা ভারি একটা অজুহাত। দাঁত থাকলেই তাতে একটু-আধটু বেদনা থাকে, চলো।"

নিমন্ত্রণ-বাড়ির কাছাকাছি এসে সদর রাস্তার উপর মোটর দাঁড়ালো, নেমে গলি খুঁজে নেওয়া হ'লো। গলিতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। মোটর পাকা রাস্তায় রেখে হেঁটে যেতে হবে। অসমঞ্জবাবু বললেন 'আর তো যাবার উপায় নেই, ফিরেই যেতে হ'লো।" শরৎচন্দ্র বললেন –'তোমরা বড় শহুরে বনে গেছ। পাড়াগাঁ হলে কি করতে? এতদূরে এসে ফিরে যাব, বলো কি।" জুতো হাতে করে জল কাদা ভেঙে চলতে হ'লো। পথে এক জায়গায় সুরকি-গাদা ছিলো, তাতে পায়ের বর্ণ রাঙা হয়ে গেলো।

শরৎচন্দ্র বললেন—"চিরকাল ওই করে আসছি। পাড়াগাঁয়ের লোক আমি। সহসা বাবু ব'নে যাব কি দুঃখে? তোমাদেরই কষ্ট দিলাম, আমার কোনো কষ্ট হয়নি।"

বাঙালী পল্লীবাসী বলে তিনি গর্ব অনুভব করতেন, যদিও বাংলার পল্লীতে তাঁর বেশীদিন বাস করার সুযোগ হয়নি।

বালিগঞ্জে তাঁর মন টিকতো না, সামতাবেড়ে যাবার জন্য ছটফট করতেন। সুযোগ পেলেই সেখানে চলে যেতেন—গেলে আর সহজে

আসতে চাইতেন না। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম - "গ্রামে আপনার সময় কি করে কাটে ?"

তিনি বলেছিলেন—"গ্রামে আমার সময় কাটাবার কোনো অসুবিধা নেই। জেলেরা মাছ ধরছে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। ছেলেরা তাস খেলছে, খানিকক্ষণ তাদের উপদেশ দিলাম। বুড়োরা দাবা খেলছে, দুটো উপরচাল বলে দিলাম। নিজেও দু'বাজি খেললাম। মাহিষ্য-বুড়ী মুড়ি ভাজছে, তার সঙ্গে দুটো গল্প করলাম। এক মুঠো মুড়ি খেতে খেতে কামাররা লোহা পিটুচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আগুনের ফিনকি ছড়ানো দেখলাম। এইভাবে - কোথাও গাই দোওয়া, কোথাও নালা কাটা কোথাও দেওয়াল দেওয়া, কোথাও ঘর ছাওয়ানো — এইসব দেখে দিনগুলো দিব্যি কেটে যায়। গাঁয়ের দাঠাকুর আমি, কত যে সালিসি মেটাতে হয়, কত যে গৃহ-কলহের নিষ্পত্তি করতে হয়, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদেরও মীমাংসা করতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। এ ছাড়া বারোয়ারির চাঁদা তোলার তদারক করার প্রযোজন হয়, ঘরে আগুন লাগলে নিভাবার ব্যবস্থা করতে হয়, কারো কঠিন ব্যারাম হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, বিয়ের ঘটকালি করতে হয়, বিয়েবাড়ি, শ্রাদ্ধবাড়িতে গিয়ে বিলিব্যবস্থা করতে হয় - এমনি কত কাজ।"

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বাংলার গ্রাম্য-জীবনের প্রতি যে মমতা ফুটেছে, আদৌ তা পোশাকী ধরনের নয়। নিবিড় মমতার সঙ্গে গভীর অভিজ্ঞতা ও কবির হৃদয় সব মিশে তাঁর সাহিত্যকে অসামান্য করে তুলেছে। এ সাহিত্যকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। অবিকৃত আসল বাংলা ভাষা, নি-ভেজাল খাঁটি বাঙালী দরদী মন, আর অবিকল বিদেশী প্রভাববর্জিত বাংলা দেশ - এই তিনের ত্রিবেণী-সঙ্গম অত্যন্ত দুর্লভ। সেজন্যে শরৎসাহিত্য বিশ্বসাহিত্য হয়তো হয়নি, কিন্তু বাংলার অবিমিশ্র খাঁটি জাতীয় সাহিত্য হয়েছে।

অনন্ত যাত্রা

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

অসুখে-অসুখে শরৎচন্দ্রের শরীর ভেঙে পড়েছে। বাত-অর্শ-ম্যালেরিয়া-অজীর্ণ। প্রায় কোনো রোগই বাকি নেই।

কলকাতায় মাঝে মাঝে এসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে দেখিয়ে যান। কোথাও তাঁর এক নাগাড়ে বেশিদিন থাক্‌তে ভালো লাগেনা। পড়াশুনো, লেখালেখি এক রকম বন্ধ। 'বিচিত্রা'য় 'আগামী কাল' ও 'ভারতবর্ষে' 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস দুটি খানিকটা প্রকাশিত হবার পর অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। নরেন্দ্র দেবের 'পাঠশালা' ও অন্যান্য শিশু-সাময়িকীতে দু-একটি কিশোর-পাঠ্য গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। পরে সেই সমস্ত গল্পের একটি সংকলন 'ছেলেবেলার গল্প' নামে প্রকাশিত হয়।

শরীর ক্রমেই নেতিয়ে আসছে। শরৎচন্দ্রের মনে আর সে রকম জোরও নেই। সামতাবেড়ের গ্রামের বাড়িতে একদিন তিনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন, 'এবার বুঝি তোমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে হয়, সুরেনমামা।'

'কী যে বলো, অসুখ কি আর মানুষের হয় না?'

'হয়। তবে মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় আমায় কালে ধরেছে! আমি আর বাঁচবো না, সুরেন।'

'এটা তো ঠিক তোমার মতো মানুষের কথা হ'লো না। কত শক্ত, কত দৃঢ় ছিলো তোমার মন। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এখন দেখছি ফলিত-জ্যোতিষে গিয়ে ঠেকেছো। কোথায় গেল তোমার সেই চিরদিনের দুর্জয় সাহস?'

'ভুগে-ভুগে খাঁটি আমার আলগা হয়ে গেছে যে—'

ম্লান হেসে শরৎচন্দ্র বলে চললেন, 'তাছাড়া ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকতে তো কেউ চায় না, সুরেন—বিশেষ করে সাহিত্যিকরা। শরীর আমার বরাবরের মতোই ভেঙেছে। এখন বাঁচা শুধু বিড়ম্বনা।'

শূন্য দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র চেয়ে রইলেন।

প্রাণপণে চোখের জল রুদ্ধ করে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'শরৎ, অন্তত দিন কয়েকের জন্যে তুমি কলকাতায় চলো। খানিকটা হাওয়া বদল করলে মন আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।'

'গ্রাম ছেড়ে যেতে মন চাইছে না যে। বাড়ি ফেলে—'

'বা-রে, সেখানেও তো তোমার বাড়ি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনোও হবে। তাছাড়া, এক্স-রে করিয়ে জানা দরকার রোগটা কি।'

'রোগ জানবে আর কী। বিধানবাবু দেখে হয়তো বলবেন—ম্যালেরিয়া। না হয়, টাইফয়েড। কিন্তু তার মানে, ডাক্তারদের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়া।'

'তোমার সবই অদ্ভুত! রোগ হলে ডাক্তারের হেফাজতে থাকতে হবে না? বিধানবাবুকে আগে তো দেখাও—'

'তাঁকে যে আমি চিনি, সুরেন। এক নজর দেখেই রোগ ধরে ফেলবেন। হয়তো সাংঘাতিক একটা রোগ—'

'আগে থেকে তুমিই বা অত ভাবছো কেন? সাংঘাতিক কিছু হলে তার চিকিৎসাও তো আছে। ধন্বন্তরীর হাতে সে ভার না হয় তখন ছেড়ে দিও।'

চোখ দুটো বন্ধ করে শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কয়েকদিন টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া সাব্যস্ত হ'লো।

দুয়োরে পালকি এসে দাঁড়ালো।

হিরন্ময়ী দেবী সঙ্গে যেতে চাইলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে অনেক করে বোঝালেন।

'ভয় কী ? মামা রইলেন সঙ্গে। ক'দিন বা ? যাব আর দেখিয়েই চলে আসবো। পৌঁছেই টেলিগ্রাম করবো। তুমি ভেবো না। এখানে তো খোকা রইলো, দেখাশুনা করবে তোমাদের।'

ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রেরই আদরে নাম খোকা। প্রকাশচন্দ্র ছলছল চোখে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'এই তো খোকা, ভয় কী ? চুপ করো এখন সব। যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলতে নেই, বড়বৌ। তাহলে আর যেতেই পারবো না।'

হিরণ্ময়ী দেবী তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন। শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন গোবিন্দজীকে প্রণাম করতে। দেশবন্ধুর সেই গোবিন্দজী। গলায় কণ্ঠি পরে শরৎচন্দ্র স্বহস্তে এর সেবা করেছেন এই সেদিনও।

পালকির পাশে দাঁড়িয়েছে সকলে। গ্রামের লোক ভিড় করে এসেছে। সকলেরই চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ম্লান ছায়া।

শরৎচন্দ্রের শুকনো পাণ্ডুর মুখ। অবিন্যস্ত সাদা চুল গুচ্ছ-গুচ্ছ কপালে এসে পড়েছে। পায়ে দামী কাজ-করা মোজা, বার্নিশ-করা জুতো। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে তারপর তাড়াতাড়ি পালকিতে উঠে বসলেন।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে দুলে-দুলে পালকি চলেছে। বেহারাদের গানের তালে-তালে মানুষজন নিয়ে পথপ্রান্তর পিছিয়ে যাচ্ছে।

শরৎচন্দ্র অনুভব করতে লাগলেন জীবন যেন অনন্ত যাত্রায় চলেছে।

অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ি। শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে শুয়ে।

তাঁর অসুস্থতার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চেনা-অচেনা, আত্মীয়-বন্ধু ভক্তের দল মুহুর্মুহু খবর নিতে আসছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় নিয়েছেন তাঁর চিকিৎসার ভার।

শরৎচন্দ্র কখনো আশা অনুভব করেন, কখনো ম্রিয়মাণ হন। লোকের এত ভালবাসা তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। এই তো জগৎ, এই তো মানুষ, এই তো জীবন।

একদিন উপেন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, 'উপীন, তুমি একবার সেই গানটা শোনাবে?'

'কোনটা, শরৎ?'

'সেই যে রবিবাসরের সম্বর্ধনা-সভায় গেয়েছিলে? তোমার গলায় বড় মিষ্টি লাগে।'

উপেন্দ্রনাথ গাইলেন:

নন্দিত তুমি শরৎচন্দ্র,
বন্দিত তুমি হে রূপকার

শরৎচন্দ্রের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায পরীক্ষা করলেন। দুরারোগ্য অন্ত্রের ব্যাধি। এক্স-রে করা হ'লো। যকৃৎ পচে গেছে। অস্ত্রোপচার দরকার। ছুটোছুটি পড়ে গেলো। ভয়। চিন্তা। উদ্বেগ।

খবর পেয়ে প্রকাশচন্দ্র সামতাবেড় থেকে হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে করে চলে এসেছেন।

একটি ইউরোপীয় নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'লো। কিন্তু জায়গাটা শরৎচন্দ্রের পছন্দ হ'লো না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সুশীল চ্যাটার্জীর 'পার্ক নার্সিং হোমে' শরৎচন্দ্রকে স্থানান্তরিত করা হ'লো। ডাক্তার ললিত বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করার কথা বললেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

'কিন্তু ললিতবাবু তো বারো-তেরো শো টাকার কমে—'

বিধানবাবু বললেন, 'সে ভার আমার। চারশো টাকায় তাঁকে…'

অস্ত্রোপচারে শরৎচন্দ্রের সম্মতি পাওয়া গেলো। দুর্বলতার দরুন শরীরে রক্ত দেবার দরকার হ'লো। প্রকাশচন্দ্র নিজের শরীর থেকে রক্ত দিলেন।

অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় দু'জনেই উপস্থিত। ললিতবাবু অপারেশন করলেন।

অস্ত্রোপচার ভালোভাবেই সমাধা হ'লো। সকলেই খুব খুশী। কারণ, টেবিলে শায়িত অবস্থাতেই প্রাণহানির আশঙ্কা ছিলো।

কড়া নির্দেশ দেওয়া হ'লো, শরৎচন্দ্রকে যেন মুখ দিয়ে কিছু খাওয়ানো না হয়। বমির দমকে পেটের সেলাই ছিঁড়ে গেলে কিছুতেই তখন আর রোগীকে বাঁচানো যাবে না।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৮। ২রা মাঘ, ১৩৪৪।

হেঁচকি উঠছে শরৎচন্দ্রের।

চারপাশে যে যেখানে ছিলো সবাই ছুটে এলো। কী সর্বনাশ! মুখ দিয়ে কিছু খেয়েছিলেন নিশ্চয়।

দমকে-দমকে হেঁচকি উঠছে, হাতটা একটু নড়ে উঠলো। তারপর সমস্ত শরীর নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে গেলো।

বাইরে অপেক্ষমান জনতা শরৎচন্দ্রের কুশল জানতে চাইছে। 'রয়টার' আর 'বেতার-কেন্দ্র' মুহুর্মুহু টেলিফোন করছে। হঠাৎ ভেতর থেকে কাতর কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো।

উদ্বিগ্ন জনতার চোখেও জলের ধারা নামলো।

খবরটা রবীন্দ্রনাথের কানে যেতেই শরৎচন্দ্রের বিয়োগ-বেদনা প্রকাশ পেলো তাঁর শোকাকুল শ্লোকে :

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি' ॥
